ইসলামে তাসাওউফ তত্ত্বঃ বাংলাদেশে ইহার প্রভাব

(১২০০- ১৪০০ খৃঃ)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোঃ আবুল বাসার

এম.ফিল.২য় বর্ষ

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382757

Dhaka University Library

382757

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

১৯৯৯ইং

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		
অধ্যায়-১	ঃ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা, অধিবাসী এবং তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা।	০১-২৪
অধ্যায়-২	ঃ মুসলিম বিজয় পূর্ব বাংলাদেশে ইসলাম	২৫-৪৪
অধ্যায়-৩	ঃ মুসলমানদের বাংলা বিজয় ও মুসলিম শাসনের সূচনা	৪৫-৫০
অধ্যায়-৪	ঃ ইসলামের স্বরূপ ও শিক্ষা	৫১-৬৯
অধ্যায়-৫	ঃ ইসলামে তাসাওউফ বা সুফীতত্ত্ব	৭০-১২৫
অধ্যায়-৬	ঃ বাংলাদেশে তাসাওউফ বা সূফীতত্ত্বের বিকাশ	১২৬-১৩৩
অধ্যায়-৭	ঃ বাংলাদেশের সূফী সমাজ (১২০০-১৪০০ খৃ.)	১৩৪-১৮৩
অধ্যায়-৮	ঃ বাংলাদেশে সুফীগণের প্রভাব (১২০০-১৪০০ খৃ.)	১৮৪-২০৭
গ্রন্থপুঞ্জি	ঃ	২০৮-২১৪
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা		
প্রতি বর্ণনায়ন		
বাংলা ও হিজরী অব্দকে খৃষ্টাব্দে রুপান্তরের নিয়ম		

382757

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

"বিশ্বজোড়া খ্যাতিভরা অতীত আমার সামনে রাখি
গতকালের অর্শীতে মোর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি।"
-ইকবাল

নিজেদের ইতিহাস বিশেষত সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার ইচ্ছা যে কোন জাতির জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। জাতির আত্মপরিচয় লাভের জন্য এর আবশ্যকতাও নিতান্ত কম নয়। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দর্পণে নিজেদের চেহারা দেখেই জাতি আপন আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠে। অতীতকে জেনেই বর্তমানের সদ্ব্যবহার করতে হয় এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য স্থির করতে হয়। জাতি হিসেবে আমরা মুসলমান। আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ইসলাম। সর্বোপরি আমাদের বসবাস ইসলামের আদি ভূমি হতে কয়েক হাজার মাইল দূরে ৫৫'৫৯৮ বর্গমাইলের ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশে। বাংলা-ভাষী স্বাধীন মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের রয়েছে এক গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়। আমাদের সেই ঐতিহ্যময় অতীত ও আত্মপরিচয় লাভে কিছুটা সহায়ক করে তোলার জন্যই আমার বক্ষমান অভিসন্দর্ভটি রচনার মূল লক্ষ্য।

382757

আল্লাহ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানব জাতিকে একটি আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ধর্ম ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের তাৎপর্য বহনকারী এবং সে দীনকে তাঁর ফিতরাত অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সেজন্যই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"(সূরা রূম-৩০) তাই ইসলাম দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ কোন সংকীর্ণ ধর্ম নয়। এর ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ বিশ্বজনীন, সর্বকালীন। এটা একটা সর্বব্যাত্মক ও সর্বজনীন ধর্ম। ইসলামে জগত, জীবন ও স্রষ্টার যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি জগত ও মানব জীবনের যে কোন সমস্যার বেলায় স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই ধর্ম শব্দের প্রচলিত অর্থে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে না। ব্যক্তি ও স্রষ্টার মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক সীমিত সম্পর্ক স্থাপনই সাধারণত: ধর্মের সংজ্ঞার আওতায় আসে। অন্যান্য সকল ধর্ম তাই সীমিত ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিছক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছে। মানব জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিক সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ইসলাম সে সবের মোকাবেলায় এক সর্বাত্মক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। সমগ্র জীবনকে বেষ্টন করে আছে ইসলাম। এটা এক দিকে যেমন স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে অপর দিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্টি জগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক ও সংজ্ঞায়িত করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পার্থিব এবং অপার্থিবের কোন বিভাজন নেই। একত্ববাদী ধর্ম বলেই ইসলাম আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। মানবতার সার্বিক বিকাশ ও কল্যাণের জন্য ইসলামের বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।

মানবতার এই বিকাশ ও কল্যাণমুখীতার কারণেই ইসলাম একটি ব্যবহারিক ধর্ম হিসেবে পরিগণিত। এতে সংসার ত্যাগের কোন বিধান নেই। নবী করীম (স.) ধর্ম প্রচারের সাথে সংসার ধর্মও পালন করেন। তিনি সাদাসিধা সরল-সহজ জীবন-যাপন করতেন। তাঁর অনুসারী সাহবাগণও তার অনুকরণে সংসারী ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ায় ইসলামে এমন একটি মতবাদ গড়ে উঠে যার প্রধান নীতি সংসার ত্যাগ না হলেও এ মতাবলম্বীদের অনেকেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। এ মতবাদকেই বলা হয় তাসাওউফ এবং এর মতাবলম্বীদের বলা হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূফী। সূফীগণ নির্জনবাস এবং দারিদ্র পছন্দ করতেন। তারা নিভৃত সাধনা ও কুরআন মজীদের মর্ম উদঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতেন। তাঁরা শুধু সামাজের অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না, নিজের আত্মার দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আত্মার পরিশুদ্ধি মারফত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা ।

সূফীগণ যেমন নিজেদের মুক্তি কামনা করেন তেমনি অন্য সকলকেও সৎ পথ প্রদর্শন করেন। তাই ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারে সূফী-দরবেশগণ নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। বহু সূফী-সাধক ও দরবেশ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে প্রায় ইসলামের সূচনাতেই ইসলাম প্রচারকল্পে বাংলাদেশে আগমন করেছেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে এখানে বহু সূফী দরবেশের আগমন ঘটে এবং এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। ৮ম শতাব্দীর গোড়াতে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের চট্রগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্র কূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন । তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে এ অঞ্চলে যখন ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হয় তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক ইসলাম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। অতঃপর তুর্কীগণ কর্তৃক বাংলাদেশ বিজিত হলে বাংলদেশের পীর-দরবেশগণ ধর্ম প্রচারের মহান ব্রত পালন করেন।

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব, সুপ্রতিষ্ঠা লাভ ও বিস্তৃতি এবং তাতে সূফী-দরবেশগণের সুদীর্ঘ গৌরবময় কর্মকান্ড যেমন অলৌকিক ও চমকপ্রদ তেমনি বৈচিত্রময়। এদেশে তাদের অভিনব ধর্ম প্রচার ও বিস্তার ঐতিহাসিক রূপ কথায় পরিণত হয়েছে। তাঁরা যখন এদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন তখন এদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কলহ চলছিল। এ ধর্মকলহের মূলে ছিল হিন্দু ধর্মের সমাজ ব্যবস্থা। হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য প্রচলিত থাকায় বিশেষত সেন আমলে কৌলিণ্য প্রথার সৃষ্টি হওয়ার নতুন ও আদর্শ সমাজ গঠনের পথে প্রবল বাধা ও অন্তরায় ছিল। দেশের সাধারণ মানুষ উৎপীড়িত হত এবং সমাজে বর্ণ- বৈষম্য প্রচলিত থাকায় আর্য ব্রাহ্মণদের জীবনবাদকে সর্বসাধারণ গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে দেশের সাধারণ জন সমাজ বরাবরই অবহেলিত ছিল। সমাজ-সংস্কৃতির এই পরিবেশে আরব-পারস্য এবং মধ্য এশিয়া থেকে মুসলমানগণ এদেশে জয় করে নিয়েছেন, তাদের বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত সূফী-দরবেশ আগমন করে নব সমাজ গঠনে প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করেছেন। এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ জনসমাজ মননে ও চিন্তায় সূফী-দরবেশদের নিকট হতে এক অভিনব ও বিস্ময়কর অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনাচরণের আদর্শ লাভ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে সূফী-দরবেশগণ ইসলামের মহিমা ও ঐশ্বর্য অনাড়ম্বরভাবে তুলে ধরায় এবং জনসাধারণের ব্যথা -বেদনা ও বিষাদের অংশ নিজেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করায় বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ অসঙ্কোচে ইসলাম বরণ করে, ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়।

বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস যুগব্যাপী সংযম, সাধনা ও সংঘাতের ইতিহাস। তাই বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস এত বিচিত্র ও ঘটনাবহুল যে তাঁর অনুশীলনী সহজ সাধ্য ব্যাপার নয় । কারণ এ ব্যাপারে প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল উপাদানের দুস্প্রাপ্যতা রয়েছে। পণ্ডিতগণ এর ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেননি। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে অনেকেই ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করতে প্রয়াস পেয়েছেন -যাকে যুক্তির ধোপে টেকানো দুস্কর।

পর্যালোচিত সময়ে (১২০০-১৪০০খৃ.) বাংলাদেশে সূফী সাধকগণের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রমাণ-তথ্য থেকে জানা যায় যে প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী সহজে এ

Dhaka University Institutional Repository

দেশে সূফী-দরবেশগণের আগমন ও ধর্ম প্রচারকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করত এবং নির্যাতন চালাত। সে কারণে তাদের সঙ্গে অনেক সময় যুদ্ধও করতে হয়েছে। যুদ্ধে অনেক শহীদ হয়েছেন আবার অনেকে তাঁদের জীবনচরিত্র, কর্ম ও চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিপুল সংখ্যক জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সূফী-দরবেশগণ অনেক সময় অলৌকিক কারামতি দেখিয়েও লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। বস্তুত ইসলামের মূলনীতি একত্ববাদ ও ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই পৌওলিক আদর্শহীন নরপূজক, প্রতীকপূজক ও অবতারবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয় লাভে সমর্থ হয়েছে।

সূফী-দরবেশগণ ১২০০-১৪০০খৃঃ পর্যন্ত বাংলাদেশে কীভাবে এ দুঃসাধ্য কর্মটি সম্পাদন করে সফল হলেন ইসলামের তাসাওউফ তত্ত্বের একটি সর্বাত্মকরূপসহ তার তথ্যবহুল একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই গবেষণা কর্মটি শুরু করা হয়।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির ভাবসৌন্দর্য ও অবয়ব সুন্দর ও সুচারুরূপে বিন্যাস করার নিমিত্তে এর বিষয়বস্তুকে মোট আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা, নামকরণ, বিভিন্ন জনপদ, এর প্রাচীন অধিবাসী ও তৎকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে তখন মানবতার মুক্তির জন্য অত্র অঞ্চলে ইসলামের আগমন অপরিহার্য ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুসলিম বিজয় পূর্ব বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধারা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুসলমানদের বাংলা বিজয় ও মুসলিম শাসনের সূচনা কাল তুলে ধরা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও ভিত্তিসহ ইসলামের বৈশিষ্টাবলীর সর্বাত্মকরূপ তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামের তাসাওউফতত্ত্ব, তাসাওউফ শব্দের উৎপত্তি, অর্থ,পরিচয়, তাসাওউফ দর্শন, এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সুফী পথ পরিক্রমা, মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য, সূফী-সাধক ও রক্ষণশীল মুসলমান, তাসাওউফ ও অন্যান্য মরমীবাদ এবং সূফী তরীকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে সূফীতত্ত্বের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পর্যালোচিত সময়ের (১২০০-১৪০০খৃ.) বাংলাদেশে সূফী-দরবেশগণের জীবনী এবং অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত সময়ে বাংলাদেশে ইসলামের বিস্তারসহ রাজনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিতে সূফী দরবেশগণের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে।

আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

মু. আ. বাসার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আ	-	আরবী
আঃ	-	আলায়হিস সালাম
ইং	-	ইংরেজী
বাং	-	বাংলা
হি.	-	হিজরী
খৃ.	-	খৃষ্টাব্দ/ খৃষ্টাব্দে
খৃ. পূ.	-	খৃষ্টপূর্ব
জ.	-	জন্ম
মৃ.	-	মৃত্যু
স.	-	সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম
রাঃ	-	রাদিয়াল্লাহু আনহু
রহ.	-	রহমতুল্লাহি আলায়হি
ড.	-	ডকটর
অনূ	-	অনূদিত
অনু	-	অনুবাদ
পৃ.	-	পৃষ্ঠা
ই.ফা.বা.	-	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
op. cit.	-	opera, citra
p.	-	page
J.A.S.B.	-	Journal of the Asiatic Society of Bengal.

Dhaka University Institutional Repository

ا	a	আ	ط	t	ত
إ	i	ই	ظ	z	জ
أ	u	উ	ع		‘
ب	b	ব	غ	gh	গ
پ	p	প	ف	f	ফ
ت	t	ত	ق	r	ক্ব
ث	th	ছ	ك	k	ক
ج	di,j	জ	گ	g	গ
چ	c	চ	ل	l	ল
ح	h	হ	م	m	ম
خ	kh	খ	ن	n	ন
د	d	দ	ه	h	হ
ڈ	d’	ড	و	w	ও
ذ	dh	য	ی	y	য়
ر	r	র	ے	ay	ে
ڑ	r’	ড়	ء		,
ز	z	য	َ		আ
ژ	zh	ঝ	ِ		ই/ি
س	s	স	ُ		উ
ش	sh	শ	َ + ا		আ
ص	s	স	ِ + ی		ঈ
ض	d	ও/য	ُ + و		ঊ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ও হিজরী 'অব্দ' গুলোর সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ নির্নয় পদ্ধতি

(ক) বঙ্গাব্দের সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ পাওয়ার জন্য প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৩ যোগ করতে হয়। যেমন -১২০০ বাং + ৫৯৩ = ১৫৯৩ খৃঃ

(খ) হিজরী অব্দের সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ পাওয়ার জন্য, নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করতে হয়। যেমন

$$\text{A.H.} - \frac{3 \times \text{A.H.}}{100} + 621 = \text{A.D.}$$

$$\text{হিঃ } ৭০০ - \frac{৩ \times ৭০০}{১০০} + ৬২১ = \text{খৃ.}$$

বা, ৭০০০ - ২১ + ৬২১ = খৃ.

বা, ১৩০০ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা, অধিবাসী এবং তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়

যে কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এর রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং এর অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূ-প্রাকৃতিক গঠন প্রনালী ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বাস্তবিকই দেশের জীবন ও সাংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। তাই যে কোন দেশের ইতিহাস সেদেশের ভু-গোলজ্ঞান ব্যতিরেকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা যায় না। তাই এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রায়োজন ।

একাধিক কারণে বাংলার সামাজিক জীবন চিত্রণে ভুগোল জ্ঞান অপরিহার্য। "প্রথমত মুসলিম আমলেই কেবল বিভাগপূর্ব সমগ্র দেশটি 'বাংলা' নামে অভিহিত হতো। দ্বিতীয়ত, মুসলমান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক সীমানা এর ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমার সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং এ দুটোই ভাষা-ভাষী অধিবাসীদের ভাবাগত ঐক্যের সঙ্গে মিলে যায়। মুসলমান শাসন এভাবে বাঙ্গালী অধিবাসী লোকদেরকে এক সাধারণ জীবনের আওতায় একীভূত করেন এবং এক ভাষা ও সংস্কৃতির পটভূমিতে সন্নিবেশিত করে। প্রকৃতপক্ষে এসময় থেকেই বাঙ্গালী ও বাংলার ইতিহাস শুরু হয়।" [১]

বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করছে । এদেশের প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র বর্তমানের ন্যায় অতীতও এত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল যে তা বাংলার অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা, মানসিক দৃষ্টি-ভঙ্গি ও জীবন-যাত্রা, আচার-পদ্ধতি এবং রীতি-নীতিতে একটি বিশিষ্ট্য ছাপ রেখে যায়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে একটি অতী প্রাচীন দেশ। অতি প্রাচীন কাল থেকে তা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ভৌগোলিক অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল এবং এ ভু-খন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠউর একটি পৃথক সত্তা অনেক আগে থেকে বিদ্যামান ছিল। সুতারাং বর্তমান বাংলাদেশ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী একটি দেশ । বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এবং তার অধিবাসী বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর অধ্যুষিত বিস্তৃত জনপথের একটা অংশ মাত্র । এ অঞ্চলের বাইরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ,বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যের অংশ এবং মায়ানমারের (বার্মার) আরাকানে বাংলা ভাষা-ভাষী লোক বাস করে। বর্তমানে বিশ্বে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় ২১কোটি।[২]

১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ হয়েছিল। "বাংলা তখন বৃটিশ ভারতের সর্ব প্রধান প্রদেশ ছিল। বিহার ও উড়িষ্যা এ প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আয়তন ছিল ১,৭৯,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৯,০০০,০০০ জন।"[৩] বঙ্গ ভঙ্গের ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। ১৯১১সকলে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হলেও বঙ্গ দেশ তার পূর্ববর্তী সীমানায় ফেরত ফেতে পারেনি।

তখন বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে । "নতুন ব্যবস্থায় পূর্ব বঙ্গ দার্জিলিং সহ পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে বঙ্গ দেশ গঠিত হয় । আসাম পৃথক প্রদেশ হিসেবে স্থান পায়। এর ফলে বাংলা ভাষা-ভাষী সিলেট, কাছার ও গোয়ালপাড়ার একটি অংশ আসামে থেকে যায় । বিহার ও ছোট নাগপুরেও বাংলা ভাষী অঞ্চল কিছুটা রয়ে গেল।"[৪]

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (অনুঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১ম খন্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২ইং, পৃ. ১

২. কে.এম. রাইহউদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা - ১৯৯৬ইং, পৃ. ২২

৩. A.R. Mallick, Partition of Bengal, P.1-2.

৪. কে, এম, রাইহ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান হয় এবং হিন্দু ও মুসলিম-এ দ্বিজাতি তত্ত্বের (Two Nation Theory) ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে পূর্ববঙ্গ তখন পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। অতঃপর ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, মোঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও মায়ানমার (বার্মা) এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । বাংলাদেশের আয়তন ৫৫৫৯৮বর্গমাইল বা ১৪৩৯৯৮.২৬ বর্গকিলোমিটার এবং বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। এর অবস্থান ২০°৩৪ ও ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০°১ ও ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ।[১]

বাংলাদেশের বর্তমান সীমানার সঙ্গে তার প্রাচীন সীমা রেখার হুবহু মিল বের করা দুরূহ ব্যাপার । কেননা, বাংলাদেশ বলতে বর্তমানে যে অঞ্চলটি বুঝায়, তখন সে অঞ্চলে কোন অখন্ড রাজ্য ছিল না । তখন এদেশ অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং রাজ্যগুলো বিভিন্ন জনপদ বা রাষ্ট্রে নামে অভিহিত হত। বিভিন্ন জনপদের সমষ্টিই বঙ্গ বা বাংলা। এ জন পদগুলোর মধ্যে বঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ, সমতট ও হারিকেল বিশেষভাবে উল্লোখযোগ্য। রাজশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এদের সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। আবার বিভিন্ন সময়ে এদের নামের মধেও পরিবর্তন দেখা গেছে। ফলে এসব রাজ্যের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে সুদূর অতীতের সীমানা মোটামোটিভাবে নির্দেশ করে-এ অঞ্চলের প্রাচীন মানব সমাজের কিছুটা পরিচয় লাভের প্রচেষ্টা একেবারে অসম্ভব নয়। প্রাচীন বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সমতট নামক জনপদ বর্তমান বাংলাদেশের তিনটি ভৌগোলিক বিভাগ গঙ্গা তথা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা, উত্তর বঙ্গ এবং নিম্ন বা দক্ষিণ বঙ্গের সাথে খাপ খায়।[২] ড.এনামুল হক প্রশ্ন রেখেছিলেন-বঙ্গ, পুন্ড্র প্রভৃতি স্থানবাচক না গোষ্ঠীবাচক শব্দ। এ সম্পর্কে আব্দুল জলিল বলেন-বঙ্গাঃ, গৌড়াঃ, রাঢ়াঃ, পুন্ড্রাঃ, প্রভৃতি গোষ্ঠিবাচক বহুবচনে শব্দ দেশ বুঝানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গাঃ অর্থে বঙ্গজনা, গৌড়াঃ অর্থে গৌড়াজনা ইত্যাদি বুঝায়।[৩]

আবার তা তাদের বিশেষ বিশেষ বাসস্থানের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাঢ় বলতে পশ্চিম বঙ্গ, সুক্ষ বলতে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ, পুন্ড্র বলতে উত্তর বঙ্গ, বঙ্গ বলতে পূর্ব বঙ্গ, সমতট- হরিকেল বলতে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান বুঝাত। এখনও রাঢ় বলতে মধ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বরেন্দ্র বলতে উত্তর বঙ্গকে বুঝায়।[৪] প্রাচীন বঙ্গদেশের সীমা সম্পর্কে ড. নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন- "উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হতে নেপাল, সিকিম ও ভূটান রাজ্য; উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল সাঁওতাল পরগণা-ছোট নাগপুর মালভুম-ধলভুম-কেওঞ্জর, ময়ুরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমা বিধৃত ভূমিখন্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়, পুন্ড্র, বরেন্দ্রীয়-রাঢ়া, সুহ্ম তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল, প্রভৃতি জনপদ।"[৫]

১. ঢাকা ডায়েরী-১৯৯৯ইং, পৃ. ৩।

২. Dr. A.K.M. Shamsul Alam, Sculptural Art of Bangladesh, P.22.

৩. এ.এফ.এম. আব্দুল জলিল, পাঁচ হাজার বছরে বাঙালা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, পৃ. - ২

৪. কে.এম. রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৫. উদ্ধৃতি ঃ কে.এম. রাইছউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং "যুগ যুগান্তরে নানা রূপান্তরের পর এ অঞ্চলের ভূমি যেভাবে স্থিতি নিয়েছে তার উত্তর সীমান্তে আছে গারো পাহাড়, পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়, পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের তারসিয়ারী যুগের গিরিশ্রেণী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এর মধ্যবর্তী স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গ অববাহিকা। এর অধিকাংশ স্থান পড়েছে বাংলাদেশে। পূর্বে আছে পাহাড়ী অঞ্চল, মাঝখানে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বরেন্দ্রভূমি, ময়মনসিংহের গড় অঞ্চল, কুমিল্লা-ময়নামতি-লালমাইর টিলাটঙ্গর। এসব এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সবটুকু জায়গায় ব-দ্বীপ।"[১]. অতএব দেখা যায় যে, "উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো খাসিয়া, লুসাই,জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই বাংলা নামে পরিচিত।[২]

প্রাচীন ঋগবেদে 'বঙ্গ' এর উল্লেখ নেই। 'বঙ্গ' শব্দের সর্ব প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়-'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে। সেখানে 'বঙ্গ' মগধের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।[৩] কিন্তু 'ঐতরেয় আরণ্যক' এর ভিত্তিতে বঙ্গের প্রাচীণতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাষ্যকারগণ ঐকমত্যে পৌছতে পারেননি। যেমন হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেছেন- "Some writers have traced the name of Vangas, another early Bengal tribe, to the Aitareya Aranyaka. In the text occur the words, vayamsi 'vangavaghadas-cerapadha'. The expression vangavaghada has been emended to Vanga-Magadha, that is the people of Vang and Magadha. The Aranyaka refers to them as folks who were guilty of transgrassion. Commentators, ancient and modern, differ as to the real meaning of the words used in the text. The possibility that the expressions in the Aranyanka singnify old ethnic names is not excluded. But it is extremely hazardous to build any theory about the antiquity of the Vangas on such fragile foundation."[৪]

'বোধায়ন ধর্মসূত্রে' 'বঙ্গ'এর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে তৎকালীন ভূ-খন্ড বা জনপদগুলিকে আর্যদের পবিত্রতার আলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। সর্ব নিকৃষ্ট অংশে 'বঙ্গ' এবং 'কলিঙ্গ' সহ কয়েকটি ভূ-খন্ডের নাম করা হয়েছে।এ নিকৃষ্ট এলাকায় অস্থায়ীভাবে বাস করলেও প্রায়শ্চিত করতে হত।[৫]পুরাণে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের তালিকায় 'অঙ্গ', 'বিদেহ', 'পুন্ড্র' ইত্যাদির সাথে 'বঙ্গ' যোগ করা হয়েছে।[৬] রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী দেশের তালিকায় 'বঙ্গ'এর উল্লেখ আছে; এতে বুঝা যায় 'বঙ্গ'রা তখন আর অসপৃশ্য বা বর্বর নয়।[৭] মহাভারতেও ভীমের দিগ্বিজয় অংশে 'বঙ্গ' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - "ভীম, পুন্ড্র এবং কুশীনদীর তীরে রাজাকে পরাজিত করে বঙ্গের রাজাকে আক্রমন করেন; এর পরে ভীম তাম্রলিপ্তির রাজাকে পরাস্ত করে কর্কট ও সুহ্ম এবং অন্য ম্লেচ্ছদের পরাজিত করেন। এ অঞ্চল সমূহ জয় করে ভীম লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)-এর দিকে যাত্রা করেন । সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী ম্লেচ্ছদের নিকট হতে তিনি কর আদায় করেন ।"[৮]

---

১. তোফায়েল আহমদ, যুগে যুগে বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯২ইং, পৃ. ১২

২ আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা - ১৯৮০ইং, পৃ. ১২

৩. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খন্ড) নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা-১৯৭১ ইং, পৃ. ১৩।

৪. R.C.Majumder(ed.), History of Bengal, vol-1. Dhaka- p. 7-8.

৫. R.C. Majumder (ed). op. cit. p. 8.

৬. D.C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Mediaval India, Delhi - 1991. p.p. 36-38

৭. R.C. Majumder, op. cit. p. 8

৮. R.C. Majumder op. cit. p.9.

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত বিবরণে 'বঙ্গ' নাম পাওয়া গেলেও বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা করা যায় না। মহাভারতে বেশ কয়েকটি রাজ্যের বা ভূভাগের নাম দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনায় Contiguity বা ভৌগোলিক সান্নিধ্য রক্ষার প্রতি নজর দেয়া হয়নি। তবে এটা বুঝা যায় যে, বঙ্গ একটি পূর্বাঙ্গলীয় দেশ বা জনপদ এবং এর অবস্থিতি ছিল 'অঙ্গ', 'সুহ্ম', 'তাম্রলিপ্ত', 'মুদগরক', 'মগধ' এবং 'পুন্ড্র' -এর কাছাকাছি। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়ের সীমা দেয়া হয়েছে 'লৌহিত্য' বা ব্রহ্মপুত্র। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, এ জনপদগুলি ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমেই অবস্থিত ছিল।

কালিদাসের রঘুবংশ নাটকেও বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রঘু 'সুহ্ম'দের পরাস্ত করে বঙ্গদের পরাস্ত করেন এবং 'রঘু' গঙ্গাস্রোত হন্তরেষু অর্থাৎ গঙ্গাস্রোত মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে বিজয় স্তম্ব স্থাপন করেন। গঙ্গার প্রধান স্রোত দু'টি ভাগীরথী ও পদ্মা। টলেমী গঙ্গার পাঁচটি শাখার উল্লেখ করেছেন; তার সর্ব পশ্চিম শাখা কামবাইসন এবং পূর্ব শাখা এন্টিবোল। ভাগীরথী থেকে কুশাইনদী পর্যন্ত এলাকা সুহ্মের অন্তর্গত ছিল। রঘু কর্তৃক সুহ্ম জয় ও সুহ্ম থেকে বঙ্গ জয় এবং কলিঙ্গের দিকে গমনের কথা উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গার দুই স্রোতের মধ্যবর্তী ভূ -ভাগই বঙ্গ। এ স্রোত ভাগীরথী এবং পদ্মা হতে পারে, আবার টলেমী বর্ণিত পাঁচটি স্রোতের যে কোন দু'টিও হতে পারে।[১]

মুসলিম শাসনামলে 'বঙ্গ' এর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক মিনহাজ -ই- সিরাজ কয়েক স্থানে 'বঙ্গ' এর উল্লেখ করেন। যেমন বখতিয়ার লিখজীর বিহার বিজয়ের পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন -" বিধর্মীদের হৃদয়ে লাখনৌতি এবং বিহার রাজ্যে এবং বঙ্গ ও কামরূদ রাজ্যে তিনি পূর্ণ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেন"।[২] এখানে দেখা যায় যে, মিনহাজ লাখনৌতি ও বিহারকে একসঙ্গে প্রথমে এবং বঙ্গ ও কামরূপকে একসঙ্গে পরে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, বিহার ও লাখনৌতির অবস্থান কাছাকাছি এবং বঙ্গ ও কামরূপের অবস্থান কাছাকাছি ছিল। আরও বুঝা যায় যে, বঙ্গ ও কামরূপ লাখনৌতির পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল।

মিনহাজ আরও বলেন-"রায় লখমনিয়া সকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পৌঁছে গেলেন ----- তাঁর বংশধরগণ এ সময় পর্যন্ত বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করেন"।[৩] এটা সত্য যে-"লক্ষণ সেন নদীয়া থেকে পলায়ন করে বিক্রমপুরে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দু'ছেলে কেশবসেন এবং বিশ্বরূপসেনন অন্ততঃপক্ষে ১২২৩ সাল পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এ সময় রাজধানী বিক্রমপুর ছিল কিনা তাতে সন্দেহ থাকলেও বিজয় সেন এবং বল্লাল সেনের দু'টি তাম্র শাসন এবং লক্ষণল সেনের পাঁচটি তাম্র শাসন বিক্রমপুর থেকে জারি করা হয়; কিন্তু লক্ষণ সেনের শেষ দুইটি অর্থাৎ মাঠাইনগর ও ভাওয়াল তাম্র শাসন বিক্রমপুর থেকে জারি হয়নি, বরং ধার্যগ্রাম থেকে জারি হয়; লক্ষণ সেনের উত্তরাধিকারীদের তাম্র শাসন ফলগু গ্রাম থেকে জারি করা হয়"।[৪] বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের তাম্রলিপিতে বিক্রমপুর ভাগকে 'বঙ্গ' এর অন্তর্ভূক্তকরা হয়েছে। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে 'বঙ্গ' এর 'নাব্যভাগ' এর কথা বলা হয়েছে। বিক্রমপুর ভাগকে মুন্সিগঞ্জ ও মাদারীপুর এবং নাব্যভাগকে ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়।[৫] ফলে বুঝা যায় যে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ এলাকা 'বঙ্গ' এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

---

১. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী - ঢাকা- ১৯৮৭ইং, পৃ. ৬।

২. মিনহাজ-উ-সিরাজ (অনূ.আ.কা.মা.জাকারিয়া) তাবকাত-ই- নাসিরী, ঢাকা- ১৯৮৩ ইং, পৃ. ২১।

৩। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৪. R. C. Majumder, op. cit, p. 251.

৫. D.C. Sircar, op.cit, p. 90

Dhaka University Institutional Repository

রাজা লক্ষণসেনের শেষ দিকে উপকূলবর্তী সুন্দরবন এলাকায় ভুক্মন পাল নামক একজন বৌদ্ধনর পতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খাড়ি অঞ্চলে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিয়ে তাম্র শাসন জারি করেন।[১] ভুক্মন পালের এ রাজ্য চব্বিশ পরগনা, খুলনা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত বলে মনে হয়।[২]

'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের একাংশে 'উপবঙ্গ' জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যশোর ও তৎসংলগ্ন ভুমিকে বঙ্গের একাংশ বা উপবঙ্গ বলা হয়েছে।[৩] 'শক্তি সঙ্গমতন্ত্রের' 'ষাট পঞ্চাশদ্দেশ' বিভাগে রত্নাকম বা সাগর হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূ-ভাগকে বঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪] এখানে রত্নাকম বলতে বঙ্গোপসাগর বুঝায়। সুতরাং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হতে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বঙ্গ এর সীমা।

সুতরাং উপর্যুক্ত সূত্র সমূহের আলোকে দেখা যায় যে কালিদাসের রঘু বংশে গঙ্গার স্রোতের মধ্যবর্তী স্থান বঙ্গ; অতএব, গঙ্গার পশ্চিম স্রোতে ভাগীরথী এবং পূর্ব স্রোত পদ্মার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ বঙ্গ। মিনহাজ-ই- সিরাজের সাক্ষ্যে মনে হয় রাঢ় এবং বরেন্দের পূর্বেই বঙ্গ এবং সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে দেখা যায়-ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ এলাকা 'বঙ্গ' এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। শক্তি সঙ্গমতন্ত্রের আলোকে 'বঙ্গ' এর দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসসাগর এবং উত্তর সীমা ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র এবং আরও দক্ষিণ 'মেঘনা' বঙ্গ এর পূর্বসীমাও ছিল। সুতরাং পশ্চিমে ভাগীরতী ও করতোয়া নদী,পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; এ বিস্তীর্ন ভূ-খন্ড নিয়েই প্রাচীন বঙ্গরাজ্য।

বাংলার প্রাচীন জনপদ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সবটুকু নিয়ে বাংলাদেশ বুঝাত। আবার কখনও বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ়, পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় ও তাম্রলিপ্ত রাজ্য বুঝাত। "মহা ভারতের যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুন্ড্র, কৌশিকিকচ্ছ, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এসব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল"[৫]

এসব রাজ্যের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। কেননা, যুগে যুগে বঙ্গের আয়তন বদলেছে, রাজশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এর সীমানা বার বার পরিবর্ধিত হয়েছে।

সমতট ঃ পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বাংলার প্রাচীন নাম সমতট। সমুদ্রস্পর্শী এলাকা বুঝাতে সমতট ব্যবহৃত হয়েছে। মেঘনার পূর্বদিকে বর্তমান কুমিল্লা, নোয়াখালী অঞ্চলই সম্ভবত প্রাচীন সমতটা। কেননা, এ অঞ্চল সমুদ্র নিকটবর্তী ছিল। "খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর স্তম্ব লিপিতে সমতটের নাম সম্ভবতঃ প্রথম উল্লেখিত হয়েছে।"[৬] সমতট আসলে প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বঅংশের এক নুতন রাজ্যের নাম। হিউয়েন সাং -এর ভাষায়-সমতট অঞ্চলটা ছিল আর্দ্র নিম্নভূমি। অবস্থান ছিল কামরূপের দক্ষিণে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা জেলা সমতটের অন্যতম অংশ। এক সময় এ জনপদের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগণার খাড়ি পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

---

১. A.M. Chowdury, Dynastic History of Bengal, Dhaka- p. 247.

2. মিনহাজ -ই- সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮, টীকা-৪।

৩. ডকটর কাজী দীন মুহাম্মদ, 'বাংলাদেশ ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ', অগ্রপথিক সংকলন আমাদের সুফীয়ায়েকেরাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ইং, পৃ. ২১।

৪. D.C. Sircar, op.cit, p. 90

৫. ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং, পৃ. ১।

৬. মাহবুবুর রহমান, মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়, তৌহিদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৮৮ইং, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে শুরু করে মেঘনা মোহনা পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী ভূ-খন্ডকেই খুব সম্ভবত বলা হত সমতট। জনৈক চীনা পরিব্রাজকের বিবরণ মতে (সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগ হতে) সমতটে এক ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করত। পরে এ রাজ্য খড়্গ বংশের শাসনাধীন হয়। এ সময় এর রাজধানী ছিল কুমিল্লা জেলার বড় কামতা।[১] এ সময় এর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের ফলে সমতট ও বঙ্গ একই এলাকা বুঝাত। এ সমতটের লালমাই ময়নামতির পাশেই ছিল পাট্টিকেরা রাজ্য।[২] রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের ১২২০ খ্রীষ্টাব্দের ময়নামতি তাম্র শাসনে দেখা যায় যে, অন্ততঃ ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেঘনা নদীর পূর্বদিকে কুমিল্লা অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যান্য তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর হতে বেশ কিছুদিন যাবত দেব বংশের স্বাধীন রাজ্য মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অঞ্চল প্রাচীনকাল হতে সমতট নামে পরিচিত ছিল।[৩]

হরিকেলঃ জনপদের প্রান্তসীমা বুঝাতে হরিকেল শব্দ প্রচলিত হয়। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং এর মতে-হরিকেল ছিল পূর্বভারতের প্রান্তসীমায়।[৪] সপ্তম শতকে বর্তমান কুমিল্লা নোয়াখালীর দক্ষিণ-পূর্বে ছিল হরিকেল জনপদ। চট্টগ্রাম এলাকাও এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজ বংশের বিবরণ হতে দেখা যায় যে, চন্দ্র দ্বীপের ত্রৈলোক্য চন্দ্র ছিলেন হরিকেল সম্রাটের প্রদান সহায়। এ সময় থেকেই হরিকেলকে বঙ্গের অন্তর্ভক্ত বলে ধরা হয়। হেমচন্দ্র হরিকেল নগরীকে বঙ্গের সঙ্গে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। আবার বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মঞ্জুরী মুলকল্পে' আলাদাভাবে হরিকেল, বঙ্গ, সমতটের উল্লেখ আছে।[৫] অবশ্য সকল যুগে হরিকের বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এরূপ অনুমান করা যায় না। হরিকেল শ্রীহট্ট (সিলেট) পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।[৬]

গৌড় ঃ গৌড় নামটি নিঃসন্দেহে অতিপ্রাচীন। তবে গৌড় বলতে কোন অঞ্চলটাকে বুঝাত এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। হর্ষ বর্ধণের অনুশাসন লিপি থেকে জানা যায় যে, মৌখরী রাজ ইশান বর্মন গৌড় বাসীকে পরাজিত করে সমুদ্র পর্যন্ত বিতাড়িত করেছিলেন।[৭] এতে ধারণা করা যায় যে, গৌড় সমুদ্র উপকূল থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না। ৬ষ্ঠ শতকে লেখা বরাহ মিহিরের বৃহৎসংহিতায় দেখা যায়-"গৌড় অন্যান্য জনপদ যথা পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট থেকে আলাদা একটি জনপদ। ভবিষ্য 'পুরাণে' গৌড়ের স্থান নির্দেশ করেছে আধুনিক বর্ধমানের উত্তরে, পদ্মার দক্ষিণে। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ সুবর্নের অবস্থিতিও ছিল এই অঞ্চলে।[৮] কাজেই সম্ভবতঃ বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ ও জেলার দক্ষিনাংশ প্রাচীনকালে গৌড় নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গের পালরাজারা 'গৌড়েশ্বর' বা গৌড় রাজ বলে অভিহিত হতেন। গৌড়ে আধিপত্য না থাকলে ও সেনবংশীয় রাজাগণ গৌড়েশ্বর উপাধী ধারন করেন।[৯]

---

১. অধ্যাপক কে. আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৮৮ইং, পৃ.
২. ডঃ এম. এ. আজিজ, 'প্রাচীন বাংলাদেশ' বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ (প্রথম খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৩ইং, পৃ. ২১
৩. A.M. chowdury, op. cit, 248.
৪. কে.এম. রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
৫. কে.এম. রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
৬. ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমিন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭), পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৯৬ইং, পৃ, ৪
৭. কে, এম রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৮. কে.এম. রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৯. ডঃ এম.এ. আজিজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

পুন্ড্র বা পুন্ড্র বর্ধনঃ বঙ্গের প্রাচীনতম জনপদগুলোর অন্যতম ছিল পুন্ড্র। উত্তর বঙ্গে পুন্ড্র জাতির আবাস স্থল পুন্ড্র বা পুন্ড্র রর্ধন নামে খ্যাত ছিল। 'পুন্ড্র' শব্দটির অর্থ কৃষিজীবী। পুন্ড্রগণ শাক-সব্জী ও আখের চাষ করত। উত্তর বঙ্গের বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর পুন্ড্র জনপদের আওতাভূক্ত ছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ই ছিল পুন্ড্র নগর বা পুন্ডবর্ধন। পুন্ড্র নগর পুন্ড্র রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। বৈদিক সাহিত্যে পুন্ড্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্বে বলা হয়েছে- "এ পুন্ড্র জাতি মুঙ্গেরের পূর্ব দিকে বসবাস করত, রাজত্ব করত কোশী নদীর উপকুলে।"[১] পরবর্তীকালের গুপ্তযুগের বিভিন্ন লিপিও চীনা পরিব্রাজকদের লেখা থেকে অনুমান করা যায় পুন্ড্র জাতির বাসস্থান পুন্ড্রবর্ধন আর বর্তমান উত্তর বাংলা এক জায়গা।

বরেন্দ্র / বরেন্দ্রী ঃ উত্তর বঙ্গের পুন্ড্র জনপদের সাথে সংযুক্ত বরেন্দ বা বরেন্দ্রী আরেক প্রাচীন ভৌগোলিক সত্তা। জপদের প্রধান শহর, মৌর্য ও গুপ্ত আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কেন্দ্র পুন্ড্রবর্ধনপুর বা পুন্ড্রনগরের অবস্থানও ছিল এই বরেন্দ্রী এলাকায়। সিদ্ধাকর নন্দীর 'রামচরিত' এর বরাত দিয়ে কে. এম. রাইছ উদ্দিন বলেছেন -"গঙ্গা আর করতোয়ার মধ্যে যে ভূ-খন্ড, বরেন্দ্রী ছিল তারই নাম।"[২] 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে এটি গঙ্গা নদীর পূর্বভাগে লক্ষণাবতী রাজ্যের অংশ বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে-"গঙ্গা (নদীর) দুই পার্শ্বে অবস্থিত লাখনৌতি রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিমাঞ্চলকে 'রাল' (রাঢ়) বলা হয়ে থাকে এবং সেদিকেই লখনৌর নগর অবস্থিত। পুর্বাঞ্চলকে 'বরিন্দ'(বরেন্দ্র) বলা হয়ে থাকে এবং দেওকোট (দেবকোট) নগর সেদিকে অবস্থিত।"[৩] অতএব লখনৌর বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ভীরভূম জেলার নগৌর এবং দেওকোট (বরেন্দ্র) দিনাজপুর জেলার অবস্থিত। সুতরাং 'রাঢ়' এবং 'বরেন্দ্রের' ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে 'তবকাত-ই-নাসিরীর বর্ণনা যথাযথ সঠিক।

রাঢ়ঃ প্রাচীন বঙ্গের রাঢ় জনপদের উত্তরতম সীমায় গঙ্গা-ভাগীরথী, পূর্বসীমায়ও নদী। মাঝের অংশটুকুই রাঢ় জনপদ। অজয় ছিল রাঢ়ের বিভক্তকারী নদী। তখন রাঢ় জনপদ সুহ্ম ভূমি ও বজ্রভূমি-এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলী জেলার বহুলাংশ ও হাওড়া জেলা প্রাচীন সুহ্ম জনপদ। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত হয়েছিল। অজয়নদের উত্তর দিকে রাঢ়ের অন্তর্গত যে ভূ-ভাগ তারই নাম উত্তর রাঢ় বা বজ্রভূমি। সাধারণভাবে উত্তর রাঢ়ের সীমা ছিল রাজমহল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্ডি রাঢ় দেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল এর রাজধানী ছিল কোটিবর্ষে । অনুমিত হয় যে, বর্তমান দিনাজপুর জেলার আধুনিক বাণগ্রাম এলাকাই ছিল প্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী কোটিবর্ষ।[৪]

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত বঙ্গ বিভিন্ন জনপদের সমষ্টি ছিল। পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ গুপ্ত সাম্রাজের পতনের পর পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জনপদ এক নামে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। সপ্তম শতকের প্রারম্ভে রাজা শশাঙ্কের আমলে বর্তমান মালদহ, মুর্শিদাবাদ হতে আরম্ভ করে উৎকল পর্যন্ত ভু-খন্ড এর রাষ্ট্রে ঐক্য বদ্ধ হয়। অষ্টম শতক হতে সব জনপদ ও বিভাগ বঙ্গ জনপদের সাথে একীভূত হয়ে যায়। এর নাম দেয়া হয় গৌড়। তারপর বঙ্গ দেশ পুন্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ -এই তিন জনপদে বিভক্ত হয়। সমগ্র দেশ বলতে তখন এই তিনটি জনপদের সমষ্টিকে বোঝাত। পাল ও সেন যুগে এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যে বঙ্গের বিভিন্ন জনপদকে সংযুক্ত করা সম্ভব হলেও বঙ্গ জনপদটি তখনও গৌড়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিগণিত হত। কিন্তু তথাপি বঙ্গের বাইরে বাঙ্গালী বলতে গৌড়ীয় বঙ্গ গৌড়দেশীয় বোঝাত। পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন জনপদ তার পুরাতন

১. কে.এম.রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২. কে.এম. রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৩. মনহাজ-ই- সিরাজ, প্রাগুক্ত, প. ৫৯
৪. কে.এম. রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র বিলোপ করে বঙ্গের সঙ্গে একীভূত হয় এবং বঙ্গ বা বাংলা নামে পরিচিত হতে থাকে। মুসলিম শাসনামলেই এ সকল জনপদকে একত্রিত করার চেষ্টা সফলকাম হয়। বাংলায় পাঠানযুগের পূর্বথেকে পশ্চিম বঙ্গ গৌড় ও পুর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' এ দু' নামে চিহ্নিত হত। ষোড়শ শতকে মোগল শাসনামল থেকে সমগ্র এলাকা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হয়।[১] বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌলার আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বাংলাদেশ। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ শাসনামলে বঙ্গ ভঙ্গের পূর্বপর্যন্ত এ অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল।

বাংলা নাম তত্ত্ব

অতি প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে এক জন পদ গড়ে উঠে এবং তা বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। বঙ্গ নামের উৎস সম্পর্কে কয়েক ধরণের মতবাদ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এবং আর্য বংশোদ্ভূত হিন্দু ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ বঙ্গ নামের উৎস সম্পর্কে আর্য বংশোদ্ভূত হিন্দু লেখকগণ যে মতটি গ্রহণ করেছেন তা হল- মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত আছে যে, "ক্ষত্রিয়রাজ 'বলি' অপুত্রক ছিলেন। তিনি একদিন স্নান করতে এসে দেখলেন, এক অন্ধ ঋষি জাহ্নবির জলে ভেসে যাচ্ছেন। ধর্ম পরায়ণ পর দুঃখ কাতর নরপতি ঋষি কে জল হতে তুলে এনে সযত্নে স্বীয় গৃহে আনলেন এবং অতিশয় ভক্তির সাথে তার সেবা সৎকার করলেন। অনন্তর রাজা যখন জানতে পালেন যে, ঐ অন্ধই মহাশক্তিসম্পন্ন দীর্ঘতমা ঋষি, তখন তিনি তাঁর মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করবার জন্য তাঁর নিকট অনুনয় করতে লাগলেন। ঋষি রাজার অনুনয়ে সম্মত হলে রাজা স্বীয় পত্নীকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। কিন্তু রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমা ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখে তার সাথে সঙ্গত হতো অনিচ্ছাবশত ঃ একদাসীকে তার নিকট পাঠালেন। ঋষি সেই শূদ্রা দাসীর গর্ভে ১১টি পুত্র উৎপন্ন করলেন। দাসী গর্ভজাত পুত্রদেরকে বিদ্বান হতে দেখে রাজা অন্ধ ঋষিকে বললেন-"ইহারা আমার পুত্র" কিন্তু ঋষি বললেন-"ইহারা তোমার পুত্র নহে, আমার ঔরসে শুদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুদেষ্ণা আমার উপর ভীতশ্রদ্ধ হয়ে এক দাসীকে আমার নিকট পাঠিয়ে ছিল।"[২]

এরপর রাজা দীর্ঘতমা ঋষিকে সন্তুষ্ট করে, রানী সুদেষ্ণাকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ঋষিবর রাজ্ঞীর অঙ্গ স্পর্ষ করে বললেন-"তোমার আদিত্যতূল্য তেজস্বী পাঁচপুত্র জন্ম গ্রহণ করবে। সেই পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র, ও সুক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই ভূ-মন্ডলে তাহাদের স্ব স্ব নামে একটি দেশ বিখ্যাত হইবে।"[৩] বলিরাজ পুত্রগণ প্রাচ্য ভূ-খন্ডে যে স্থান অধিকার করে রাজ্য স্থাপন করেন সে সব স্থান তাঁদের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুক্ষ্ণ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই পৌরানিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত পঞ্চপুত্রের বংশ ধরগণ এবং ঐ সকল প্রদেশাধিবাসীর জাত্যাংশ আর্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলন সঞ্জাত।

১. মহাভারত,আদি পর্ব

২. "তাংস দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্টা বেদীমহাব্রবীৎ।
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্য বার্চস:॥
অঙ্গ:বঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ পুন্ড্রা: সুক্ষাশ্চতে সুতা: ।
তেষাং: দেশা: সমখ্যাতা: স্বনামকথিতা ভুবি॥"
(মহাভারত, আদি পর্ব)

৩. অঙ্গ=বর্তমান ভাগলপুর, পুন্ড্র=উওরবঙ্গ, সুক্ষ=পশ্চিম বঙ্গ, বঙ্গ=দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ, কলিঙ্গ= উড়িষ্যার (উৎকল) দক্ষিণভাগ। (বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস, অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গ নামের উত্তম সম্পর্কে মুসলিম পন্ডিতগণ সম্পূর্ন এক ভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির আদি সূচনায় মানব জাতিকে এক গোষ্ঠীতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে- "সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভূক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ পয়গাম্বর পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি ও প্রদর্শনকারী হিসাবে ------।" [১] পরবর্তীকালে জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির ফলে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-" আর সমস্ত মানুষ একই উম্মত ভূক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে ।"[২] পবিত্র কুরআন ও পবিত্র তাওরাতের ভাষায় আজ থেকে সাড়ে সাত হাজার বছর পুর্বে "হযরত নূহ (আঃ) এর সময় এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়।"[৩] উক্ত প্লাবন থেকে এ উপমহাদেশ ও বাদ পড়েনি।[৪] হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শো বছর জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময় ইসলাম প্রচার করে তিনি তার সন্তান সন্ততী সহ পচাশি জন লোককে আল্লাহর একত্ববাদের পথে আনতে পেরেছিলেন। ফলে এ পচাশি জন ব্যতিত দুনিয়ার সমস্ত বিপদগামী মানুষ এ মহাপ্লাবনে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। " অতঃপর তারা তাঁকে নূহ (আঃ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাঁকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ।"[৫] এ মহা প্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) ইচ্ছানুযায়ী তাঁর পরিবার বর্গ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। যে সব অঞ্চলে তাঁরা বসতি স্থাপন করেন, তাদের নামানুসারে সেগুলোর নাম রাখা হয়।[৬] এভাবে শুরু হয় দ্বিতীয় বারের মত মানব জাতির আবাদ। বর্তমান মানব সমাজ তাদেরই বংশধর। তাই নুহ (আঃ) এর অপর নাম হল দ্বিতীয় আদম।[৭]

গোলাম হুমায়ন সলীমের বর্ণনা মতে-"হযরত নূহ (আঃ) এর এক পুত্রের নাম ছিল হাম; হামের পুত্র হিন্দ, হিন্দের দ্বিতীয় পুত্রের নাম বং। বং ও তার সন্তানেরা এতদঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল বলেই এ জনপদের নাম হয় বঙ্গ।" তিনি আরও বলেন " হিন্দের পুত্র বঙ্গের প্রশংসনীয় চেষ্টায় বাংলা অঞ্চলে জনবসতি হয়। তাঁর বংশ ধরেরা এ অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও সুন্দর করেন এবং তাঁরা এ দেশ শাসন করেন।"[৮]

বঙ্গের উৎস নির্দেশ প্রসঙ্গে অধিকাংশ লেখক বিনা দ্বিধায় প্রথমোক্ত কাহিনী গ্রহণ করলেও মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এটাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা এটাকে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপরে আর্যত্ব আরোপের প্রয়াস বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত দীর্ঘতমা ঋষি বা আর্যদের ভারতে আগমনের বহু পূর্বে থেকেই এ অঞ্চলে জনপদের যে অস্তিত্ব ছিল তা বহু লেখকই স্বীকার করেছেন। আকরম হোসেনের মতে-"দীর্ঘতমা ঋষি খৃষ্টপূর্ব ১৬৯০ অব্দে বর্তমান ছিলেন।" তিনি বলেন-"রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যানের মধ্যে যদি বিন্দু মাত্র সত্য থেকে থাকে, তাহলে বলতেই হবে-আর্যরা যখন পাঞ্জাবের মাটিতে পা রেখে ছিল, তখন থেকেই বঙ্গ ও তার প্রতিবেশী জনপদসমূহ সুসভ্য ছিল।"[৯] আবুল কাশেম ফজলুল হকের মতে-"'বঙ্গ' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে-'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যক-উভয়ই বেদের অর্ন্তভূক্ত। রামায়ণ, মহাভারতেও এই ভুখন্ডের কোন কোন অংশ ও মানুষের পরিচয়

১. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত- ১১৩
২. আল-কুরআন, সূরা-১০, আয়াত- ১৯।
৩. আল-কুরআন, সূরা-১১, আয়াত-৭১,
তৌরাত শরীফ: ১ম খন্ড, সৃষ্টি কিতাব।
৪. মনসুর মুসা (সম্পা:), বাঙলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা- ১৯৭৪ইং পৃ. ৪৬
৫. আল-কুরআন, সূরা - ৭, আয়াত- ৬৪
৬. গোলাম হুসায়ন সলীম (অনূ. আকবর উদ্দীন), বাঙলাদেশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৭৪ ইং, পৃ. ১৫-১৬
৭. আখতার ফারুক, বাঙালীর ইতিকথা, জুলকার নাইন পাবলিকেশন্স, ঢাকা- ১৯৮৬ইং, পৃ. ৪৯-৫৭
৮. গোলাম হুসায়ন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৯. মনসুর মুসা (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং রামায়ণ মহাভারতের রচনাকাল যদিও খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ববর্তী এক হাজার বছরের মধ্যে বলেই অধিকাশ পন্ডিত অনুমান করেছেন, তবু এগুলোতে যে এর চেয়েও অনেক প্রাচীন প্রসঙ্গের অবতারণা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ সব গ্রন্থ রচনার অনেক আগেই যে, এই ভূ-খন্ডে কৌম সমাজ ও কৌম চেতনায় বিকাশ ঘটেছিল, তা নিশ্চিত। অনুমান করা যায়, খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেও এ অঞ্চলে মনুষ্য বাস ছিল। বৈদিক সহিত্যে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি আর্য ঋষিদের যে দৃষ্টি পরিচয় পাওয়া যায়, তা বৈরিতা ও অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ।"[১]

কাজেই "মহাভারতের বক্তব্যটি এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে মনে হয়।"[২] ব্রাত্যজনের চরিত্র হননের জন্য এটি একটি চিত্তাকর্ষক ব্রাহ্মণ্য প্রচার"।[৩]

সুতরাং আর্যদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি নয় তা সুস্পষ্ট। মহা প্রাচীনকালে এদেশের নাম 'বং' এর উৎস সম্পর্কে পূর্বোক্ত মুসলিম ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হিন্দু লেখখগণ নিশ্চয় অজ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু সে সম্বন্ধে তাদের কোন মতামত প্রকাশ করেননি।

আবার সাগর তলের উপর বাংলাদেশের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়ে তা সাগরে তটের সম্পৃক্ত হয়েছিল বলে আদি যুগে এ দেশের অনেক অঞ্চল ছিল প্রধানতঃ জলাভূমি। তাই কোন কোন পন্ডিত মনে করেন- "তিব্বতী বঙস্ (বঙ) শব্দে জলা ও নিম্নভূমি বুঝায়; এ দেশের ভুমি 'জলা' ও 'নিচু' ছিল বলেই এর নামকরণ বঙ্গ (তিব্বতী বঙস্) হয়েছিল।"[৪]

বঙ্গালা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথম ব্যাখ্যা দান করেন আবুল ফজল। তিনি বলেন- "The original name of Bangalah was Beng. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in hight and twenty in breath throughout the province which were called el. From the suffix. this name Bangalah took its rise and currency."[৫] আবুল ফজলের দ্যর্থহীন ঘোষণা যে-'বঙ্গ'-ই বঙ্গালা নামে রূপান্তরিত হয়েছে। 'রিয়াজ-উস-সালাতিনে'-এ অভিমত পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।[৬] আবুল ফজলের এ ব্যাখ্যা সবাই মেনে নেননি। রমেশ চন্দ্র মজুমদার আবুল ফজলের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন - "বঙ্গ দেশের নাম হইতে 'আল' যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গাল বা বাংলা নামের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা স্বীকার করা যায় না। ---- বঙ্গাল দেশের নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের বাংলা-এই নামকরণ হইয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"[৭]

রমেশ চন্দ্র মজুমদার ডি,সি, সরকার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ 'বঙ্গ' ব্যতিত বঙ্গাল নামে আরও একটি পৃথক রাজ্য ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে তারা 'বঙ্গাল' রাজ্যের সঠিক সীমানা নির্ধারণ করতে পারেননি। বঙ্গাল দেশের সীমা প্রসঙ্গে। ডঃ মজুমদার বলেন- "The Geographical unity of Bengal, too, was not evidently fully realised in ancient times. No common name for the whol province was ervolved, at though the number of old regional names was gradully

১. আবুল কাশেম ফজলুল হক, 'বাঙ্গালী জাতি' মনসুর মুসা (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩

২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আর্থনীতিক ভু-গোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৮৮ ইং, পৃ. ১

৩. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা- ১৯৮৫ইং, পৃ-১৩

৪. ডঃ নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১ম খন্ড), ১৩৪৪বাং, পৃ-৩

৫. আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী (২য় খন্ড), পৃ-১২০

৬. গোলাম হুসায়ন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. -১৬

৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস, পৃ-২

Dhaka University Institutional Repository

being reduced. Even upto the very end of the Hindu rule, Gauda and Vanga denoted not only two distinct geographical divisions but, to a sertain extent, also two political entities. ---- The absence of a common designation for the country of the people as a whol seems to show that inspite of the political unity for a long period under the palas, and for shorter periods under other dynasties, a united Bengali nation, as we understand it, had not yet probably come into existence, and there was a broad demacation between Eastern and western Bengal, traces of which, persist even today." [১]

ডি,সি, সরকারের মতে-'বঙ্গাল' সমুদ্রোপকূলে বাকের গঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তিনি বলেন- "Chandra-drip and vengadesa thus apper to be more or less indentical. As chandra-drip no other than the celebrated Bakla. Chanra-drip (i.e. parts of Buckergong Distrect and the adjonnig region), the Buckergonge area was apparently included in Vanglades."[২] তিনি আবার বলেছেন-"The Raghuvamsa reference to the defeat of the Vonga people in the land waterd by the lower streens of the Gonges and epigraphic references to vanga comprising the Vekrampur region of Dhaka and Faridpur and to the Navya region of vanga very probably in the Faridpur and Buckergonge districts, leave hardly and doubt that vanga certainly included at least parts of present Dhaka, Faridpur and Buckergonge districts."[৩]

ডঃ হেমচন্দ্ররায় চৌধুরী বঙ্গালার পরিচিতি দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তথ্যের অভাবে তিনি বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যান। তাঁর মতে বঙ্গাল হতে মোগল সুবা বঙ্গালার নামকরণ হয়, বঙ্গ হতে নয়। তিনি বঙ্গালা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আবুল ফজলের বক্তব্য উল্লেখ করেন এবং ইউরোপীয় লেখকদের বেঙ্গালা শহরেরও উল্লেখ করেন। কিন্তু বঙ্গালার ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দেননি।[৪]

আসলে 'বঙ্গাল নামে' পৃথক একটি দেশ আদৌ ছিল কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের বঙ্গাল এর দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের তটভূমি এবং ডি,সি, সরকারের 'বঙ্গাল'-এর সমুদ্রোপকূলে বাকেরগঞ্জ অঞ্চল উভয়েই তাঁদের চিহ্নিত প্রাচীন বঙ্গের সীমানায় মধ্যেই অবস্থিত ছিল। কাজেই জনাব মজুমদার ও সরকারের 'বঙ্গ' এবং 'বঙ্গাল'-এর সীমানার সংজ্ঞা থেকে ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক যে, 'বঙ্গাল' নামে পৃথক কোন দেশ বা সত্তা আছিল না। তাই আব্দুল করিম বলেছেন- " প্রাচীনকালে বা কোনকালে বঙ্গাল নামে আলাদা কোন দেশ বা ভূ-ভাগ ছিল না।"[৫]

বঙ্গাল নামে কোন দেশ বা ভূ-খন্ড না থাকলেও বঙ্গাল শব্দের প্রচলন ছিল। "সেমেটিক ভাষায় আল অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে (বং + আল) বঙাল বা বঙ্গাল (অর্থাৎ বং-এর বংশধর) শব্দের উৎপত্তিটাকে উপেক্ষা করা যায় না ।"[৬]

---

১. R.C. Majumder, op. cit, p. 21
২. D. C. sircar, op. cit,p. 133
৩. D.C. sircar, op. cit, p.133
৪. R. C. Majumder, op. cit, p.18-19
৫. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭
৬. আব্দুল মান্নান চালিত, প্রাগুক্ত,পৃ-১৫

Dhaka University Institutional Repository

পুরাতন চীন দেশীয় পুঁথিপত্র ও ইন্দোচীনের আন্তঃপাতী আনাম (Annam) প্রদেশের প্রাচীন বিবরণের বরাত দিয়ে ড. এনামুল হক বলেছেন-"খৃষ্ট পূর্বসপ্তম শতাব্দীতে ভারত বর্ষের বঙ্গ-লঙ (Bong-long) প্রদেশের নাক-লম (Luck-lom) নামক অসীম সাহসী বরি যুবা তাঁ কতিপয় অনুচরবৃন্দ দক্ষিণ পূর্বএশিয়া গমন করেন তথাকার নৃ-পতিকে তাড়িয়ে দিয়ে সে রাজ্যের অধিশ্বর হন এবং 'উকি' (Auki) নাম্নী এক আনাম সুন্দুরীকে রাজ মহিষীরূপে গ্রহণ করেন। তার অধঃস্তন আঠার জন বঙ্গ-লঙ দেশীয় নৃ-পতি আনাম রাজ্যে প্রায় তিনশত বৎসর, রাজত্ব করেছিলেন। উক্ত লাক-লম ও তাঁর অনুচরবৃন্দ ছিলেন নাগবংশীয় অনার্য। আনাম দেশের তৎকালীন ব্যাকরণ 'লা' নামক একটি অনার্স ব্যবহৃত প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল; তাঁরা তাদের মাতৃভূমির মূল নাম বঙ্গ-লঙ সংক্ষিপ্তরূপে 'বঙ্গ' করে এবং তার সঙ্গে 'লা' প্রত্যয় সংযুক্ত করে তাঁদের অধিকৃত রাজ্যের নতুন নাম করণ হয় বঙ্গলা; কালক্রমে তার বিবর্তিতরূপ হয় বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গালা।"[১]

আব্দুল করিম বলেছেন-"প্রাচীন লিপির 'বঙ্গাল' দ্বারা বঙ্গাল দেশ না বুঝিয়ে 'বঙ্গ' এর অধিবাসী বুঝান হয়েছে এবং 'বঙ্গাল দেশ' দ্বারা বঙ্গালদের দেশ বুঝান হয়েছে"। তিনি আরো বলেন- প্রথম মুসলমান রাজ্য লখনৌতি নামে অনেক দিন ছিল। কিন্তু 'বঙ্গ' অধিকৃত হওয়ার পরে তারা দেখে যে, 'বঙ্গাল' শব্দটি বহুল প্রচলিত এবং এই শব্দ দ্বারা 'বঙ্গ' এর জনগনকে বুঝায়। প্রথম বঙ্গালা উল্লেখকারী মুসলমান ঐতিহাসিক বরণীর তারিখ-ই- ফিরুজ শাহীতে পাই আবু বঙ্গাল বা বঙ্গালদের পিতা এবং এখানে বঙ্গাল দ্বারা বঙ্গাল জাতির পরিচয় দেয়া হয়। এই বঙ্গাল থেকেই বাঙ্গঅলা।"[২] সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, 'বঙ্গ' থেকেই 'রঙ্গাল' বাঙ্গাল' এবং বাংলা শব্দের ইৎপত্তি হয়েছে।

গিয়াস উদ্দীন বলবনের সময় থেকে 'বঙ্গালাহ্' নাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয় এবং বাংলার পুর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল বুঝাতে সাধারণতঃ এর নাম ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে বারণীই সর্ব প্রথম 'বাঙ্গালাহ্' নাম ব্যবহার করেন। তিনি সুলতান বলবনের নিম্নোক্ত উক্তির উল্লেখ করে বলেন- "আমি লক্ষণাবতী এবং 'বাঙ্গলা' অঞ্চল আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে (বুঘরা খান) অর্পন করেছি, এদেশ কিছুকাল যাবত ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।"[৩] সুলতানের অপর একটি উক্তি হল- "ইকলিম-ই-লক্ষণাবতী ও আরসা-ই-বাঙ্গালাহ্ বশে আনতে আমাকে কি বিরাট রক্তপাতইনা করতে হয়েছে।"[৪] বারণীর এ সমস্ত উল্লেখ থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, সুলতান বলবনের সময় লক্ষনাবলী থেকে 'বাঙ্গালাহ্' একটি সম্পুর্ণ আলাদা অঞ্চল ছিল।

বারণীর প্রমাণাদি থেকে আরও জানা যায় যে, বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলমানগণ এর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছিলেন। যেমন-'আরসা-ই-বাঙ্গালাহ', 'ইকলিম-ই বাঙ্গালাহ', ও 'দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ্'। " ডক্টর কে, আর, কানুনগো আরসা,-ই- বাঙ্গালাহ্, কে সাতগাঁও অঞ্চল (দক্ষিণবঙ্গ), ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ্কে সোনারগাঁও অঞ্চল (পূর্ব বঙ্গ) এবং দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ্কে সংযুক্ত সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করেছেন।"[৫]

---

১. আব্দুল কাদির, ডঃ এনামুল হক বক্তৃতা মালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা -১৯৮৪ ইং, পৃ-১৩৪

২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮

৩. জিয়াউদ্দীন বারণী, তারিখ-ই-ফীরুজশাহী,পৃ-৫৩

৪. জিয়াউদ্দীন বারণী, তারিখ-ই-ফীরুজশাহী,পৃ-৯৩

৫. ডঃ এম, এ, রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ-৩

Dhaka University Institutional Repository

বারনীর অপর উক্তি-"লখনৌতির শাসক ইলিয়াস, যিনি ঐ রাজ্য জোরপুর্বক দখল করেন, এ সময়ে পানি বেষ্টিত বঙ্গালার পাইক এবং ধনুকদের একত্রিত করেন এবং বিনা কারণে ত্রিহুত জয় করেন।"[১] এখানে বঙ্গালাকে বলা হয়েছে আব গিরিফতা যার অর্থ পানিতে ভিজা; যার উপর বেশি বৃষ্টিপাত হয়, পানিবেষ্টিত, নদ-নদী বেষ্টিত, বন্যা কবলিত। সুতরাং বারণী বঙ্গালাকে পানিবেষ্টিত, নদ-নদী বেষ্টিত, বন্যা কবলিত এবং অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলরূপে চিত্রিত করেছেন। এ অঞ্চল নিঃসন্দেহে বঙ্গ। রঘু বংশের 'গঙ্গা-স্রোত হন্তারেযু' তিরুমালাই লিপির বঙ্গালদেশ যেখানে বৃষ্টি থামেনা' কথাগুলির প্রতিধ্বনি করে বারণীর 'আবগিরিফতা' বঙ্গালা। --- সুতরাং প্রাচীনকালের 'বঙ্গ' এবং বারণীর 'বঙ্গালা' এক ও অভিন্ন।[২]

'বঙ্গালা' নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইবনে বতুতার (১৩৪৫-৪৬খ্রীঃ) ভ্রমন বৃত্তান্তে। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দীন; তাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। তাঁর সময়ে দক্ষিণ ও পুর্ববঙ্গ 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত ছিল এবং বাঙ্গালী নামে অভিহিত হত।[৩] পরবর্তী কালে 'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালী' শব্দ দু'টো এ অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। সুলতান হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে সমগ্র বঙ্গদেশ 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়। তাঁর আধিপত্যের ফলে লক্ষণাবতী ও বাঙ্গালা একত্রীভূত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। তিনি এই যুক্ত অঞ্চলগুলিকে বাঙ্গালা নামে এবং অধিবাসীদের বাঙ্গালী নামে অভিহিত করেন। সুলতান নিজে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' ও 'শাহ্-ই-বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করেন। তাঁর প্রধান আমত্য বর্গ ও সৈনিকেরা 'রায়ান-ই-বাঙ্গালা', 'লস্কর-ই-বাঙ্গালা' ও 'পাইক-ই-বাঙ্গালাহ্' নামে পরিচিত হন।[৪] এভাবেই সুলতান ইলিয়াস শাহ 'বাঙ্গালা'র প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিগণিত হন। এর ফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একত্রীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্যের পটভূমি স্থাপিত হয়। এ সময় থেকে তেলিয়াগর্হি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ বাঙ্গালা-এই একটি সাধারণ নামে পরিচিত হয়। এটা বাস্তবিকই বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সময় থেকে পূর্ব বাংলার অথবা উত্তর বঙ্গের অথবা পশ্চিম বঙ্গের যেখানকারই অধিবাসী হোকনা কেন, তারা বাঙ্গালী এই সাধারণ নামে পরিচিত হল এবং অন্যান্য দেশের লোকেরাও তাদের ঐ নামেই অভিহিত করত।[৫]

মোগল আমলে 'বাঙ্গালা' নামের বহুল প্রচার হয়। সুলতানী আমলের 'বাঙ্গালা' বাদশাহ্ আকবরের শাসনামলে 'সুবা-ই-বাঙ্গালা'য় রূপান্তরিতহয়।[৬] প্রাদেশিক শাসন কর্তারা বাঙ্গলালার সুবাদাররূপে অভিহিত হন। আকবরের আমলে 'বাঙ্গালাহ্' নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের মাধ্যমে ইউরোপীয় পন্ডিতদের কাছে এ ভূখন্ড 'বেঙ্গালা' নামে পরিচিত ছিল। পর্তুগীজদের বেঙ্গালা বৃটিশ শাসনামলে বেঙ্গাল (Bengal) নামে রুপান্তিরিত হয় যা ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। উপমহাদেশের বিভাগোত্তর যুগে 'বেঙ্গল ' এর পূর্বাঞ্চল পূর্ববঙ্গ, পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ নামে আত্ম প্রকাশ করে।

---

১. জিয়া উদ্দীন রাবণী, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮৬

২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১০

৩. H.A.R. Gibb, Ibn Battuta: Travels in Asia and Africa, Landon. 1963. p.267

৪. ডঃ এম. এ, রহীম,প্রাগুক্ত, পৃ- ৪

৫. ডঃ এম. এ, রহীম,প্রাগুক্ত, পৃ- ৪

৬. আবুল ফজল মোগল আমলের সুবা-ই-বাঙ্গালার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, সুবা-ই-বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্রগ্রাম হতে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে অর্থাৎ উওরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে হুগলী জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। সুবা-ই-বাঙ্গালা পুর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে সুবা বিহার অবস্থিত ছিল। কামরূপ এবং আসাম ও সুবা-ই- বাংলার সীমান্ত অবস্থিত ছিল। (আইন-ই- আকবরী ২য় খন্ড,পৃ-১১৬)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার প্রাচীন জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশ মানব বসতি কখন শুরু হয় তা জানার কোন উপায় নেই। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদিম সভ্যতার যেরুপ বিবর্তন ঘটে ছিল বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও নব্য প্রস্তর যুগের এবং তাম্র যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসকল যুগে বাংলার পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলেই মানুষ বসবাস করত এবং পর্যায় ক্রমে তারা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বৈদিক যুগে আর্যদের সাথে বাংলাবাসীর কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাংলার জনগোষ্ঠীকে অনার্য ও অসভ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় যে, বাংলার আদিম অধীবাসীগণ আর্য জাতির বংশোদ্ভুত নয়। বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করে পন্ডিতগণ সিদ্বান্ত দিয়েছেন যে, আর্যগণ এদেশে আসার পূর্বে বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করত। নৃ-তাত্ত্বিকগণও বর্তমান বাংঙালীর দৈহিক গঠন পরীক্ষা করে এ সিদ্বান্ত সর্মথন করেছেন।

তবে কারা ছিলেন বাংলার অধিবাসী ? সর্ব প্রথম কোন সময় থেকে এখানে মানব বসতি শুরু হয় ? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর পূর্বে হযরত নূহ (আঃ) এর সময়ের মহাপ্লাবণের পর তাঁর প্রপৌত্র বং ও তাঁর বংশধর গন এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং ক্রমে এখানে বঙ্গ জনগোষ্ঠি গড়ে উঠে। গোলাম হুমায়ন সলীমের মতে-"হিন্দের পুত্র বং এর প্রশংসনীয় চেষ্টায় বাংলা অঞ্চলে জনবসতি হয়। তাঁর বংশ ধরেরা এ অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও সুন্দর করেন এবং এ দেশ শাসন করেন।"[১] তবে তারা কতকাল বঙ্গ শাসন করবেন, তা অবশ্য জানা যায় না।

কালের বিবর্তনে নানা জাতির উদ্ভবক ঘটে। ফলে অতি প্রাচীনকালে এসেআরও মানব গোষ্ঠীর আগমন ঘটে। নৃতাত্ত্বিকগণের মতে-এদের মধ্যে অষ্ট্রলয়েড, মঙ্গোলয়েড ও দ্রাবিড়গণ প্রধান। বঙ্গ জনগোষ্ঠী এবং এরা সকলেই প্রাক আর্য যুগে এ দেশে এসেছিল। আর এরাই বাংলার আদিম গোষ্ঠী বলে পরিচিত। বাংলাদেশের জন্য প্রকৃতিতে দ্রাবিড়ীয় উপাদান প্রধান। দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠীর গায়ের রং সাধারণত বাদামী থেকে কালো, যারা উচ্চতায় খর্বাকৃতি। যাদের মাথা লম্বা কিন্তু নাক খুব চওড়া।[২] দ্রাবিড়দের পূর্ব পুরুষগণকে অষ্ট্রলয়েড বলা হয়। এ জনগোষ্ঠীকে অষ্ট্রিক বা অষ্ট্রো এশিয়াটিকও বলা হয়। প্রাচীন সাহিত্যে এদের 'নিষাদ' জাতি বলা হয়েছে। সম্ভবত তারা তাদের আদি আবাস ভূমি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে এ অঞ্চলে আসে। এরা কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ হিসেবি চিহ্নিত।

অষ্ট্রলয়েড বা অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির প্রায় সমকালে সম্ভবতঃ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে। সেমেটিক সভ্যতার উৎস সামের প্রপৌত্র এবং হযরত নূহ (আঃ) এর সপ্তম অধঃস্তন ও তাঁর বংশধর আবুফীর ছিলেন উপমহাদেশের দ্রাবিড়দের আদিপুরুষ।[৩] আবুফীর ও তাঁর বংশধরেরা প্রথমে সিন্ধু এবং পরে গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্রাবিড় সভ্যতার গোড়পত্তন করেন। এঁরা প্রাচীন সভ্যতার আবাস স্থল ভূ-মধ্য সাগার অঞ্চলে নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

নিষাদ জাতির পর আরও কয়েকটি জাতি এদেশে আগমন করে। তাদের একটির ভাষা দ্রাবিড় এবং আরেকটির ভাষা 'ব্রক্ষ-তিব্বতীয়'। এদের সম্বন্ধে তেমনী কিছু জানা না গেলেও তাদের পরাস্ত করে যারা বাংলাদেশের বসতি স্থাপন করে তাদের বংশ ধরেরাই বর্তমান কালের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্ত প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ। তারা যে বৈদিক আর্যগণ থেকে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন, এ বিষয়ে পন্ডিতগণ একমত।

---

১. গোলাম হুসায়ন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৮

২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য রিজলে, The people in India. কলিকতা -১৯০৮ইং

৩. আখতার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫০

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় পাঁচ ছয় হাজার পুর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে এদেশে এসে নেগ্রিবটোদের উৎখাত করে অষ্ট্রিক জাতি। এরাই ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির পূর্বপুরুষ হিসেবে বিহ্নিত। বাঙালী জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতিতে এদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। অষ্ট্রিক জাতির সমসাময়িক কিংবা কিছুকাল পর এদেশে আগমন করে দ্রাবিড় জাতি। "অষ্ট্রিক জাতির তুলনায় তারা উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিল। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রনেই সৃষ্টি হয়েছে আর্যপূর্ব বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী। এদের রক্ত ধারা বর্তমান বাঙালী জাতির মধ্যে প্রবাহমান। অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলেছিল, তার সঙ্গে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালী জাতি। ১

বাংলায় নিষাদ জাতি প্রধানত কৃষি কার্য দ্বারা জীবীকা নির্বাহী করত এবং গ্রামে বাস করত। এরা কলা, লাউ, বেগুন, নারিকের, পান, সুপারী, হলুদ, আদা প্রভৃতির চাষ করত। এরা সম্ভবত ঃ গরু পোষতেন না কিন্তু হাতী পোষ মানিয়েছিলেন । তাঁরা সূতী বস্ত্র বয়ন এবং আখের রস থেকে চিনি তৈরি করতেন। সম্ভবতঃ এদের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রথারও প্রচলন হয়ে ছিল। আজও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ২

দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রাম ভিত্তিক ছিল না তাঁরা নগড় কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং সভ্যতাও গড়ে তুলেছিলেন। পন্ডিতদের ধারণা মতে, দ্রাবিড়দের এ অঞ্চলে গড়ে তোলা সভ্যতা ছিল খৃষ্টপূর্ব প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, সিন্ধুনদের উপত্যকার মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা সভ্যতার সমকালীন।৩

দ্রাবিড়গণই ধূতি, চাদর, শাড়ী প্রভৃতির প্রচলন করেন। দোচালা, চৌচালা, আটচালা প্রভৃতি ঘরের নির্মাণ পদ্ধতির প্রবর্তকও তাঁরা। মহাভারতের সভাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন দ্রাবিড় গোষ্ঠির বিখ্যাত বাস্তশিল্পীময় । ময় নিমিত ইন্দ্র প্রস্তের অপূর্ব সভাগৃহ দেখে গৃহনির্মাণে অক্ষম পশু পালনকারী আর্য জনগোষ্ঠি সে যুগে বিস্মিত এবং হতবাক হয়ে গিয়েছিল।৪ গরুর গাড়ীর প্রচলন ও সম্ভবত এঁরা করেছিলেন। এরা তামা, লোহা, ব্রোঞ্চ ইত্যাদিও ব্যবহার করতেন। হস্তীদন্তের কারুকার্য এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্রাবির সভ্যতার অন্যতম অবদান। এরা বড় বড় মালবাহী নৌকা নির্মাণ করতেন। সুতরাং দেখা যায় যে, আমাদের আগমনের বহু পূর্বেই এদেশের আদিম অধিবাসী (তাদের মধ্যে অন্যতম অষ্ট্রলয়েড ও দ্রাবিড়) এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী ছিলেন ।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাংলায় শৌর্য-বীর্য, সভ্যতা ও কৃষ্টিতে শীর্ষস্থানীয় গঙ্গারীডি নামে ভারতের শ্রেষ্ঠতম একটি জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্ডারের সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখায় সে জাতি কারা ? নিশ্চয় দ্রাবিড়গণ। সে জাতি সম্পর্কে টলেমী বলেছেন-"গঙ্গা মোহনার সব অঞ্চল জুড়ে এই গঙ্গারীডিরা বাস করে। তাদের রাজধানী 'গঙ্গ' আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ছিল। তাদের মত পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ জাতি ভারতে আর নেই।" ৫ গঙ্গারিডীরা ছিল বঙ্গ জনপদের অধিবাসী দ্রাবিড় এবং এই ভৌগোলিক সীমাতেই গড়ে উঠেছিল স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিশালী গঙ্গারিডী রাষ্ট্র। আর.সি. মজুমদার বলেন, " গ্রীকগণ গঙ্গারিডাই অথবা গঙ্গারিডই নামে যে এক পরাক্রান্ত জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা যে বাংলাদেশের অধিবাসী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। --- প্লিনি বলেন, গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমুদয় উক্তি হইতে পন্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গঙ্গানদীর যে দুইটিস্রোত

১. কে.এম. রাইহু উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭
২. ড. এম. এ. আজিজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪.
৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৫. উদ্ধৃতি ঃ আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলিয়া পরিচিত এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে গঙ্গারিডই জাতির বাসস্থান ছিল।"[১] ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, দ্রাবিড়রা ছিলেন ভূ-মধ্য সাগর অঞ্চলের নরগোষ্ঠীর লোক এবং তাদেরই একটি দল গঙ্গা মোহনায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এক উন্নততর সভ্যতা গড়ে তোলেন।

গঙ্গারিডী রাজ্যের রাজধানী ছিল গঙ্গা তীরবর্তী গঙ্গে। এই গঙ্গে নগরী ছিল একটি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক বন্দর। এ বন্দরের সঙ্গে রোম, মিসর, চীন, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার সম্পর্ক ছিল। এখানে বাণিজ্য উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের জাহাজ যাতায়াত করত। এখান থেকে স্বর্ণ ও মণিমুক্তা, রেশম ও কার্পাসজাতবস্ত্র, মসলা-গন্ধদ্রব্য এবং যুদ্ধোপকরণ হিসেবে হস্তী প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হতো। এ বন্দর থেকে সুদূর পশ্চিমে ঢাকার সুক্ষ্ম মসিলন ও রপ্তানী হতো।[২]

গ্রীক লেখকদের বর্ণনায় গঙ্গারিডীর (Gangaridi) পশ্চিমে বসবাসকারী আরও একটি জাতির উল্লেখ করেছেন। সে জাতির নাম প্রাসিঅয় (Prasioi), এদের রাজধানী ছিল পালিবোথরা (পাটলিপুত্র)। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এই দু'জাতির পারস্পারিক সম্পর্ক কি ছিল তা জানা যায় না। কার্টিয়াস(Curtius) এ দু'টিকে পৃথক জাতি বলেছেন। ডিওডোরাস (Diodorus) উভয়কেই একটি অভিন্ন জাতি বলে বর্ণনা করেছেন। প্লুটার্ক (Plutarch) এক স্থানে এই দুই জাতিকে গঙ্গারিডই রাজার অধীন এবং অন্য স্থানে এদের পৃথক দুই রাজার উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন- "গঙ্গারিডই ও প্রাসিঅয় রাজাগণ এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে আলেকজান্ডারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।"[৩] এসব বর্ণনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, গঙ্গারিডই ও প্রাসিঅয় এই দুই জাতি একই রাজ বংশের নেতৃত্বে যুগ্মভাবে আলেক জান্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। আর এটাও অনুমেয় যে, আলেকজান্ডারের আক্রমনের সময় বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করে পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন পাটলি পুত্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা।

আলেকজান্ডার পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হলে সংবাদ পান যে, গঙ্গারিডই ও প্রাসিঅয় রাজ্যের রাজা অথবা রাজাগণ এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাঁকে বাধা প্রদান করতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। এ সংবাদে গ্রীক সৈন্যগণ ভীত হয়ে অগ্রসর হতে চাইল না। অগত্যা আলেকজান্ডার বিপাশা নদীর তীর হতে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যার্বতন করতে বাধ্য হন। ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের মতে-বঙ্গের এ প্রাচীন শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিশ হাজার অশ্বারোহী, দু'লক্ষ পদাতিক, দু'হাজার রথী ও চার হাজার ও হস্তি সৈন্য ছিল। তিনি বলেন - "ভারত বর্ষে বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী)। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তি আছে। এজন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডারও এ সমুদয় হস্তির বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।"[৪]

আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের চার পাঁচশত বছর পরে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও গঙ্গারিড স্বাধীন-সার্বভৌম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায়। অথচ আর্য আগমন পূর্ববাংলায় এ গৌরবোজ্জল যুগ সম্পর্কে অমুসলিম লেখকদের অনেকেই নিরব।

---

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৯
২. মনসুর মুসা (সম্প.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৩. কে.এম. রাইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২
৪. রমেশ চন্দ্র মুজমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

আর.সি. মজুমদার বলেছেন-" বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে গঙ্গারিডই জাতির সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকবি ভার্জিল যে জাতির শৌর্য-বীর্যের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করিয়াছেন এবং পঞ্চ শতাধিক বৎসর যাহারা বাংলাদেশের রাজত্ব করিয়াছেন, এদেশীয় পুরাণ বা অন্য কোন গ্রন্থে যেসই জাতির কোন উল্লেখই নাই।" [১] সুতরাং আর্য রচিত ধর্ম শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত এ দেশের আদিম অধিবাসীগণ অসভ্য এবং বর্বর ছিলেন না তা এখন সুস্পষ্ট। রমেশচন্দ্র ও তা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন -"প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পুর্বে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সু-সভ্য জাতি বাস করিত, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ------মোটের উপর আর্য জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।" [২]

দক্ষিণ রাশিয়া ও তুর্কিস্তান ছিল আর্যদের আদিবাসস্থান। কালক্রমে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দিক ছড়িয়ে পড়েন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে আর্যগণ এ উপমহাদেশে আসেন এবং সিন্ধু নদের তীরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দ্রাবিড় অধ্যুষিত সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়। প্রথমে তারা পাঞ্জাবের পঞ্চনদ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু বাংলাদেশে তাদের অভিযান পরিচালিত হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে।[৩] এতে বুঝা যায় যে, এ উপমহাদেশের আর্যদের আগমন ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর দু'হাজার বছর পর্যন্ত আর্যদের বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। বাংলা অস্তিত্ব সম্বন্ধে হয়ত তারা জ্ঞাত ছিলেন না। কেন না, ঋগবেদ, সংহিতা, অথর্ববেদসংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গের কোন উল্লেখ নেই।

বৈদিক আর্যগণ ক্রমশ পূর্বদিকে অভিযান পরিচালনা করে উত্তরাপথের অধিকাংশ অধিকার করেন। এ অধিকৃত এলাকাই 'আর্যাবর্ত' অর্থাৎ আর্যদের পবিত্র স্থান বলে অভিহিত হয়। পুর্বে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল অর্থাৎ এলাহাবাদ, উত্তরে হিমালয় পর্বত মালা, পশ্চিমে সুলেমান পর্বত মালা ও দক্ষিণে সিন্ধু সঙ্গম পর্যন্ত আযাবর্ত বিস্তৃত ছিল। এর বাইরে ছিল অনার্যদের বসবাস। বঙ্গ তখনও আযাবর্তের বাইরে ছিল। ধীরে ধীরে এ ভূ-খন্ডের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিপাতিত হয়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তার আভাস পাওয়া যায়। আর্যদের ধর্মগ্রন্থাদিতে বঙ্গের অধিবাসীদের অত্যন্ত হেয় ও ঘৃণ্যরূপে বিবৃত করা হয়েছে। পুরাণে 'জারজ', মহাভারতে 'ম্লেচ্ছ', মনুসংহিতায় 'সর্প', ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য, দস্যু ও অসুর, ঐতরেয় আরণ্যকে দুর্বল দুরাহারী ও কাক এবং বৌধায়ন ধর্মসূত্রে 'অস্পৃশ্য' ও 'পক্ষীরূপে' এ দেশবাসীকে চিত্রিত করা হয়েছে। বৌধায়ণ ধর্মসূত্রে পুন্ড্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে এবং এ দু'দেশে পদার্পন করলে আর্যদের প্রায়শ্চিত্য করতে হবে-এরূপ বিধান আছে। এই সমুদয় উক্তি হতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্য জাতির বশোভূত নয়।[৪]

---

১. রমেশ চন্দ্র মুজমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.-২১
২. রমেশ চন্দ্র মুজমদার, প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৪
৩. ডঃ এম.এ.আজিজ,প্রাগুক্ত, পৃ- ২৯
৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪

Dhaka University Institutional Repository

এ বঙ্গ দেশে প্রবেশ করতে গিয়ে আর্যগণ দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এ প্রতিরোধের কারণেই খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বঙ্গ তার স্বাতন্ত্র নিয়ে বিদ্যমান থাকে । আর্যগণ এর উপর প্রভাব বিস্তার করেত পারেনি। আর্যরা যুদ্ধে বারবার পরাজিত ও বিতারিত হলেও বাংলার ধন সম্পদ ও ভু-খন্ডের প্রতি তাদের লোভ লালসা সংবরণ করতেনা পেরে বার বার এ ভূ-খন্ডে হানা দিয়েছে। এ জন পদকে নিরস্ত্র করতে তারা অস্ত্রের পাশা-পাশী তারা চালিয়ে গেচে চানক্য, কৌটিল্যনীতি, বানিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দ্রাবিড়গণ উন্নত সভ্যতার অধিকারী হলেও উন্নত যুদ্ধবিদ্যায় তারা পারদর্শী ছিলেন না। ফলে তারা আর্যদের নিকট পরাজিত হন। এভাবে এ ভু-খন্ডে আর্যদের আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়। আর্যদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে পরাজিত দ্রাবিড় ও অন্যান্য জাতি লোকালয় ত্যাগ করে দূর পাহাড়-পবর্ত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহন করে। তাদের অনেকেই আর্য ধর্ম গ্রহণ করে। আবার অনেকেই তা গ্রহণ করেনি।[১]

আর্যদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণে তারা সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত বঙ্গে প্রবেশ করতে পারেনি। এজন্য শত বছর ধরে আর্য ধর্মশাস্ত্রগুলোর মাধ্যমে তারা দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে বিষাক্ত আক্রোশ জিইয় রেখেছে। তাদের ধর্ম শাস্ত্রে এ দেশীয় বিজিতদের শুদ্র, দাস, অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতদসত্বে দ্রাবিড়গণ আর্যগণের প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে দ্রাবিরগণ পরোক্তভাবে ধীরে ধীরে আর্যগণ কর্তৃক প্রভাবিত হতে থাকে। খ্রীঃ পুর্ব ৩০০ অব্দের দিকে মৌর্য বিজয়ের কাল থেকে এ প্রভাব শুরু হয় এবং গুপ্ত রাজত্বকালে (৩২০-৫০০ খ্রীঃ), চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে এদেশে অনুপ্রবেশ করে। ফলে দ্রাবিড় ও অনার্য শক্তি স্থিমিত হয়ে যায় এবং এ ভূ-খন্ডে আর্য হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা

আরবে যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে ভারত বর্ষে তখন পৌত্তলিক তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সতীদাহ্,কালীদেবীর নামে নরবলি, আঞ্চলিক যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি হয়ে উঠে বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষ যেন আর্তনাদ করছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে। বর্ণপ্রথা তখন এতই কঠোর ছিল যে, কোন শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের পথ দিয়ে হেটে যেত, তাহলে তাকে ফাঁসি দেয়া হত। মানুষে মানুষে এত প্রভেদ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও দেখা যায়নি। বহু ইশ্বরবাদ, কুসংস্কার ও বহু বিবাহের ব্যাপারে ভারত ও আরবের অবস্থা ছিল একই।[২]

মহানবী (সঃ)এর সমসাময়িক উত্তর ভারতের শাসন ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খৃঃ)। তাঁর রাজধানী ছিল থানেশ্বর ও কণৌজ । দক্ষিণ ভারত তখন ক্ষুদ্র কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শশাঙ্ক (৬০০-৬৩৭ খৃঃ) ছিলেন ঐ সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক। তিনি গৌড়ের রাজ্য (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা) শাসন করতেন। পূর্ববাংলা ছিল ব্রাহ্মণ শাসনাধীন। এ যুগের শাসকগণ ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দে দক্ষিন পূর্ববাংলা শাসন করতেন খাদগা (Khadga) নামে এক বুদ্ধ বংশ। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত তাঁদের অসৃত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন দেব বংশ নামে আরেক বৌদ্ধ গোষ্ঠী। প্রায় একই সময় পশ্চিম ও উত্তর বাংলায় এক বৌদ্ধ পরিবার পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

---

১. ডঃ এম.এ. আজিজ, প্রাগুক্ত, পৃ-৩০

২. Prof. Sayedur Rahman, An Introduction to Islamic culture and philosophy, mullick Brothers, Dacca, 1963, p. 21

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার আর একটি রাংশ বংশের রাজা ভদ্রদত্ত ধর্মদত্ত ও কান্তিদেব রাজ্য শাসন করেন। কান্তিদেব নবম শতাব্দীতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। কান্তিদেব ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের পর দক্ষিণ পূর্ববাংলায় চন্দ্র বংশের রাজাগণ ক্ষমতা অধিকার করেন। দশম শতাব্দীর শুরু থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ববাংলায় এ বংশ রাজত্ব করেন । এ বংশের পুর্নাচন্দ্র, সুর্বন চন্দ্র, ত্রৈলোক্য চন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লডহচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র প্রমুখ রাজাগণ রাজত্ব করেন।

এ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মবংশের রাজাগণ আধিপত্য স্থাপন করেন। জাতবর্মা এ বংশের প্রথম শক্তিশালী নৃ-পতি । জাত বর্মার পর তাঁর পুত্র হরিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তীতে সামলবর্মা রাজা হন। তিনিই প্রথম বৈদেশিক ব্রাহ্মণের বাংলাদেশে আনেন। পরবর্তী রাজা হন তাঁর পুত্র ভোজ বর্মা। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেন বংশের বিজয় সেন বর্মরাজকে পরাস্ত করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজাদের রাজত্বকালের অবসান করেন।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় তিনিটি ধর্ম প্রচলিত ছিল।যথা - হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম। আর্যদের সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের লোকেরা। বৈদিক ধর্মের সংগে পরিচিত হয়। সম্রাট অশোকের সময় এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও প্রসার লাভ করে। গুপ্ত যুগে বাংলা তান্ত্রিক মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বিজয় সেন ও বল্লাল সেন ছিলেন শৈব। লক্ষণসেন নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলে প্রচার করলেও সেন আমলে পৌরানিক হিন্দু ধর্মই প্রবল হয়ে উঠে। সেন রাজাগণ পৌরাণিক দেবতাদের পূঁজার ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বাংলায় ম্লান হয়ে যায় এবং হিন্দু ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

তাম্র শাসন থেকে জানা যায় যে, বাংলায় বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের বিশেষ বিস্তৃতি ছিল।[১] সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি রাজমহল পুন্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) সমতট ও কর্নসুবর্ণ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেখা পেয়েছিলেন। তিনি বৌদ্ধ বিহারে নানা ধর্মের শিক্ষিত ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আনাগোনার কথা উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম খুব শক্তিশালী ছিল। বৌদ্ধগণ জ্ঞান ও ধর্ম নিষ্ঠায় সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সপ্তম শতকে শীলভদ্র নামে এক বাঙালী বৌদ্ধচার্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য পদ অলংকৃত করেছিরেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক বিষ্ণু মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। রাজা লক্ষণ সেন নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলে প্রচার করতেন। তাঁর সভাকবি জয়দেব কর্তৃক রচিত 'গীত গোবিন্দম' বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ইঙ্গিত বহন করে। জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলা সম্ভবত বাংলায় সর্ব প্রথম প্রচলিত হয় এবং পরে তা ভারতের অন্যত্র প্রচলিত হয়। পাহাড়পুর মন্দিরে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনী খোদিত আছে। একটি প্রস্তরে কৃষ্ণ ও একটি নারী মূর্তি খোদিত দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে ডঃ এম.এ. রহিম বলেন-"In Vishnuism, also called Vaishnavism, the principal God was Vishnu (Narayana). The Krishna legend fermed an essential element of Vasihnavism in Bengal contributed to the systemization of the Theory of Avatara; Varaha Narashimha, Vamana, Parsurama Matsya, Kurma, Rama, Balarama, Buddha kalki ten Avatars (Incarnations) of Vishnu. Another special feature of Bengal vaishnavism was the Radha Krishna cult which was established at the time of the peot Jayedeva in the twelfth century, Radha was a Bengali

১. বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পর্বতের গুহায় উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার একটি শিলা লিপি থেকে বাংলায় বিষ্ণু পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়

Dhaka University Institutional Repository

innovation and reprented a vaishnavite phase of the growing saklism, Krishna, like siva, the Supreme reality and Radha, the Sakti, Could make salvation attainable. [১]

গুপ্ত যুগে শৈব ধর্ম ও প্রচলিত ছিল। ৬ষ্ঠ শতকে মহারাজ ধৈন্যগুপ্ত ও সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক শৈব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাহাড়পুর মন্দিরে শিবের কয়েকটি মূর্তি খোধিত দেখা যায়। পালসম্রাট নারায়ন পাল একটি শিবমন্দিরে নির্মাণ করেছিলেন এবং মন্দিরের পূজারীদের ভূমি দান করেছিলেন। সদাশিব ছিলেন সেন রাজাদের ইষ্ট দেবতা। সেন রাজাদের মুদ্রায় সদাশিবের মূর্তি খোদিত দেখা যায়। বাংলায় প্রাচীন কালে শাক্ত পূজারও প্রচলন ছিল। বাংলার বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায় নানাভাবে দেবীর উপাসনা করতেন। বাংলার বহুতান্ত্রিক গ্রন্থে শাক্ত মতের কথা বলা হয়েছে।

বাংলায় সৌর সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। বিশরূপ সেন ও কেশব সেন সূর্য পূজারী ছিলেন। হিন্দু রাজা শশাঙ্কের আমল থেকে বৌদ্ধ ও সেন ধর্মের উৎখাতের চেষ্টা চলে এবং এ প্রক্রিয়া সেন আমলের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সে সময়ে মহা শক্তির পাদমূলে নররলীর প্রথাও প্রচলিত ছিল। নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্তিসহকারে প্রত্যেক শীলা ও শিবপূজা, শরৎকালে দুর্গাপূজা এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্য, শিব, মহেশ্বর, শ্যামা, কালী, চন্ডী, কার্তিক, গনেশ, লক্ষী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা করত। বাংলায় ৭০টি বিহার, ৮০০০ ভিক্ষু এবং ৩০০টি দেব-দেবীর মন্দির ছিল।[২] সেকালের হিন্দুরা, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে গণ্য করত। প্রথমটা দশ হারা ও পরবর্তীটা অষ্টমী স্নানরূপে পরিচিত ছিল। বাংলা মাঘ মাসের ৭ তারিখে কোন পবিত্র নদীতে মাঘী সপ্তমী স্নানরূপে পরিচিত ছিল।[৩] দোর যাত্রা রথ যাত্রা ও হোলী উৎসব খুবই প্রচলিত হয় এ যুগে। দ্বাদশ শতকের পুর্বে হোলী উৎসবের উৎপত্তি হয়। প্রচুর ফসল কামনা করে হিন্দুরা দেবীকে (কালী) প্রসন্ন করতে নরবলীর মাধ্যমে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত। এর সঙ্গে যৌন ভাব মুলক নৃত্যগীতও থাকত। হোলীর সঙ্গে কাম দেবতার উৎসব জড়িত ছিল।[৪]পাল রাজাদের আমলে পুণরায় বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্ম ক্ষীণ বল হয়ে প্রায় বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু পাল রাজাদের পৃষ্ঠ পোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম, বাংলা ও বিহারে বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। তাঁদের আমলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। পাল রাজাগণ বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন।

সপ্তম শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম বেশ প্রভাবশালী ছিল। এ সম্পর্কে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বরাত দিয়ে আব্দুল মান্নান তালির বলেছেন-"কজঙ্গল প্রদেশে (রাজমহলের নিকটবর্তী) ছয় সাতটি বিহারে তিনশতের ও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করে। এ দেশের উত্তর ভাগে গঙ্গাতীরের নিকট বিশাল উচ্চ দেবালয় আছে। দেবালয়ের চতুর্দিকে দেয়ালে বিভিন্ন প্রকোষ্টে বৌদ্ধ, অন্যান্য দেবতা ও সাধু পুরুষদের মূর্তি উৎকীর্ণ; পুন্ড্র বর্ধনে (উত্তরবঙ্গ) ২০টি বিহারের তিনশতের ও অধিক হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। রাজধানীর তিন চাড়িমাইল দক্ষিণে পো-চি-পো সংঘারাম এর ভিক্ষু সংখ্যা সাতশত। সকলেই মহাযান মতালম্বী। পূর্বভারতের বহু প্রসিদ্ধ আচার্য এখানে বাস করেন। সমতট (পুর্ববঙ্গ) প্রদেশের রাজধানীতে প্রায় ত্রিশক্তি বৌদ্ধ বিহারের দু'হাজার ভিক্ষু থাকেন। কর্ণ সুবর্ণে দশটি বৌদ্ধ বিহারের হীনযান মতালম্বী দু'সহস্র ভিক্ষু বাস করেন।"[৫] এ সব বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, সপ্তম শতকে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং জ্ঞান ও ধর্মানুশীলনের দিক থেকে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র স্থলে পরিণত হয়েছিল।

---

১. Dr. M.A Rahim, 'The Advent of Islam in Bangladesh' Islam in Bsngladesh through ages, Islamic foundation Bangladesh-1995, p. 6-7

২. ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, 'আর্য ভারতীয় সেন আমলে বাংলা', বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৩ইং, পৃ-১৩৩

৩. R,C, Majumder, op. cit. p-608.

৪. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৮

৫. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০

Dhaka University Institutional Repository

"বৈদেশিক আক্রমণের ফলে বাংলার বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। এ যুগের বুদ্ধের বহু মূর্তি বাংলার নানা স্থানে আবিস্কৃত হয়েছে। পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও তা ব্রাহ্মন ধর্মকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। পালযুগের পর বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পাল যুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা মূল বৌদ্ধ ধর্ম থেকে পৃথক ছিল। আধুনিক মহাযান মতবাদ বজ্রযানও তন্ত্রযান ইত্যাদিতে রুপান্তরিত হয়ে সম্পুর্ন ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এদেরকে সহজিয়া বা সহযান ধর্ম বলা হয়ে থাকে।"[১] "বৌদ্ধ ধর্ম যখন পরবর্তীকালে বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী দেবতা বা তান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তখন সহজিয়া। মতবাদের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধসংঘ প্রথমে একান্তভাবে পুরুষদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের পালিকামাতা মহা প্রজাপ্রতির ঐকান্তিক অনুরোধে বুদ্ধ তাকে এবং আরো কয়েকজন মহিলাকে সংঙ্গে যোগদানের অনুমতি দেন। পরিণামে এর থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রভাবের বিশেষ করে তান্ত্রিকতা ও যৌনতা ইত্যাদির প্রভাবের পথ প্রশস্ত হয়। ফলে, বৌদ্ধরা হীন যানও মহাযান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। হীনযান পন্থী বৌদ্ধরা তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার সময়কার ঐতিহ্য বজায় রাখে। মহাযান বৌদ্ধরা হিন্দুদের তান্ত্রিক দেব দেবতা ও তান্ত্রিক মতবাদ তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে এর ফলে বুদ্ধ তাদের নিকট দেবতায় পরিণত হয় এবং 'তারা' দেবরূপে ও তার (বুদ্ধের) শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধ ও 'তারা' এই দুইয়ের আরাধনার বিভিন্ন ভঙ্গি ও শক্তির বিভিন্ন বিকাশ বৌদ্ধদের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীরূপে পরিণত হয়। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের আচার অনুষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তন্ত্র গ্রন্থ সমূহ লিখিত হয়।"[২]

সহজিয়া ধর্ম মতে গুরুর স্থান সকলের উপর। বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক বিরোধী সহজিয়া পন্থীগণ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে বিদ্রুপ করে থাকে। সহজিয়া ধর্ম মতের আর্যাগণ 'সিদ্ধাচার্য', নামে পরিচিত। বিভিন্ন উৎস থেকে ৮০ জন সিদ্ধাচার্যের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব ঘটে। এরা অপভ্রংশ ও লৌকিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।[৩] সিদ্ধাচার্যগণ প্রাচীণ সংস্কার ও ধর্মমর্তের তীব্র সমালোচনা করে ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় দেন। সহজিয়া সাধন প্রণালী নানাবিধ রহস্যে আবৃত। এর সাধন প্রণালী এক প্রকার যোগ বিশেষ। ডঃ রমেশ চন্দ্রের ভাষায়-"চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপাথ রহস্যে আবৃত থাকার সহজিয়া ধর্ম ক্রমেই আধ্যাত্মিক অধঃ পতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৌদ্ধ ধর্মের বিধি-বিধান যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইল।"[৪] এরূপ কারণে হিন্দুর তন্ত্রোক্ত সাধনাও একই অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ক্রমে সহজিয়া ধর্মও তান্ত্রিক সাধনা একাকার হয়ে বাংলার ধর্ম জগতে এক বীভৎসতার সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে সহজিয়া ও অন্যান্য তন্ত্র সম্মত ধর্মগুলি প্রধানত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ড.এম.এ. রহিমের ভাষায়-"As a result of ahe influence of hinduism and hindu Trantikism Buddism drifted a way from the Purity of its fundamentals and the Buddists were degraded into the lower strata of the socicty."[৫]

১. কে.এম. রাইহু উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫১
২. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম,প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৫
৩. আবুল হাশিম (অনূ. মুসলিম চৌধুরী) ইসলামের মর্মকথা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ -১৯৮১ইং, পৃ-৭২
৪. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ , বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড), ঢাকা - ১৯৮৬ইং, পৃ. ১২৯।
৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

আর্যদের সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠী চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যারা ছিলেন সৎ এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করার মত যাদের প্রতিভা ছিল, তাদের ব্রাহ্মণ বলা হত। এরই শিক্ষা লাভ করতেন এবং শিক্ষা দান করতেন। এরা গুরু বা শিক্ষক হিসাবে সমাজে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করতেন। যারা দৈহিক পরাক্রম অর্জন করতেন, সে সব রাজা রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধাদের বলা হত ক্ষত্রিয়। যারা ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি ও শ্রম শিল্পে আত্মনিয়োগ করতেন এবং সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনে আনন্দ লাভ করতেন তাদের বলা হতো বৈশ্য। এ সব বৃত্তি বা পেশার পক্ষে আবশ্যক মেধা যাদের ছিল না, যারা ছিল সাদাসিধে ও রুক্ষ, যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একমাত্র কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করত তাদের বলা হত শূদ্র।[১]

শূদ্রদের জীবন ছিল বিড়ম্বিত। তারা উচ্চ শ্রেণীর দাসত্বে নিয়োজিত থেকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হত। ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরহিত্য পর্যন্ত করত না। তাদের খাদ্য গ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। এ বিধান লংঘন করলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্য করতে হত। অসম্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালেও 'গোসল' করে ব্রাহ্মণদের শূচিতা অর্জন করতে হত।[২] "একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পালিত কুকুর একজন আদিবাসীর চেয়ে বেশী সম্মান পায়।"[৩] অস্পৃশ্যদের দেশ বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশে আগমন করাই ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। অল্প কয়েকদিনের জন্য এ অঞ্চলে অবস্থান করলে গুরুতর প্রায়শ্চিত্য করতে হত।[৪]

বৌদ্ধ রাজাদের যুগেও ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়ণের বিরুদ্ধে তেমন কোন শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি, বরং ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্নই ছিল। তাদের চেষ্টায় কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে শূদ্রদের চেয়ে নিচ আরও একটি অন্তজ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এরা হল কাপালি, যোগী, চন্ডাল, শবর, ডোম, মালগ্রহী, কুড়ব, বড় র, বাউরী, তক্ষণকার, চর্মকার, ঘটজীবী, ভোলাবাহী, মল্লযুক্কম, পুলিন্দ, ডস, খর, কামবাজ, সুম্র, কর্মকার, শৌন্ডিক, ব্যাধ, তাঁতী,ধুনুরী, ঋষি, মলবাহী, মাহুত, নটনটী ইত্যাদি।[৫]

এদেরকে শূদ্রের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হত। সমাজ জীবনে তাদের যেমন প্রতিষ্ঠা ছিল না। তেমনি তাদেরকে মানুষই মনে করা হত না। তাদের জীবন ছিল পশুর চেয়েও অধম। শূদ্র ও তার নিচের শ্রেণীর লোকেরা লোকালয়ের বাইরে জীবন যাপন করতে বাধ্য হত। কোনক্রমে পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারেও যদি শাস্ত্রবাণী শুনে ফেলত, তবে তাদের কর্ণকুহরে গলিত সীসা ঢেলে দিয়ে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা , এমনকি দেশীয় ভাষায় শাস্ত্রবাণী শ্রবন করা বা বলা দুই-ই নিষিদ্ধ ছিল।[৬] বিধান ছিল

" অষ্টাদশ পুরাণাকি রামন্য চরিতানিব
ভাষা রং মানবা শ্রুত্বা বৌর বং নরকং ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ " লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পূরান ও রাম চরিত্র ইত্যাদি যে মানব শুনবে তার ব্যবস্থা বৌরং নরকে।"[৭]

১. Dr. M.A. Rahim, op. cit, p. 5
২. ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৩. আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. -৭২
৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পু- ১৪৬
৫. Dr. M.A. Rahim, op. cit. p. 7.
৬. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৭. উদ্ধৃতি ঃ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রের সত্য, শৌচ, দয়া, দান প্রভৃতি সর্ব বিধগুণের মহীমা কীর্তন এবং ব্রহ্ম হত্যা, মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তি, ব্যাভিচার ইত্যাদি কঠিন পাপ বলে গণ্য হয়েছে। এতদসত্বেও সমাজে দূর্নীতি এবং অশ্লীলতা প্রচলিত ছিল। তৎকালে আর্যহিন্দু সমাজ অধঃপতি ছিল। অব্রাহ্মণদের উপর, বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার যেমন ভয়াবহ ছিল তেমনি সব রকমের দূর্নীতি ও অনাচার সামাজিক জীবনকে কলুষিত করেছিল। সমসাময়িক সংস্কৃতি সাহিত্য সেকালের লোকদের নীতিহীনতার চিত্র তুলে ধরেছে। কবি ধূয়ীর 'পবনদূত' ও কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় যে, "সেন রাজারা মন্দিরের সেবায় 'দেবদাসী' ও যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবাদের নিয়োগ করার প্রথা প্রবর্তন করেন। এতে উচ্চ শ্রেণীর ও প্রভাবশালী হিন্দুদের উপভোগের জন্য একটি উপাদানের সংস্থান হয়। ফলে হিন্দু সমাজের নৈতিকতার পতন ঘটে এবং দূর্নীতি ও অনাচার সামাজিক ও জীবনের সর্বস্তরের ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুদের বর্ণ প্রথা উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরকে শূদ্র রমণী বিয়ে করতে অনুমতি দেয় না। কিন্তু এ প্রথা একজন ব্রাহ্মণকে শূদ্র রমণীর সঙ্গে যৌনাচার করা থেকে নিবৃত্ত করেনি। এমনকি এ ধরনের একটি নৈতিকতা বিরোধী ও অসামাজিক কার্য করার পরেও সামান্য মাত্র জরিমানা দিয়ে সে তার কৌলিণ্য বজায় রাখতে পারত।" ১ কবি বৃহস্পতির মতে-"সে কালের মেয়েরা বেশি রকম যৌনবিলাসিনী ছিল। গৌড়ের যুবক যুবতীদের কামলীলার কথা ও গৌরাঙ্গের রাজ অন্তঃপুরের মহিলারা যে নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজ কর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের কাম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন তার বিবরণ বাৎস্যায়নই রেখে গেছেন।" ২

কালবিবেক গ্রন্থ ও কালিকা পুরাণের বর্ণনায় জানা যায় যে, "এমনকি হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যেমন-দূর্গাপুজা, হোলি উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে মেয়ে পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনাচার ও কদর্যতা চলত। 'কামমহোৎসব' নামে পরিচিত একটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে হিন্দু নারী-পুরুষেরা দেবতাকে খুশি করে পুত্র-সন্তান ও সম্পদ লাভের জন্য এক ধরনের যৌন নৃত্য করত। কবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দম' গ্রন্থে ত ৎকালীন সমাজের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। গীত-গোবিন্দ, ধরনের কবিতা ও গ্রন্থ যার বিষয় বস্তু যৌন আবেদন জাগিয়ে তোলে, দরবারের জন সমাবেশে আবৃতি করা হত এবং লোকেরা এসব খুব উপভোগ করত।"৩

আর্য ব্রাহ্মণ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না, তবে সহমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ধন-সম্পত্তি তথা সমাজে তাদের আইনগত কোন অধিকার ছিল না। এ প্রসঙ্গে ডঃ এম. এ. রহিম উল্লেখ করেছেন - "During the Hindu period in Bengal, as in rest of India, a woman had hardly any indipendent legal or Social status, except as a member of the family of her father and husband. Early Marriage of the girl was the common custom in the Hindu Society.

১. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৫২৫
২. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৫২৫
৩. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৫২৫

Dhaka University Institutional Repository

Jimutavahana in his Dayabhaga quots with approval the injunctions of Vishnu and Paithinase that dire consequences would follow, if a girl is married after puberty, and the statement of Manu that "The nubile age is trvelve years for a girl to be married to a man aged thirty, and eight years for one to be espoused by a man aged twenty four; and the age prescribed for entry into another order is fifty years. Marriage able age for bride and bridegroom, according to the social prescriptions, was in the ratio of 1 to 3. If a girl attained puberty in her fathers house, her father becoame guilty of killing embryo (bhrunapatya), and the girl is deemed to be vrishsli; one who married such a girl becoame unfit for Sraddha for sitting in the same line." ১

তান্ত্রিকবাদ ও শক্তিবাদ সেকালের হিন্দু সমাজের অধঃপতনের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী ছিল।

এভাবেই প্রাক ইসলাম যুগে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় সর্বস্তরের অধঃপতন নেমে আসে। এ অধঃপতনের জন্য সমাজে ব্রাহ্মণের নির্বিচার প্রাধান্যই ছিল বহুলাংশে দায়ী। ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ফলে সমাজ দেহ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণরা ছিলেন সমাজে উচ্চাসনে। জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনা-কর্ম প্রচেষ্টা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারত না। নবম ও দশম শতকে রচিত। বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থে এবং বর্মসেন আমলের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণরা সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিলেন।

সমাজে ব্রাহ্মণের পরে ছিল শূদ্রদের স্থান। আর তাদের পরে ছিল অগণিত অন্তজ-ম্লেচ্ছ সম্প্রদায় যারা দুঃখের দাহনে দগ্ধীভূত হয়েছিল এবং সর্বপ্রকার সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত গণমানুষের দল। সমাজে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। ফলে সমাজে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের অন্তর্বিরোধ, ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গোপন বিষক্রিয়া শুরু হয় যা একদাশ ও দ্বাদশ শতকের বাংলার সমাজ দেহকে কলুষিত ও বিষাক্ত করে তুলেছিল। বাংলার সমাজ দ্রুত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাচ্ছিল । এ দিকে সামাজিক গোঁড়ামী ও অধিকার বঞ্চিত ব্রাহ্মণেতর মানুষের নিদারুণ হাহাকার, অন্য দিকে ঐশ্বর্য বিলাস ও কামবাসনার উচ্ছাসময় আতিশয্য । এক দিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও দেহগত বিলাস, চারিত্রিক অধঃপতন, অমানবিক ঘৃণা ও অবহেলা এবং অন্য দিকে সাহিত্য-কাব্য-কবিতার মধ্যে যৌন কামনা-বাসনা মদিরতা বাংলার সমাজকে অন্তঃসার শূণ্য করে দিয়েছিল। এ সময়েই তাদের কাছে ইসলাম এক নতুন জীবন দর্শনও ধর্মবোধ মানবতার আদর্শ নিয়ে আসে। আর এ উপমহাদেশে ইসলামের ধারক-বাহক ও প্রচারক ছিলেন সূফীয়া-এ-কিরামগণ। অস্পৃশ্যতা, ভেদ, বৈষম্য, জর্জরিত এবং পুরোহিত তন্ত্রের নিগরে আবদ্ধ, জনগণের কাছে সূফীয়া-এ-কিরাম আল্লাহর একত্ব ও মানবতার মুক্তির বাণী প্রচার করেন। এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ জনসাধারণে সূফীদের কাছে এক সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাচরণে আদর্শ প্রত্যক্ষ করে। এ সকল সাধকের সততা, নিষ্ঠা, ইহজাগতিক নির্লিপ্ততা ও অকৃত্রিম মানব প্রেম এ দেশের শান্তিকামী মানুষের হৃদয় সহজেই জয় করে নেয়।

১. Dr. M.A. Rahim, op.cit. p. 9.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম বিজয় পূর্ব বাংলাদেশে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিজয় পূর্ব বাংলাদেশে ইসলাম

বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করে নিয়ে আসেন তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী। তবে তার পূর্বেও বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগ ছিল। তাঁর বঙ্গ বিজয়ের বহুপূর্বেই বাণিজ্যিক সূত্রে আরব বণিকগণ এদেশে আগমন করতেন। কেননা, সুদূর অতীতকাল হতেই আরবগণ সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে পৃথিবীর সেরা জাতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই আরবগণ সাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দূর দেশে গমনাগমন করেছিল। ৭১২ খৃষ্টাব্দে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপনের ফলে স্বভাবতই প্রাচ্য ও ভারতের সঙ্গে আরব বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হয়। বাণিজ্য ব্যাপদেশে কিছু সংখ্যক আরব বণিক সিংহল ও মালাবার অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করে। আরব বণিকদের প্রাচ্য দেশীয় বাণিজ্য এতবেশী প্রসার লাভ করে যে, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর আরব্য জলাশয়ে পরিণত হয়। ইসলাম পূর্ব যুগ হতেই আরব বণিকগণ সমুদ্র পথে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়াতেন এবং এখানে পণ্য বিনিময় করতেন। সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে এবং হিজরী প্রথম শতকে সম্ভবতঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবদ্দশায়ই আরবের মুসলিম বণিকগণ ও ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক এদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয়।[১]

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এবং সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এদেশে আরব বণিকগণ এসেছিলেন বলে সুনির্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে যুগে ব্যাপাক পর্যালোচনা ও গবেষণায় এমন কিছু প্রমাণাদি পাওয়া যায়, যাতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম পূর্ব যুগে বঙ্গ দেশের সাথে আরবদের ব্যবসায় ছিল এবং প্রথম হিজরী শতাব্দীর অর্থাৎ ইসায়ী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই তদানীন্তন হিন্দ ও তথা বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং এদেশে ইসলামের আলো পৌঁছেছে।[২] মরু আববে কৃষি যোগ্য জমির অভাব থাকায় আরবগণ বরাবরই বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন ছিল। স্মরণাতীত কাল থেকে তারা স্থল ও জল উভয় পথেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে আসছিল। তাঁদের উটের বহর পার্শ্ববর্তী সকল দেশে চলাচল করত।[৩] ইসলামী সভ্যতা বিকাশের পূর্ব থেকেই আরবগণ নাবিক হিসেবে সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। আর ইসলামের আবির্ভাবের পর তাঁদের ধর্মীয় ও আত্মিক জীবনের ন্যায় সামুদ্রিক জীবনের কর্মকান্ডেও ঢেউ লাগে এবং তাঁরা দুনিয়ার সকল অংশেই দুঃসাহসিক যাত্রা করতে থাকেন। কেননা, আরব দেশ সমুদ্র পথে অন্যান্য বড় বড় দেশের সঙ্গে যুক্ত। আরব ও ভারতের মধ্যে রয়েছে ভারত মহাসগর; একটি নদীর দ্বারা ইরানের একটি অংশের সঙ্গেও আরব যুক্ত; যে আবিসিনিয়া এক সময়ে আরবদের ব্যবসা-বাণিজের বিশাল কেন্দ্র ছিল তাও সমুদ্র পথে আরবদের সঙ্গে যুক্ত। চীনা দ্রব্য সম্ভার চীন সাগর ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসে পৌছাত আরব দেশে। সিরিয়া হয়ে ভূ-মধ্য সাগরে পৌঁছে তাঁরা রোমীয় ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসেছিল। বাহ্‌রাইন, ইয়ামামা, ওমান, হাজারা মাউত, ইয়ামন ইত্যাদি উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকা সমূহ সবই সমুদ্র উপকূলবর্তী। এসব ভু-প্রাকৃতিগত কারণেই আরবরা সমুদ্রগামী জাতিতে পরিণত হয়। বিশ্বের দেশে দেশে তারা পালতোলা জাহাজে পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াত। তাদের এ জীবন ধারা এ উপমহাদেশেও এসে থেমেছে এটা সহজেই অনুমেয়।[৪]

---

১. ড. আ.ন.ম.রইছ উদ্দিন, 'বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব', ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাতাশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৭ইং, পৃ.১৬৭

২. সৈয়দ সুলায়মান নদভী (অনূ. হুমায়ুন খান), আরব নৌবহর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ ইং, ভূমিকা

৩. সৈয়দ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত

৪. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান (১৭৫৭- ১৮৫৭), পি-এইচ.ডি. অদিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.৩৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক (৬০০খৃষ্টাব্দে) আবর ভূমিতে ইসলাম প্রচারের এক শতাব্দী কালের মধ্যে মুসলমানদের আধিপত্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে ভারত সীমান্ত এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে উত্তর আফ্রিকা (মিশর) পযন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইসলাম পরবর্তী আরবের সাথে অপরাপর অঞ্চলের মত ভারতের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। তাই পি,কে, হিট্টি বলেছেন- "In the Islamic age of Arabeans were not a military people. their history was that of trader of a prosperous maritine civilization in the south which linked Indian with Africa. [১]

জনাব মহিউদ্দীন খান সৈয়দ সুলায়মান নদভীর গ্রন্থ 'আবর ওয়াহিন্দ কে তা'আল্লুকাত' গ্রন্থের সূত্র ধরে বলেছেন-"আবরদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র গুলোর আশে পাশে আবরদের স্থায়ী উপনবেশও গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতের মালাবার,কালিকট,চেরর এবং আমাদের গ্রাম ও আবরকান উপকূলে আবর জনগণের এরূপবমতি ইসলাম পূর্ব কয়েক শতাব্দি পূর্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। আবর দেশ থেকে বছরে অন্তত দু'বার এসব উপনীবেশে নৌবহর এসে নোঙ্গর করত। ফলে বাণিজ্য পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হত তেমনি সংবাদাদির আদান-প্রদানও চলত।" [২] এমনই যদি হয় তদানীন্তন অবস্থা তবে এটা নিশ্চিত যে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই তা এদেশে জনগণের কাছে পৌছেছিল। তাই বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে উপমহাদেশে ইসলামের বিকাশ সম্পর্কে য ৎকিঞ্চিৎ ধারণা পেশ করা প্রয়োজন।

আবরদেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়াতে এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবিকাঠি ছিল আবরদের হাতে। ভারতীয় উপকূলীয় বাণিজ্য তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। যে সকল ভারতীয় বন্দরে আরবদের যাতায়াত ছিল সৈয়দ সুলায়মান আলী নদভী তার একটি জোরালো বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-"আরবরা কাশবাতে আসত পারস্য উপসাগরের পারস্য উপকূল ধরে এবং তারপর তায়েয নামক বেলুচিস্তানের একটি বন্দর প্রবেশ করত। তারপর তারা সিন্ধুর বন্দর থাথ এ আসত, তারপর গুজরাট ও কাথিয়াবারের বন্দরসমূহে ভিড়ত। যথাঃ খানা,খামরায়াত, সানবারা, চেমূর, বাহারোচ, ভারহুত, গান্ধার, ঘোঘা, সুরাট; অতঃপর যেত মাদ্রাজ প্রদেশের বন্দরসমূহে, যথাঃ মালাবার করোমন্ডল (মালাবার) কেপকেমোরিন (কুমার), ত্রাভাঙ্কুর (কুলুম), ম্যাঙ্গালোর, চালইয়াট, পিন্ডারানী, চান্দ্রাপুর, হানুর, দেফাতান, কালিকট ও মাদ্রাজ এবং তারপরে বন্দোপসাগরে প্রবেশ করত। এখানে তাদের কেন্দ্র ছিল সিলেট। একে তারা বলত সিলাহাত। তারপর তারা যেত চট্রগ্রাম, একে বলত সাদজাম, এখান থেকে শ্যাম হয়ে জীন সাগরে প্রবেশ করত। তাদের গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল গুজরাট ও সিন্ধু। বাহরোচ থেকে তার লাক্ষা ও নীল নিত। মাদ্রাজে তৈরী তোষক তারা মিশরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত।" [৩] পারস্য উপসাগরের একটি প্রাচীন বন্দরের নাম ছিল 'ওবুল্লা' এটি ছিল পারস্যের নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র। এই বন্দর থেকে মালামাল ও বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে জাহাজ হিন্দুস্তান ও চীনে যেত।[৪]

---

১. P.K. Hitti. The aryan, London,1956, Introduction.

২. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশে ইসলাম ঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ইং,পৃ.৩৪৫

৩. সৈয়দ সুলায়মান আলী নদভী, প্রাগুপ্ত, পৃ.২১

৪. সৈয়দ সুলায়মান আলী নদভী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যাবহিত সময় পর্যন্ত সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারত এবং পশ্চিম এশিয়ার (আরবসহ) মধ্যে সম্পর্ক অব্যাহত ছিল বলে আর্থারজেফারী ও মন্তব্য করেন।[১] এরূপ ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর সময়ও ভারতবর্ষে আরবদের গমনাগমন অব্যাহত ছিল। কে.এস. লালের মতে-"With the rise of Islam Persians and Arabs (now turned) Muslim maritines entered into the inhabitance of their predecessors."[২]এন্ড্রু উইঙ্ক বলেন- "Early Islam was highly receptive to novelties and favoured the transmission not only of men and goods but also of technology, information and idias"[৩]

এসময় ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক বিষয়টি সম্পর্কের ক্ষেত্র নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় । তবে মহানবী (সঃ) এর আমলে আরব মুসলমানগণ ভারত অভিযান প্রেরণ করেছিলেন কিনা এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়না। তবে তারা বক্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ভারত বর্ষ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি 'হিন্দ' বা 'সিন্ধ' এর কথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন-ভারতের আদর্শিক বিজয় সম্পর্কে সাহাবী হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন-"আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিবেন। তার মধ্যে একটি হিন্দ অভিযানকারী সোনাদল। আরেকটি মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আঃ) এর সহযোগী সেনাদল।"[৪] হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছেঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমদের হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। তাই সে সময় যদি আমি জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আমার ধন-সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবনা। সেখানে আমি নিহত হলে শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করব আর যদি মঙ্গল মত ফিরে আসি তবে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাব।"[৫]

এছাড়া এমন প্রমাণ ও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সঃ) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য লাভ করেছেন এবং ভারতীয় কুঞ্জের রাজা শরবতক তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন।[৬] কে.এ. নিযামী বলেছেন-"হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের আগেই ভারত ও আরব উভয় অঞ্চলে পরস্পরের উপনীবেশ বসতি গড়ে উঠেছিল। দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ থেকে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে। এ যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য পেয়েছিলেন এবং একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন বলেও জানা যায়।"[৭] এমনকি মহানবী (সাঃ) এর পত্নী হযরত আয়িশা (রাঃ) চিকিৎসার জন্য ভারতীয় চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে ইমাম বোখারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, হিন্দ শব্দটি আরবদের দেয়া। ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন সিরাজ 'বরহিন্দ' বলতে উত্তর বাংলাকে বুঝিয়েছেন।[৮] তিনি বলেছেন-"বিশাল সাগর মহাসাগর আরবগণ জাহাজে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে যখনই এই দেশের লাল মাটি লক্ষ্য করত তখন, 'বরহিন্দ' বা 'বররিহিন্দ' বলে চিৎকার করে উঠত। তখন থেকেই এ নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। আরবীয় বররি শব্দের অর্থ স্থল ভূমি।"[৯]

---

১. Aurther Jeffery,The foreign Vocabulary of the Quran, Oriental inst. Baroda,1438. pp.50-60.
২. K.S.Lal, Early Muslim in India. New Delhi.1984.p.1.
৩. Andre Wink, Al-Hind - The Making of the Indo-Islamic world, vol-i, E.J. Brill the Natherlands, 1991, p. 10.
৪. নাসাঈ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, মুসনাদ-ই-আহমাদ, সাওবান বর্ণিত হাদিস অধ্যায়
৫. নাসাঈ শরীফ, প্রাগুপ্ত
৬. Mohummad Nurul Haq, Arab Relation with Bangladesh, 1980, Ph.D. thesis. D.U. (Unpublished)
৭. K.A..Nizami, (ed. Md. Zaki), Arab Accounts of India, Introduction.
৮. K.A.N.Nizami. op.cit.
৯. মুফাখখরুল ইসলাম, 'উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব' ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা,১৯৮৪ইং,পৃ.৭১৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. তাঁরা আরব, ফিলিস্তিন ও মিসর প্রভৃতি পশ্চিমী দেশ সমূহের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটি প্রাচীন পটভূমি তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন -"সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাব এবং একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীনে তাদের ঐক্য ইসলাম পূর্বকাল থেকে সূচিত সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া তীব্র গতি সঞ্চার করে। মুসলিম বাহিনী দ্রুত সিরিয়া ও পারস্য দখল করে এবং ভারত সীমান্তে অভিযান শুরু করে। মুসলিম বণিকরা অনতি বিলম্বে পারসিকদের নৌ-বাণিজ্যের উত্তরাধিকারে প্রবেশ করেন এবং আরব নৌ-বহর ভারত সাগরে দ্রুত ধাবিত হয়। আরব নৌ-বহর লোহিত সাগরের উপকূল থেকে অথবা দক্ষিণের উপকূলে যাত্রা শুরু করত। তাদের লক্ষ্য থাকত সিন্ধুর নদের মুখে ও উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্বে উপসাগরের অথবা মালাবার উপকূলে মাল খালাস করা, যাতে কৌলম সহ সরাসরি অন্যান্য বন্দরে পৌছে যাবার জন্য মৌসুমী বায়ুর সহায়তা পেত। পারস্য উপসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে বাণিজ্য জাহাজগুলো মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে একই পথে কৌলম, মালয় উপদ্বীপ, পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনে পৌছে যেত। খলিফা উমর (রা.) এর শাসনামলে ৬৩৬ খৃঃ মুসলিম নৌ-বহর ভারতীয় পানি এলাকায় উপনীত হয়, তখন বাহরায়েন ও ওমানের শাসক (গভর্নর) ছিলেন উসমান শফিকী। তিনি সমুদ্র পথে তানাতে সৈন্য প্রেরণ করে খলিফা কর্তৃক তিরস্কৃত হয়।" [১]

খলিফা উমর (রা.) এর শাসনামলে ভারত অভিমুখী স্থল পথ আবিস্কারের বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা শেষ পর্যন্ত অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। এ সময় নৌ-বাণিজ্য অব্যাহতভাবে চলছে। মুসলমানগণ ভারতের দক্ষিণ উপকূলের তিনটি শহর ও সিংহলে তাদের বসতি স্থাপন সম্পন্ন করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর পরে পারসিক ও আরবীয় বণিকগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে বিপুল সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেন এবং স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে শুরু করেন। এ ধরণের বসতি স্থাপন মালাবার উপকূলেই খুব ব্যাপক ও উল্লেখ যোগ্য। মনে হয় বন্দর এলাকায় বিদেশী বণিকদের বসতি স্থাপনের উৎসাহ দানের নীতি অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যেমন-সিংহরের রাজা উপহার স্বরূপ হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে কতিপয় মুসলিম বালিকা প্রেরণ করেন যারা তাঁর দেশেই জন্ম গ্রহণ করেছিল। এ সব অনাথ বালিকা ছিল সেখানকার মৃত মুসলিম বণিকদের কন্যা।" [২] আরবীয় নৌ-বহর অষ্টম শতাব্দীর ব্রোচ ও কাথিওয়ার উপকূল বন্দর আক্রমন করে। তাঁদের বাণিজ্য ও বসতি স্থাপন ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। বসতি স্থাপনের পরেই তাঁরা ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে। নবম শতাব্দী শেষ হবার আগেই তাঁরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হন।

সে সময় ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মধ্যে সংঘাত চলছিল। নব হিন্দু মতবাদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিকভাবেও সেটা ছিল স্থিতিহীনতা ও উত্থান পতনের যুগ। চের রাজ বংশ ক্ষমতা হারাচ্ছিল, আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছিল নতুন রাজবংশ। স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের মানসিক অবস্থা তখন অস্থির ছিল। নতুন ধারণা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মানসিকতা ছিল উন্মুখ। এ সময় দৃশ্যপটে আসে ইসলাম, তার সরল বিশ্বাস, অনাবিল আদর্শ ও মানবতার মুক্তির সওগাত নিয়ে। ফলে এর প্রভাব হয় অতিবিস্ময়কর। চেরুমল পেরুমল বংশীয় শেষ রাজা নবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন। জানা যায় যে, তিনি এক স্বপ্ন দেখে এই নবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন-যেন চাঁদ দুই খন্ড হয়ে যাচ্ছে। এর অব্যাবহিত পরেই সিংহল থেকে প্রত্যাগত একটি

১.ড.তারাচাঁদ (অনূ. এস. মুজিব উল্লাহ), ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ইং, পৃ.২৯

২.ড. তারাচাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ধর্ম প্রচারক দলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দলের নেতা শায়খ সিককে উদ্দীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। তিনি রাজাকে ইসলামের দীক্ষা দেন এবং তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান সামরী। দীক্ষা গ্রহণের পর রাজা মালাবার ত্যাগ করে আরবের শাহরে উপনীত হন এবং চার বছর পর সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখান থেকে মালিক বিন দীনার, শরীফ ইবনে মালিক, মালিক ইবনে হাব্বি ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে চিঠি দিয়ে মালাবার প্রেরণ করেন। সেই চিঠিতে তিনি তাঁর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও মুসলমানদেরকে কিভাবে সংবর্ধনা দিতে হবে তার নির্দেশ দেন।[১] উপরন্ত আলী রাজা নামের একটি মুসলিম পরিবার কোলাত্তিরি রাজাদের মন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তী শতাব্দী সমূহের ইসলামের প্রভাব অপ্রতিহতগতিতে বৃদ্ধি পায়। মাসুদী, সুলায়মান, আবুল ফিদা, ইবনে বতুতা প্রমুখ মুসলিম পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনায় তা পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের মুসলমানগণ একটি সু-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের আগমন অষ্টম শতকের প্রথম দিকেই ঘটেছে। দশম শতাব্দীতে পূর্ব উপকূল এবং তুলনামূলকভাবে অতি অল্পসময়ের সমগ্র উপকুলীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবিনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। একদিকে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় শাসকদের মন্ত্রী, নৌ-সেনাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রদূত ও রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদার হন, অন্যদিকে তারা অনেক লোককে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন। নিজেরদের ধর্মমত প্রচার করেন। মসজিদ ও সমাধি স্তম্ব নির্মাণ করেন-যেগুলি পরবর্তীতে দরবেশ ও ধর্ম প্রচারকদের কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, মহানবী (সঃ) -এর জীবদ্দশায়ই সমুদ্র পথে আগত বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম ভারত উপমহাদেশে পৌছে এবং তাঁর জীবদশায় ইসলাম আরবের বাইরে বিস্তার লাভ করেনি- এমন ধারণাও পোষণ করার মত অবকাশ নেই।

জলপথের ন্যায় স্থলপথেও এ উপমহাদেশের মুসলিম প্রচারকদের আগমন ঘটে। স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তারা এদেশে আগমন করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে হিজরী ১৪/৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিক বালাজুরীর 'ফুতুহুলবুলদান' গ্রন্থের সূত্র ধরে আব্দুল গফুর বলেছেন - "উসমান ইবন আবুল আবী সাকাফী তাঁর ভ্রাতা মুগিয়া সাকাফী, হারেস বিন মুররি আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধুর সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।৪৪ হিজরীতে (৬৬৬ খ্রীঃ) মু'আবিয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবন আবূ সুফুরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী 'বানা' ও 'আহ্ওয়াজ' নামক স্থানে পৌছেন। মুহাল্লাবের পরে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাওয়ার, রাশেদ ইবনে আমর জাদীদী, সিনান ইবনে সালামাহ্, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুনজির ইবন জারুদ আবদী কয়েকবার সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।" [২] অবশেষে খলিফা ওয়ালিদের সময় ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তরুণ ও সুদক্ষ যোদ্ধা মুহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে একটি অভিযানের আয়োজন করেন। তিনি সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সিন্ধু জয় করেন এবং মুলতান ও সিন্ধুকে সাম্রাজের অন্তর্ভূক্ত করে তাঁর অভিযান সমাপ্ত করেন। এ অভিযানে তিনি চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যের সাহায্য পান। তিনি যখন পুরণো ব্রাহ্মণ্যবাদ জয় করেন তখন তাঁর পক্ষে 'সারওয়ান্দার' মুসলিম অধিবাসীগণ যোগ দিয়েছিলেন।[৩] মুহাম্মদ বিন কাশিম নতুন জন পদ জয় করে সেখানে একজন শাসক নিয়োগ করেন। তিনি দেবর (করাচী) জয় করে মসজিদ নির্মাণ করেন, সেখানে চার হাজার মুসলমানের বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের অনেককে জায়গীরও দান করেন।[৪]

---

১. ড.তারাচাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২. আব্দুল গফুর, 'মহানবীর যুগে উপমহাদেশ', অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৮৮ইং, পৃ.৪৯-৫৫
৩. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন অনূদিত, ইবনে বতুতার সফর নামার (উর্দু) অনুবাদ আযায়েবুল আসফার, (২য় খন্ড), দিল্লি - ১৯১৩ ইং পৃ. ৫২
৪. খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

আবার মুসলিম সেনারা যেখানেই অভিযান পরিচালনা করেছেন কিংবা মুসলিম বণিকরা যেখানেই বসতি নির্মাণ করেছেন সেখানেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ উপস্থিত হয়েছে। আবূ হিফাম বিন সাহিব আর আদাবী আর বসরী সিন্ধু আসেন এবং সেখানেই ১০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মনসুর হাল্লাজ নৌ-পথে ভারতে আসেন দশম হিজরীতে। তিনি স্থলপথে উত্তর ভারত ও তুর্কিস্তান হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। একাদশ শতাব্দীতে সহযাত্রী একদল দরবেশ নিয়ে বাবা রিহান বাগদাদ হতে ব্রোচে আসেন। নূর আলদীন বা নূর সতাগর (১০৯৪ - ১১৪৩ খ্রীঃ) গুজরাটের কুনবী, খাবভাস ও কোরীদের ইসলামে দীক্ষিত করেন। 'কাশফুল মাহযুব' গ্রন্থের প্রণেতা আলী বিন উমান হুজরী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সমুহ ভ্রমণ করে লাহোর চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। একাদশ শতাব্দীতে আসেন শায়খ ইসমাইল বোখারী। দ্বাদশ শতাব্দীতে আসেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুনতিক-উত-তায়ির' ও 'তাযকিরাতুল আউলিয়া'র লেখক ফরিদ উদ্দিন আক্তার। খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী আজমীরে আসেন ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১২৩৪ খৃঃ সেখানেই ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইসলাম অবধারিতরূপে একটি প্রচারমূলক ধর্ম মত। আর বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি মুসলমান এক একজন প্রচারক। তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার করে সকল প্রকার অংশীবাদী পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করা এবং মানব সমাজকে ইসলামের মূলনীতি তাওহীদের আওতায় এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃ সমাজে পরিণত করা। মূলত এ আদর্শের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আরব মুসলমানগণ নবীর (সঃ) ইন্তিকালের পরপরই নিজেরদের আবাস ভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বের নানা অঞ্চলে বিশেষত, ভারতীয় উপমহাদেশে। তাঁদের একান্ত প্রচেষ্টার ফলেই উপমহাদেশে ইসলাম বিজয়ী একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

যাহোক, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সময় ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকুলীয় বন্দর সমূহে ইসলামের আবির্ভাব, সে সময়ে বঙ্গোপসাগরের উপকুলীয় অঞ্চলে ইসলামী ভাবধারার আগমন ও প্রসার ঘটে। আরবীয় বণিকদের চট্টগ্রাম বন্দরে যাতায়াত ছিল। বিশেষ করে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগর ছিল তাঁদের সমুদ্র পথে পূর্ব দিকে যাতায়াতের একমাত্র পথ। আরব বণিকদের মাধ্যমে এদেশ থেকে মসলা, মিহিসূতী, রেশমী বস্ত্র, হাতির দাঁত, নানা বিধ রত্ন-এ সব সামগ্রী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এশিয়ায় ও ইউরোপে রপ্তানী হত।[১] ইসলামের আবির্ভাব তখন সমগ্রী আরবে একটা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই এমন একটা সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে আরবীয় উপনীবেশনগুলোতে পৌছেছে তা সহজেই অনুমেয়। ঐতিহাসিক বুযুর্গ বিন শাহরিয়ার বলেছেন - "আরবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে সরন্দীপবাসীরা রাসূল (সাঃ) এর কাছে দূত পাঠান, কিন্তু এ দূত মদীনায় পৌছান হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে। হযরত উমরের সাথেই সে দূতের সাক্ষাত হয়। ইসলাম, ইসলামের নবী এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে আলোচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফেরার পথে ঐ দূত বেলুচিস্তানের কাছে মাকরান এলাকায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর হিন্দু সাথী সরন্দ্বীপ পৌছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। বিস্তারিত জেনে সরন্দ্বীপের জনগণের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়।[২] ফিরিস্তার মতে, ' সরন্দ্বীপের রাজা ঐ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, (১ম খন্ড), প্রাচীন যুগ, কলিকাতা- ১৯৮১ইং, পৃ. ৫২
২. K.A. Nizami, op. cit. Int.
৩. K.A. Nizami, o.p. cit. Int.

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার মূলে সত্য-মিথ্যা যাই থাকনা কেন তবে এটা নিশ্চিত যে, এ সব ঘটনা থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন ছিল না। কেননা, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের ন্যায় বাংলাদেশ সাথেও আরবদের সুপ্রাচীনকালের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেই আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন- রিচার্ড সাইমন্ড বলেছেন -"The Culture that developed in Bengal was entirely different from that of Hindus. The ports of the country especially chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th century. A.D. and many of Arab voyegers and traders had left a permanent impress upon the area. Islam, therefore, took root very early in this respective sail"[১]

ব্যবসা-বাণিজ্যই এসব বণিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবেত ইসলামের আদর্শ ও নবীর সুন্নাহ্ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচ্যের দেশগুলিতে, বিশেষত জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও সদূর চীন দেশে। ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় বাংলাদেশের দিকে। তারা মনে করেছিলেন প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ইসলাম প্রচার করতে পারলে দেশের অপরাপর অঞ্চলে ও তা আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়বে। এরূপ অবস্থায় অষ্টম শতাব্দীর গৌড়ার দিকে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনীবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাবে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আরবীয় বণিক ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এ ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর দরবেশ ও সূফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[২] তাঁরা ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ইসলামের প্রচারকার্যে তাঁদের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদ জর্জড়িত এদেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনসমাজের সম্মুখে এক নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ক্রমে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে নিরবে ইসলাম প্রচারের জন্য এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে।[৩] এস.এম. তাইফুর বলেছেন- "Another equally important factor about the increase of Muslim population was the missionary and Proselytising zeal of the great sufis who preached principles of Islam. Infact the missionary activities were first started by Arab navigators and marchants long before the conquest of Bengal by Bakhtyar Khalji. The sufis came from the west hazarding perilous journey and sacrificing every thing dear and precious in life only to raise the degraded Hindus of Bangal to the high standard of Islamic civilization. The masses of Bengal were then groaning under the heels of the heaven born Brahmin oligarchy who used them helots and outcastes and denied them even the elementary rights of human beings"[৪]

---

১. Richard Saymonds, The Making of Pakistan, p. 197.

২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা-১৯৮৪ইং, পৃ. ১৬-২০

৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, 'বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশ ঃ কিছু ভাবনা' অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা - ১৯৮৯ইং

৪. S.M. Taifor, Glimpses of old Dacca, 1965. Introduction.

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবীয় মুসলমানদের যে প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধরনের প্রমাণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পরম্পরগত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি। এ সকল প্রমাণের প্রকৃতি এখন পরীক্ষা করা হবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ (Archaeological evidence):

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সম্প্রতি দু'টি রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করেছেন। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে এবং কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে আব্বাসীয় খলিফাদের একটি করে রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটি ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা হারুণ-অর-রশীদ কর্তৃক মুহাম্মদীয়া টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়।[১] ময়মানতিতে প্রাপ্ত মুদ্রাটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ খননের পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশ করেনি। তাই তথ্যের অভাবে দ্বিতীয় মুদ্রাটির সনাক্তকরণ দূরূহ, তবে মনে হয় এ মুদ্রাটিও আব্বাসীয় আমলের।

রাজশাহীর পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির উপর ভিত্তি করে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক মনে করেন যে, সেই প্রাথমিক আমলে আরব ধর্ম প্রচারকগণ বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন। ড. হক বলেন-"হিন্দু সভ্যতার কোন কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব পারস্যের মুসলিম সাধক ও ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের খলিফার এই মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবতঃ যিনি এই মুদ্রা সঙ্গে লইয়া তথায় প্রচার করিতে গমন করেন, তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং তাহার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হইয়াছিল। যেরূপেই হউক, পাহাড় পুরে আবিষ্কৃত খলিফার মুদ্রাটি, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গের সহিত ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে।"[২] ড. হকের মতে এই মুদ্রা ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে বাংলাদেশে আনীত হয়নি। কারণ তাঁর মতে তখন পাহাড়পুর সে সময় ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিলনা। তিনি আরও মনে করেন, এই মুদ্রা অষ্টম- নবম শতাব্দীর মধ্যেই পাহাড়পুরে নীত হয়। তিনি বলেছেন -" সেই প্রাচীন যুগে সাধারণত ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়াই এক দেশের টাকা অন্য দেশে যাইত। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের সেই সূত্রে খলিফা টাকা পৌছিয়াছিল বলিয়া মনে হয়না; কেননা, পাহাড় পুরের প্রাচীন প্রসিদ্ধি বাণিজ্যের জন্য ছিল বলিয়া এ যাবৎ প্রমাণিত হয় নাই। নিম্নের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এই মুদ্রার আমদানী হইয়াছিল বলিয়া অনায়াসে ধরা যাইত। এখন সে অনুমান করিবার কারণ দেখা যায় না। খুব সম্ভব, এই বৌদ্ধ বিহারটি তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।[৩]

তিনি আরো বলেছেন-"খলীফার মুদ্রাটি তাহারই রাজত্বকালে পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে আসিয়া পৌছিয়া থাকিবে। কেননা, তখনকার দিনে পূর্ববর্তী খলীফার মুদ্রা পরবর্তী খলীফার রাজত্বকালে চলিত না। মুদ্রা তখন ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি প্রধান নিদর্শন ছিল বলিয়াই এইরূপ বিধান দেশে প্রচলিত ছিল। তাই লোকে অনেক সময় 'খুৎবা' ও 'সিক্কার' পরিবর্ত্তন দেখিয়া খলীফার পরিবর্ত্তন মানিয়া লইত।

১. K.N.Dikshit, Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 55, Delhi, 1938. p. 87.
২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

তাহা হইলে বলিতে হয়, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদেই এই মুদ্রাটি আগমন করিয়াছিল। এই মুদ্রাটি যদি ধর্ম পালের রাজত্বকালে পাহাড়পুরে নাও আসিয়া থাকে ইহা যে খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বের (৭৮৬-৮০৯ খৃঃ) অন্যূন এক শতাব্দীর মধ্যে পাহাড়পুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।" [১]

ডঃ আব্দুল করিম নানা কারণে ডঃ হকের উপর্যুক্ত যুক্তিসমূহকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর ভাষায়-"যেহেতু মুদ্রাটি খলিফা হারুন-উর-রশীদ কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়, সেহেতু এই মুদ্রা খলীফার জীবদ্দশায় বা তাহার খেলাফতের পরে একশত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে আনীত হয়। এমন মনে করার কোন যথার্থ কারণ নাই। এখনও দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অনেক লোক মুসলমানী আমলের সিক্কা টাকা কবচ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয়ের পরে যে এই মুদ্রা বাংলাদেশে আনীত হয় নাই-এই কথা জোর করিয়া বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, পাহাড়পুর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র থাকুক বা না থাকুক সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হইতে এই মুদ্রা অভ্যন্তরীণ জন সমাবেশে নীত হওয়া অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে কোন মুসমলমান সাধক ও ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন কিনা বা আসা সম্ভব কিনা, তাহা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ এবং চতুর্থত, এইটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, পাহাড় পুরের মুদ্রাটি ধ্বংসস্তূপের মাটির উপরিভাগে আবিষ্কৃত হয়, খননকৃত বৌদ্ধ বিহারের কোন নিম্ন স্তরে পাওয়া যায় নাই।" [২]

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারও বলেন - "পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির তারিখ ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু উহা যে স্তরে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় ইহা অনেক পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এই দেশে আনা হইয়াছিল সুতরাং কাহারও কাহারও মত যে অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গ দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা হইতেছিল তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।" [৩] তবে এই মুদ্রা বাংলাদেশে কিভাবে প্রবেশ করে, তা সঠিক করে বলবার উপায় নেই, কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত পৌঁছতেও এই মুদ্রা তেমন সাহায্য করে না। তবুও ড. আব্দুল করিম ও ড. মজুমদারের উপর্যুক্ত বক্তব্যের জবাবে আমরা নিম্নরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারি।

ড. আব্দুল করিম তাঁর চট্টগ্রামে ইসলাম গ্রন্থে আরাকান রাজ বংশীয় উপাখ্যান রাদজাতুয়ে বর্ণিত কাহিনী তুলে ধরেছেন এভাবে- "এ সময়ের শেষ ভাগে কানরা-দজা-গীর বংশধর মহত ইঙ্গয়ত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা ২২ বৎসর রাজত্ব করার পর মারা যান। কথিত আছে, তাঁর সময়ে (৭৮৮ - ৮১০) খৃষ্টাব্দে কয়েকটি কুল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রনবী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং জাহাজের মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠানো হয়। সেখানে তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।" [৪] এ সময় বাংলায় বৌদ্ধ রাজা ধর্ম পালের শাসন চলছিল। ধর্মপাল ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আরাকানের রাজা মহত ইঙ্গয়ত চন্দয়ত ও ধর্ম পাল সমসাময়িক ছিলেন। ধর্ম পালের পুত্র দেব পালের রাজত্বের (৮১০-৮৪৫ খ্রীঃ) পর ময়নামতিতে শক্তিশালী দেববংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করেন।

---

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২
২. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭ইং, পৃ. ৫১-৫২
৩. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০
৪. ড. আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম- ১৯৮০ইং, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

আরাকানের রনবী দ্বীপে আরবীয় মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে এ মুদ্রাগুলোর সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছুই নয়। কারণ স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে, মুদ্রাগুলো সেগুলোতে উল্লেখিত সময়েই (৭৮৮ খৃঃ) বাংলায় নীত হয়েছিল। রনবী দ্বীপে জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনাটিও ঘটে ৭৮৮ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সম্ভবতঃ আরব বণিকদল গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং তাদের মাধ্যমেই পাহাড় পুরের সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে এ মুদ্রাটি আমদানী হয়।[১] আগেই বলা হয়েছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য করাই কেবল আরব বণিকদরে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। একই সঙ্গে তারা নিজেদের উপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও পালন করে যেতেন। আর এ কাজকে তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। কাজেই-"এ বণিকদের মধ্য থেকে অতি উ ৎসাহী কেউ কেউ ধর্মালোচনাও ধর্ম প্রচারার্থে তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কেন্দ্র পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধ বিহার ও ময়মামতির শালবন বিহারে গিয়ে থাকবেন এবং তাঁদের নিকট থেকেই এ মুদ্রাগুলো সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহার সমূহে আমদানী হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।[২] সুতরাং প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো সম্পর্কে ড. হকের মন্তব্যকে একেবারে অমূলক বলে নাকচ করে দেয়া যায় না।

সাম্প্রতিককালে রংপুর জেলার গদ গ্রামে একটি ফারসী শিলা লিপি আবিস্কৃত হয়েছে। এর সম্পাদক তার তারিখ গড়েছেন ১২৩ হিজরী।[৩] এটাকে তিনি হিজরী দ্বিতীয় বা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।ড. আব্দুল করিম এ.কে. এম. ইয়াকুব আলীর Aspects of sociaty and culture of the Barind. এর বরাত দিয়ে বলেছেন শিলালিপির নির্ভুল পাঠ থেকে দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে এটি মোঘল আমলের শেষ দিকের। ফলে ঐ প্রাথমিক আমলে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল বা উত্তর বাংলায় মুসলমানদের কোন বড় বসতি ছিল, এ সব প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এ কথা প্রমাণ করে না।[৪]

শিলালিপি যে যুগেরই হোক না কেন খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল না বা বাংলায় মুসলমানদের বড় ধরনের কোন বসতি ছিল না-এ মন্তব্যকে প্রাসঙ্গিক কারণেই সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাট সদর থানার পঞ্চ গ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার 'মজদের আড়া' গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। যা বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। -------এর বিশেষ ধরনের ইটগুলোতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালিমা তায়্যিবাহ্ সহ হিজরী ৬৯ সন লেখা আছে। -------- ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে এম মসজিদেকে ঘাঁটি করে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং এ অঞ্চলটি 'মজদের আড়া' নামে পরিচিত হয়েছিল।[৫] সুতরাং দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে রংপুর তথা উত্তর বাংলা মুসলমানদের শাসনাধীনে না আসলেও সেখানে যে মুসলমানদের একটা বড় ধরনের বসতি গড়ে উঠেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

১. আব্দুল মান্না তালিব, বাংলাদেশ ইসলাম,আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮০ইং, পৃ. ৫৭
২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৩. মেহরাব আলী, একশ তেইশ হিজরীর শিলালিপি, দিনাজপুর যাদুঘর, সিরিজ নং -৪
৪. Dr. A. Karim, Social History of the Muslims in Bengal. chittagong- 1985, p.27.
৫. দৈনিক বাংলা, ২০শে এপ্রিল-১৯৮৬ ইং, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ

মুসলিম ভৌগোলিক ও পরিব্রাজকদের মধ্যে সুলায়মান (জ.৮১৫ খ্রীঃ), আবূ যায়দুল হাসান (সুলায়মানের সমসাময়িক), (ইবন খুরদাদবা), (মৃঃ ৯১২ খ্রীঃ), আল মাসুদ (মৃঃ ৯৫৬ খ্রীঃ), ইবনে হাওকাল (মৃঃ ৯৭৬খ্রীঃ), আল ইদ্রিসী প্রমুখের বর্ণনা মতে, আরাকান হতে মেঘনা নদীর পুর্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হতে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

এ সব আরব ভৌগোলিক ও পর্যটকগণ তাদের বর্ণনায় এমন একটি দেশ ও বন্দরের নাম উল্লেখ করেছেন যে দেশকে বাংলাদেশ হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে এবং বন্দরকে বাংলাদেশের উপকূলের একটি সমুদ্র বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তা এদেশকে 'রুহমী' বা 'রাহমী' নামে অভিহিত করতেন। ইবন খুরদাদবা বলেন যে-রাহমী রাজ্য সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল এবং রাহমী ও অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে তখন জাহাজযোগে যাতায়াত চলত। রাহমীর পরবর্তী রাজ্যকে কামরূন (কামরূপ) নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] মাসুদী লিখেছেন-রাহ্মা রাজ্য ছিল সমুদ্র ও স্থল উভয় দিকে বিস্তৃত। এটি কামান রাজ্য (কামরূপ) নামে অভিহিত একটি দ্বীপ রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[২]

সুলায়মান বলেছেন-" রাহমীর রাজা খুবই শক্তিশালী ছিলেন। তার পঞ্চাশ সহস্র হস্তী ও পনর সহস্র সৈন্য ছিল। বালহোরাহ ও যুরজ রাজার সঙ্গে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।"[৩] আরব ভৌগোলিকদের বর্ণিত রাহমী রাজ্যের সীমানা বাংলা ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক । এর একদিকে ছিল সমুদ্র, অন্য দিকে কামরূপ। আরবদের উল্লেখিত রাহমী রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও রপ্তানী পণ্যগুলো বাংলার বিশিষ্ট জিনিস। সুলায়মান এদেশের ঘৃতকুমারী কাঠ, কড়ি এবং এক ধরণের সূক্ষ্ম ও মিহিন সূতিবস্ত্রের উল্লেখ্য করেছেন। খুরদাদবাও রাহমীর এ সকল পণ্য দ্রব্যাদির কথা বলেছন। 'পেরিপ্লাস অব দ্যা ইরিত্রিয়ান সী' গ্রন্থেও সর্বোৎকৃষ্ট মসলিনবস্ত্রের উল্লেখ আছে। এটা ছিল গাঙ্গীয় অঞ্চলের। এ সকল প্রমাণাদিতে স্পষ্টভাবে অনুমিত হয় যে, রাহমী ও বাংলা ছিল এক এবং অভিন্ন দেশ।[৪]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরব ভৌগোলিকদের দেয়া বিবরণে আরব মুসলমান বণিকদের পুর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যের, বাণিজ্যপথের ও দ্রব্য সামগ্রীর যে বিবরণ রয়েছে, তা থেকে একথা প্রমাণিত হয়, আরবের মুসলমান বণিকগণ সমুদ্র পথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য করত এবং তাদের এই যাত্রাপথে তারা বাংলাদেশের সুমদ্র উপকূলীয় এলাকায় আসত। বাংলাদেশের বন্দরে তারা তাদের পণ্য-দ্রব্যের কেনা-বেচা করত। এখানে থেকে শ্যাম হয়ে চীন দেশে পৌছাত। আরব ভৌগেলিকগণ আরবদেশ থেকে চীন পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী ব্যবসায়িক স্থানগুলোর নামকরণ করেছেন। তাদের দেয়া বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আরব বণিকগণ তাদের প্রাচ্য যাত্রায় 'সমন্দর', ওরনাসীন বা রোসাঙ্গ ও আবিনা বা বার্মা পরিদর্শন করে। এক্ষেত্রে সমন্দর নামটি উল্লেখযোগ্য। আরব ভৌগোলিকদের প্রদত্ত 'সমন্দর' বন্দরের বর্ণনা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এটা বাংলারই উপকূল অঞ্চলে একটি বন্দর ছিল।

১. Elliot and Dowson, Histor of India as told by its Own Historian, vol- 1, 5.
২. Elliot and Dowson, op. cit. p. 25.
৩. Elliot and Dowson, op. cit. p. 5.
৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪.

Dhaka University Institutional Repository

সমন্দর বন্দর সম্পর্কে ইবন খুরদাদবাহ বলেছেন-"সমন্দর চাউল উৎপাদন করে এবং 'কামরূপ' ও অন্যান্য স্থানে থেকে ১৫ বা ২০ দিনের নদী পথে এখানে ঘৃতকুমারী কাঠ বা চন্দকাঠ আমদানী করা হয়।"[১] আল ইদরিসীর ভাষায়-" সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং সমৃদ্ধশালী স্থান যেখানে অনেক লাভবান হওয়া যায়। এ বন্দর কণৌজের অধীন। কাশ্মির থেকে আসা এক নদীর তীরে এটা অবস্থিত। চাল এবং অন্যান্য শস্য বিশেষত উৎকষ্ট গম এখানে পাওয়া যায়। ১৫ দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরূত দেশ (কামরূপ) থেকে এখানে মিঠা পানির নদী পথে চন্দনকাঠ আনা হয়।"[২]

এখানে মিঠা পানিকে সমন্দর বলা হয়েছে। এই সমন্দরই একমাত্র স্থান যাকে বাংলার উপকূলীয় কোন স্থানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে। এ.এইচ, দানী বলেছেন-"আরব ভৌগোলিকদের সমন্দর ছিল বাংলার উপকূলীয় কোন স্থানে অবস্থিত, খুব সম্ভবত এটা মেঘনা মোহনায় অবস্থিত।"[৩] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তাই দেখিয়েছেন।[৪] ড. আব্দুল করিম বহু যুক্তি প্রমাণের আলোকে এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।[৫]

আরাকান রাজবংশীয় উপখ্যান 'রাদজাতুয়ে', একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এতে বলা হয়েছে-"৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের আরাকানের রাজা সুলতইঙ্গ চন্দয়ত সুরতরণ জয় করে সেদেশে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয় চেত্তাগৌং অর্থাৎ যুদ্ধকরা অনুচিত।"[৬] এখন প্রশ্ন হল-আরাকান রাজা কাদের সাথে যুদ্ধ করা সমীচীন নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন ? মুসলমানদের সাথে ? চট্টগ্রামে কি তখন আরবীয় উপনীবেশ গড়ে উঠেছিল ? তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কি আরাকান রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল ? এসব সম্ভাবনা একেবারে অমূলক বলে মনে হয় না। তাই পন্ডিদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' শব্দের আরাকানীরূপ এবং তদানুসারে তারা বলেন চট্টগ্রামের ঐ সময়ে মুসলমানেরা একটি আরবরাষ্ট্র গঠন করে ছিলেন।[৭] কিন্তু এ ব্যাপারে ড. আব্দুল করিম নেতিবাচক মন্তব্য করে বলেছেন-"চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরব মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমানেরা আরব রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল বলা অতিরঞ্জন বৈ নয়। একটি মাত্র শব্দ 'সুরতন' যাহার অর্থ পরিষ্কার নয় তাহার ভিত্তি করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, আরাকান বংশাবলী পড়িয়া মনে হয় 'সুরতন' শব্দটি সুলতানের বিকৃতরূপ নয়, বরং ইহা অধুনালুপ্ত কোন এক স্থানের নাম বহন করে।"[৮]

যা হোক চট্টগ্রাম আরবদের স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠুক না না উঠুক আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাঁদের প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়, চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পুর্বে না সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামী অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভুত বলে দাবী করেন। চট্টগ্রামের একাধিক কদম রসূলের অস্তিত্ব দেখা যায়। চট্টগ্রামৌ লোকের মুখাবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেকে মনে করেন। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন-আলকরণ, সুলুক বহর (সুলুক-উল-বহর), বাকলিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে।[৯]

১. উদ্ধৃত ঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২.
২. উদ্ধৃত ঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২.
৩. Dr. A. M. Dani, Procedings of the Pakistan Conference, 1st Session, Karachi, 1951. p.191.
৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৪
৫. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২- ৩৬
৬. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত. পৃ. - ৩৬
৭. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ও আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৩৫ইং, পৃ. ৪৫
৮. ড.আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), পৃ. ৬২.
৯. ডকটর আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরন্ত আরব বণিকগণ স্বপরিবারে বিদেশ ভ্রমণে বের হতেন না। তাদের দীর্ঘ ভ্রমণের কোন কোন স্থানে তারা যাত্রা বিরতী করতেন এবং স্বাভাবিক চাহিদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের মহিলাদের বিয়ে করতেন। এভাবে বহু স্থানীয় মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ইবনে বতুতার তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন-আরাকানে তিনি দেখেন বাংলার ও ইন্দোনেশীয়ার মুসলমানদের কলোণী। মালদ্বীপে তিনি এক বাঙালী মুসলিম রাজ বংশের রাজত্ব দেখেন। তিনি বলেছেন-"পরমাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জের (মালদ্বীপ) বাদশাহ হচ্ছেন খাদিজা নাম্নী জনৈক মহিলা। তিনি সুলতান জালাল উদ্দিন উমর ইবনে সুলতান সালাহ্ উদ্দিন সালেহ বাঙালীর কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ ছিলেন, অতঃপর তাঁর পিতা বাদশাহ্ হন।"[১]

প্রশ্ন দেখা দেয় এতদঞ্চলে এই যে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি, বসতি স্থাপন, প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায় এর আদি গুরু কে বা কারা ছিলেন ? মালাবার বা চেরর রাজ্যে এ সময় কে বা কারা এসেছিলেন ইসলামের আদর্শ প্রচার করতে? তাদের পরিচয়ই বা কী ? কীভাবেই বা তারা এসে ইসলাম প্রচার করলেন ? ইসলামের আবির্ভাবের যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশায়ই তাঁর মাতুল সাহাবী আবিও ওয়াক্কাস (রাঃ) (যিনি ইসলাম গ্রহণকারী নমব ব্যক্তি) সমুদ্র পথে বাংলাদেশে পদার্পন করেন।[২] ৬১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী কায়স বিন হুযায়ফ (রাঃ), উরওয়া ইবন আছাছা (রাঃ) এবং আবু কায়িস ইবন হারিস (রাঃ)। আবূ ওয়াক্কাসের (রাঃ) নেতৃত্বে দলটি আবিসিনিয়ার হাবসা হতে যাত্রা করার পর অনূন্য নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সময় অতিবাহিত করে চীনে পদার্পন করেন। তিনি চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থানকালে যে কোয়াংটা মসজিদটি নির্মাণ করেন, কালের নিরব সাক্ষী হিসেবে তা আজও বিদ্যমান রয়েছে।[৩] চীনে পদার্পণ করার পূর্বে তিনি নয় বছর পথিমধ্যে অতিবাহিত করেন। এ সময় কি তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম (সমন্দর) বন্দরে ও অবস্থান করেছিলেন ? ঘটনা প্রবাহ সেদিকেই ইঙ্গিত করে। চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ানের মতে-"বর্তমান চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে এমন একটি বন্দরনগরী ছিল, যেখানে খুব উন্নতমানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হত। এ সব তৈরী জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ব্যবহৃত হত। এ বন্দরে জাহাজ মেরামত ও করা হত। দূর থেকে আগত প্রতিটি জাহাজ এ বন্দরে যাত্রা বিরতী করত।"[৪] চীনে যাবার পথে আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) কি এ বন্দরে যাত্রা বিরতী করেছিলেন ? এখানে বেশ কিছুকাল অবস্থান করে কি তিনি জনসাধারণের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচার করেছিলেন ? বিষয়টি এখনও গবেষণা সাপেক্ষ।

বাংলাদেশের জলপথের ন্যায় স্থলপথেও ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আগেই দেখা গেছে যে, খলিফা উমর (রাঃ) এর আমল থেকে মুসলমানদের সিন্ধু অভিযান শুরু হয়েছে এবং ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। তাঁর অভিযানের পূর্ব থেকেই স্থলপথে এদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে। তিনি তার অভিযানের সহযোগী শক্তি হিসেবে পেয়েছিলেন চারহাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্য ও সাওয়ান্দারবাসী মুসলমানদেরকে। অষ্টম শতকের মধ্যেই সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের উপনীবেশ ও বসতি গড়ে উঠে। বাংলাদেশও তৎকালের এ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ৮ম শতকের বাংলার বৌদ্ধ সম্রাটক ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ) পশ্চিমে সিন্ধুনদ থেকে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করে রাজধানী কাণ্যকুব্জে এক বিরাট রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন

১. খান বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১
২. দ্রষ্টব্যঃ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩. দ্রষ্টব্যঃ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৪. উদ্ধৃতঃ ড. মুহাম্মদরুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তার এ অভিষেক অনুষ্ঠানে ভোজ, মৎস, মদ্র, কুরু,যদু,যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সবের মধ্যে সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোন অঞ্চল বা রাজ্যকে যবন বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ৮ম শতকের শেষ এবং ৯ম শতকের প্রথম দিকে সিন্ধুর মুসলিম শাসন কর্তার সাথে সম্রাট ধর্মপালের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এমনকি সিন্ধু ও বাংলা উভয় দেশের সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উভয় দেশের মনীষী ও পন্ডিতগণ বন্ধুদেশে গমন করে সংশ্লিষ্টদেশ ও জাতির চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।[১]

যাহোক হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে (খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মুমিন) বাংলাদেশে আসেন। এদের নেতা ছিলেন হযরত মামুদ ও মুহায়মিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেনে হযরত হামিদ উদ্দীন (রাঃ), হযরত হোসেন উদ্দীন (রাঃ), হযরত মুর্তজা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) ও হযরত আবূ তালিব (রাঃ)। এই রকম পাচঁটি দল পরপর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র বা বই-কিতাব ও থাকত না। তারা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাদের প্রচার পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তারা এদেশের বলাত ভাষার মাধ্যামেই ধর্ম প্রচার করতেনা। ---------- এরা গ্রামে বাস করতেন ও সফর করে ধর্ম প্রচার করা এদের প্রধান কাজ ছিল। এর পর আরও পাচঁটি দল মিসর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এদের বলা হত আবিদ। এরা বিভিন্ন স্থানে খানকা বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে যেতেন।"[২] এরপর ইসলাম প্রচারের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রচারকদের আগমন অব্যাহত থাকে। আর্য ধর্মের বর্ণ প্রথা ও সামন্ত শাসকদের অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষের মুক্তিদানের বৌদ্ধ ধর্মের ব্যর্থতার ফলে ইসলামের আহবান আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। সুতারাং দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ৭ম থেকে ১০ম শতকের মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। তবে সঠিক ও বিস্তারিত তর্থ্যের অভাবে কখন, কারা, কীভাবে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন তাদের সকলের নিশ্চিত বিবরণ জানা যায় না । তবে এটা নিশ্চিতে যে বিছিন্নভাবে হলেও একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত একটা পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কিংবদন্তী ভিত্তিক প্রমাণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকজন মুসলিম সূফী-দরবেশের জীবন সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত লোক কাহিনী ও কিংবদন্তী উপর নির্ভর করে কোন কোন পন্ডিত মত প্রকাশ করেছেন, ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের পূর্বে এসব দরবেশ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এধরণের কাহিনীতে দরবেশদের অনুশীলিত করামত বা অতিমানবীয় শক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই এসব রহস্যময় কাহিনীগুলো আধুনিক পন্ডিতদের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। শুধু স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাসের গভীরতা ও সাধারণভাবে তাদের উপর সাধকদের প্রভাব দেখাবার জন্যই এসব উপকরণ রাখা হয়েছে। মুসলামানদের বঙ্গবিজয়ের পূর্বে যে সকল সুফী দরবেশ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে ছিলেন বলে বিভিন্ন কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি রয়েছে-তাদের কয়েকজন হল-

১. অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, প্রথম স্তবক, রাজশাহী, ১৩১৯ বাং, পৃ. ২১-২২।
২. ডঃ হাসান জামান, সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮০ইং, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

বাবা আদম শহীদ

ইসলাম প্রচারক সূফী-দরবেশগণের মধ্যে বাবা আদম শহীদকে সর্ব প্রাচীনবলে ধারণা করা হয়। ঢাকা বিভাগের বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপালে এ দরবেশ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তিনি সম্ভবত জাতিতে তুর্কী। তিনি ইরানের কোন এক শহরে কোন পীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন অতপর স্বীয় পীরের অনুমতিক্রমে ইসলামে প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্ব ভারতে আগমন করেন। তিনি অন্যান্য দরবেশের মতই সমুদ্র পথে বাংলায় আসেন। তিনি কোথায় অবতরণ করেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে প্রথম তিনি মহাস্থানগড়ে এসে আস্তানা স্থাপন করেন এবং এখানে একটি বড় দীঘি খনন করেন। যার নাম আদমদীঘি।

বিক্রমপুরের রাজা বল্লান সেনের সময় (১১৫৮-১১৭৯খ্রীঃ) বাবা আদম এদেশে আসেন। তার আমলেই বাংলায় কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে আভিজাত্যের বীজ বপন করা হয়। সেন রাজারা অহিন্দুদের বিশেষ করে বাংলাদেশের পূর্ব অধিবাসী বৌদ্ধ ও উদীয়মান ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমানদের সুনজরে দেখেননি। নানাভাবে তাদের উপর উৎপীড়ন চালানো হত। এ উৎপীড়নের কথা শুনে বাবা আদম বিক্রমপুরে আগমন করেন।[১] তাঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি সঙ্গে কিছু সশস্ত্র অনুচর নিয়ে আসেন এবং যেখানেই গিয়েছেন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন।[২]

জনশ্রুতির বর্ণনা অনুসারে,তিনি ফকির হিসেবে যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন তখন রামপালের অনতিদূরে 'কানাইচেং' গ্রামের জনৈক মুসলমান রাজা বল্লান সেনের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে মক্কায় তাঁর নিকট উপস্থিত হন। সেই মুসলমান ব্যক্তির অপরাধ ছিল যে, তার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে তিনি একটি গরু জবাই করেছিলেন। তিনি হিন্দু রাজা কর্তৃক অত্যাচারিত হবার কাহিনী তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নেই এমন একটি দেশের কথা শুনে দরবেশ বিচলিত হন এবং ছয় থেকে সাত হাজার সহচর নিয়ে বাংলায় আসেন। রামপালের কাছে শিবির স্থাপন করে তিনি গরু কুরবানী করতে থাকেন। এর ফলে রাজাবল্লাল সেনের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। শেষ পর্যন্ত দরবেশ নিহত হন। কিন্তু ভাগ্যের এক অদ্ভুত লীলায় রাজা সপরিবারে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ হারান।[৩]

আব্দুল্লাহপুর গ্রামে বারা আদমের মাযার রয়েছে। মাযারের অদুরে 'আদম শহীদের মসজিদ' নামে একটি মসজিদও এ দরবেশের কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। মসজিদটিতে একটি আরবী লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ৮৮৮ হিজরী সনে (১৪৮৩ খ্রীঃ) কাফুর নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়।[৪] এ শিলালিপি হতে অন্ততঃ এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাবা আদম শহীদ হন। কারণ দরবেশদের মৃত্যুর পরই তাদের দরগাহ্ এবং দরগাহ্ সংলগ্ন মসজিদ নির্মিত হতে দেখা গেছে। কাজেই বাবা আদম শহীদের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।[৫]

---

১. সম্পদনা পরিষদ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ই.ফা. বা, ১৯৯৩ই, পৃ. ১১০

২. বখতিয়ার খিলজীর পূর্বে কেউ সৈন্য সামন্ত নিয়ে এ দেশে এসেছেন ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া যায় না।

৩. কিংবদন্তীর জন্য দ্রষ্টব্য, জে, এ, এস, বি, ৫৭ খন্ড, পৃ. ১২

৪. Dr. Enamul Huq. op. cit. p. 221.

৫. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সুলতান রুমী

নেত্রকোণা জেলার মদনপুরে এ দরবেশের মাযার অবস্থিত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার সংশিষ্ট সম্পত্তি পূনঃগ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু মাযারের খাদিম ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের একটি ফার্সি দলিল প্রদর্শন করে সম্পত্তি রক্ষা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, শাহ সুলতান রুমী ৪৪৫হিঃ/১০৫৩ খ্রীষ্টব্দে মদনপুরে এসেছিলেন বলে দলিলে দাবি করা হয়েছে। [১] এ থেকে জানা যায় যে, অত্র এলাকায় দরবেশের সাফল্যে স্থানীয় কোচ রাজা বিচলিত হয়ে পড়েন। রাজা তাকে দরবারে ডেকে এনে দরবেশকে বিষপান করতে দেন। তিনি নির্দ্বিধায় তা গলধকরণ করেন। এতে তার কিছুই হলনা। তাঁর এ অলৌকিক শক্তি দেখে কোচ রাজা মুগ্ধ হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। দরবেশে ও তাঁর ভবিষ্যত আধ্যাত্মিক উরাধিকারীদের খেদমতের জন্য সমগ্র গ্রাম উৎসর্গীত করেন। [২]

শাহ্ সুলতান রুমীর সঙ্গে একশ বিশ জন সহচর ও শিষ্য আসেন বলে জানা যায়। তাঁর পীরের নাম সৈয়দ শাহ্ সূর্খখুল আনতিয়হ। ইনিও শাহ্ সুলতান রুমীর সঙ্গে মদনপুর আগমন করেছিলেন বলে জানা যায়।

মদনপুরে এ দরবেশের প্রায় চল্লিশজন শিষ্যের মাযার রয়েছে বলে অনুমিত হয়। তাঁর শিষ্যমন্ডলীর মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন শাহ্ দারাব উদ্দীন গাজী, শাহ্ শেরআলী তাতার, শাহ সাহেব এবং সুফা বিবি। তাঁর মাযারের নিকট বিস্তৃত জমিতে একটি পাকা মসজিদ, একটি মুসাফির খানা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর ফালগুন মাসে এখানে উরস অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উরস তিনদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। [৩]

সৈয়দ সূর্খখুল আনতিয়াহ্

এই দরবেশ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তিনি তাঁর শিষ্য শাহ সুলতান রুমী এক্ষেত্রে এদেশে আগমন করেন। তিনি নেত্রকোণায় সুলতান রুমীকে রেখে ময়মনসিংহের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে যান। সেখান থেকে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অন্যমতে, তিনি ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চলেও কিছুকাল ধর্ম প্রচার করেন। আরেক মতে, তিনি পাবনা ও বগুড়ায় ইসলাম প্রচার করেন। তবে এটা নিশ্চিত যে তিনি ৪৪৫ হিঃ/১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আসেন। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। [৪]

শাহ্ সুলতান মাহী সাওয়ার

বগুড়া জেলার মহাস্থানে শাহ সুলতান মাহী সাওয়ারের মাযার বিদ্যমান। ধারণা করা হয় যে, তিনি বলখের যুবরাজ ছিলেন। তিনি রাজ প্রাসাদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে কঠোর সংযমের জীবন অবলম্বন করেন এবং ইসলামের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ইহজাগতিকতা পরিহার করার জন্য তিনি দামেস্কর শায়খ তৌফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর শায়খ তাঁকে ইসলামের সেবার জন্য বাংলার অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে প্রেরণ করেন। জনশ্রুতি মতে,তিনি সন্দ্বীপ হয়ে সমুদ্রে পথে বাংলাদেশে উপস্থিত হন। তিনি মৎস্যাকৃতির জাহাজে করে এসেছিলেন বলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে 'মাহী সাওয়ার' নামে অভিহিত করত।

---

১. Bengal District Gazetteers, Mymensingh- 1917. p. 52.
২. Ibid. p. 152.
৩. গোলাম সাকলায়েন, আমাদের সুফী সাধক, ই. ফা. বা. ১৯৮৭ইং, পৃ. ১৫৭-৫৮
৪. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, 'বাংলায় ইসলাম' বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ই.ফা.বা, ১৯৯৩ ইং, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

সন্দ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করার পর তিনি ঢাকা জেলার হরিরাম নগরে আসেন এবং কালীপুজারী অত্যাচারী রাজা বলরামের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষে রাজা নিহত হন। রাজার মন্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর এই দরবেশ মহাস্থানের দিকে অগ্রসর হন ও সেখানে তিনি রাজা পরশুরাম ও তাঁর ভগ্নী শীলাদেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে রাজা নিহত হন এবং শীলাদেবী করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্ম হত্যা করেন।[১]

প্রচলিত কাহিনী মতে রাজা পরশুরাম অত্যাচারী ছিলেন এবং বিশেষ করে তিনি মুসলমান প্রজাদের উপর খুবই কঠোর ছিলেন। জনসাধারণ তাঁর অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে পড়ে এইচ. বিভারেজের মতে-"রাজার এহেন অত্যাচার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধেই সুলতান মাহীসাওয়ার জনগণের একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণও গণবিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।"[২] যাহোক পরশুরামের কন্যা রত্নামণি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর দরবেশ মহাস্থানে একটি খানকাহ ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব সুলতান বলখীর মাযারের খাদিমকে একটি সনদ প্রদান করেন। এ সনদ পত্রে পীরোত্তর সম্পত্তির স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর নাম লেখা হয়েছে মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহীসাওয়ার।[৩]

মাখদূম শাহ্ দৌলা শহীদ

মাখদুম শাহ্ দৌলা পাবনার শাহ্যাদপুরে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। জে.এ.এস.বি.র বর্ণনা মতে, আরবের ইয়ামন নামক স্থানের বাদশাহ ছিলেন মুয়াজ বিন জাবাল। তাঁর এক কন্যা এবং দুই পুত্র ছিল। মাখদূম শাহ দৌলা দুই শাহ্জাদার অন্যতম ছিলেন। পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি বহু অনুসারীসহ ইয়ামন থেকে এসে ছিলেন। তাঁর সহচরদের মধ্যে তাঁর এক ভগ্নী এবং তিন ভাগ্নেও ছিলেন। তার তিন ভাগ্নের নাম খাজা কলান দানিশমন্দ, খাজা নুর, খাজা আনোয়ার। দরবেশের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিন ভাগ্নেকে তিনি পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। এদের নিয়ে তিনি বুখারাতে পৌছলে তার সঙ্গের জালাল উদ্দীন বুখারীর সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাঁকে দুইটি পায়রা উপহার দিয়েছিলেন। মাখদূম শাহ্দৌলা ও তাঁর সঙ্গীদের বহনকারী জাহাজগুলো শাহ্জাদপুর না পৌছা পর্যন্ত পূর্বদিকে যাত্রা অব্যাহত রাখে। এখানকার রাজা ছিলেন বিহারেরও অধিপতি। তিনি এসব বিদেশীদের বসতি স্থাপনে বাধা প্রদান করেন। ফলে যে যুদ্ধ হয় তাতে দরবেশ তাঁর কিছু সহচর প্রান হারান।[৪]

হিন্দু রাজার হাতে অপমানিত হওয়ার আশংকায় শাহ্ দৌলার ভগ্নি একটি পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্যোৎসর্গ করেন। তখন থেকে সেই পুকুরের নাম হয় 'সতি বিবির ঘাট'। মাখদূমের দেহচ্যুৎ শির বিহারে নীত হয়। হিন্দু রাজা তাঁর শিরে স্বর্গীয় জ্যোতি দর্শন করে মুসলমানদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদের সাহায্যে এই শির সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করে দেন। খাজা নূর শাহ নামে তাঁর ভাগ্নে জীবিত ছিলেন, তিনি শাহজাদপুরে তাঁদের নির্মিত মসজিদের সন্নিকটে এই দরবেশের মস্তকবিহীন দেহ সমাহিত করেন। তার সামাধির পার্শ্বে তার ভাগ্নে ও অনুচরকে কবর দেয়া হয়।[৫]

---

১. J.A.S.B. 1878. pp. 88-95 ; District Gazetteers, Bogwara, 1910. p. 154 - 55.
২. Dr. Enamul Haq. op. cit. p.238.
৩. Dr. Enamul Huq. op. cit. p. 239.
৪. J.A. S. B. part -1, No. 3, 1904, p.91.
৫. Bengal District Gazetteers, Pabna, 1921. pp.121-26.

Dhaka University Institutional Repository

মাখদূম শাহ দৌলার জীবনকাল সম্পর্কিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি মুযাস বিন জাবালের পুত্র ছিলেন না। তিনি হয়ত তার একজন বংশধর ছিলেন।[১] দরগাহ সংলগ্ন শাহজাদপুর মসজিদের মুতাওয়াল্লিগণ সরাসরি সরকার কর্তৃক ভাতা হিসেবে প্রদত্ত ৭২২ বিঘা লাখেরাজ জমির মালিক।[২]

মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বর্ধমানের মঙ্গলকোট থেকে একটি কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছেন। তদানুসারে মাখদূম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে রাহী পীর নিজ নেতৃত্বাধীন এক দরবেশে বাহনী ও সতেরজন স্বদেশবাসী নিয়ে মঙ্গলকোট জয় করেছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে বিক্রমকেশরী নামক জনৈক হিন্দু রাজার রাজত্বকালে তিনি মঙ্গলকোট আগমন করেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। ধর্মান্ধ হিন্দু রাজা তাকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে নির্যাতন করেন। দরবেশ তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে দিল্লির সুলতানের নিকট পত্র লিখেন। দিল্লী থেকে একদল মুসলিম সৈন্য মঙ্গলকোট পাঠানো হয়। দরবেশ তাদের সঙ্গে যোগদেন এবং যুদ্ধে রাজা বিক্রমকেশরী পরাজিত হন। রাজা পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান এবং ফলে মঙ্গলকোট মুসলমানদের হস্তগত হয়।[৩] শহরের হিন্দু অধিবাসীরা হয় পালিয়ে যায়, না হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। স্থানীয় জনসাধারণ এখনও মঙ্গলকোটে ১৮ জন সিদ্ধ পুরুষের সমাধি দেখিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে মুসলমাদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই মঙ্গলকোটে শাহ গজনবীর আগমন ঘটেছিল বলে অনেকে বুঝাতে চাইলেও তার আগমন ও কার্যাবলী বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে স্থাপন করা উচিত। ড. হক তাই বলেছেন-"considering all aspects of the tradition of Mangalkot, we are inclined to hold the vew that its conquest by Rahi Pir (Makhdum Shah Mahmud Gajnavi) and his companions was an historical episode that might have taken place during the early years of the Turki conquest."[৪]

শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন

শাহ নিয়ামতুল্লাহ পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বে ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন বলে জানা যায়। তিনি কোথা থেকে এখানে আসেন তা আজও অজ্ঞাত। কিংবদন্তী হতে জানা যায় যে, তিনি ঢাকা নগরী সন্নিহিত এলাকায় ইসলাম প্রচারে অগ্রসর হলে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুগণ তাকে বিভিন্নভাবে বাধা দিতে থাকে। একদিন তিনি ইবাদাতে মসগুল ছিলেন, এমন সময় হিন্দুরা দেব মূর্তি নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা প্রতিমা বিসর্জন দেবার জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশের আস্তানার নিকটে এসে তারা বাদ্যের আওয়াজ বৃদ্ধি করে ভীষণ শোরগোলের সৃষ্টি করে। ফলে দরবেশের ইবাদাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি দূরদৃষ্টিতে মূর্তিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ফলে পথের উপরই মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। শোভা যাত্রীরা ভীত হয়ে পলায়ন করে। এ অভাবনীয় দৃশ্যে হিন্দুদের মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। এ ঘটনার পর দলে দলে হিন্দুরা তাঁর আস্তানায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে বলে জানা যায়।[৫] মনে হয় এ ঘটনার কারণেই তাঁকে বুতশিকন বা মূর্তি নাশক উপাধি দেয়া হয়। বর্তমান ঢাকা নগরীর পুরানাপল্টন এলাকায় দিলকুশা বাগে এ দরবেশের মাযার অবস্থিত। মাযারের পার্শ্বে পাঠান আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান।

---

১. দ্রষ্টব্য, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

২. J.A. S. B. o.p. cit. 267.

৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৩৩৫ বাং, পৃ. ১২৯

৪. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. p. 190.

৫. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ মাখদুম রুপোশ

শাহ মাখদুম রুপোশ রাজশাহী শহরের পার্শ্বে পদ্মা নদীর উত্তর তীরে দরগাহ পাড়া মহল্লায় সমাহিত আছেন। মাযার গাত্রের খোদিত নাম ফলকে তাঁকে সায়্যেদ সনদ শাহ দরবেশ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সর্ব প্রথম নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ীর শামপুর মহল্লায় এসে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে বেশ কিছুকাল ইসলাম প্রচারের পর তিনি তাঁর শিষ্য সৈয়দ জকিম উদ্দীন হুসাইনকে শামপুর এলাকার স্থলাভিষিক্ত করে অন্যান্য শিষ্যদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং তিনি মাত্র চারজন শিষ্য নিয়ে নদী পথে মহাকালগড় (বর্তমানে রাজশাহী শহর) এসে উপস্থিত হন। পদ্মা নদীর দুই মাইল উত্তরে চারঘাট নামক স্থানে তিনি আস্তানা স্থাপন করেন। [১]

শাহ মাখদূম তাঁর আসল নাম নয়। এসবই তাঁর নামের পূর্বাপর উপাধি। দলিল দস্তাবেজের দুস্প্রাপ্যতার কারণে তাঁর আসল পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মাযারের তদাস্তীন খাদিম গোলাম আকবর রাজশাহী জেলা কোর্টে দরগাহ সম্পত্তি পরিচালনা সম্পর্কিত যে বিবৃতি দেন তা থেকে শাহ মাখদূমের বাংলাদেশে আগমনকাল চিহ্নিত করা যেতে পারে। "মাখদূম শাহ্‌র নামে হযরত রুপোশ। তাঁর অন্য নাম কি ছিল জানিনা। --- তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ও আমার স্মরণ নেই। মাযার সন্নিহিত সম্পত্তিটি ১০৪৪ হিজরীর পূর্বে প্রদত্ত হয়নি। আর আমি যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছি। তাতে দেখা যাবে যে, হযরত রুপোশ সেই সময়ের সাড়ে চারশ বছর আগে জীবিত ছিলেন।" [২] তাঁর সাক্ষ্য মতে, শাহ মাখদূম রুপোশ অন্ততঃ ১১৮৪ কিংবা তাঁর আগে রাজশাহী এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। আর উত্তর বঙ্গে তাকেই ইসলাম প্রচারকদের অগ্রপথিক বলা যায়।

মহাকালগড়ে (রামপুর বোয়ালিয়া) মহাকাল দেও এর মন্দির অবস্থিত ছিল। সেখানে নরবলী দেয়া হত। বর্মভোজ ও বর্মগুপ্ত ভোজ নামে দু'জন সামন্ত রাজা গড়ের অধিপতি ছিলেন। শাহ তুর্কান নামে এক দরবেশ শিষ্যদের নিয়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে এসে এই দু'রাজার হাতে নির্যাতিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। এ সংবাদ পেয়ে মাখদূম রুপোশ সহচর সমভিব্যাহারে এসে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। এখান থেকেই অভিযান পরিচালনা করে তিনি মহাকাল রাজ্য জয় করে ফেলেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। স্বয়ং দেও রাজও ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩] এই দরবেশ এখানেই ইন্তিকাল করেন। বর্তমানে তার মাযারটি সাধারণ লোকের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

হযরত বায়িযীদ বিস্তামী

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বিখ্যাত সূফী হযরত বায়িযীদ বিস্তামী (মৃঃ ৮৭৪ খ্রীঃ) বাংলায় আগমন করেছিলেন। চট্টগ্রামের সন্নিকটে নাসিরাবাদে এই বিখ্যাত সাধকের মাযার শরীফ বিদ্যমান। তিনি সম্ভবত ঃ চট্টগ্রাম ও পার্শবর্তী জেলাগুলোতে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ৮ম শতকের শেষ কিংবা ৯ম শতকের প্রথম দিকে ইরানের বিস্তাম নগরে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি বিদেশ ভ্রমনে বের হন এবং এক সময়ে উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে এসে উপস্থিত হন। এ অঞ্চলে তখন আবু আলী কলন্দর ধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণের বিরোধীতা করতেন। তিনি সূফী তরীকার ফানাফীল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বে আরোপ করে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। হযরত বায়িযীদ বিস্তামী তাঁর সাধন পদ্ধতির অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব

১. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. p. 231.
৩. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তা আয়ত্ব করে খিলাফত লাভ করেন। গুরুর নির্দেশে উপমহাদেশের নানা অঞ্চল ভ্রমণ শেষে তিনি চট্টগ্রাম আসেন। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে একটি টিলার উপর আস্তানা স্থাপন করেন। হিংস্র জীব জন্তু ও ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এ স্থানটি খানকার জন্য নির্বাচন করেন। তার সাধনা মাহাত্মের কথা চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্পদিনের মধ্যেই খানকার আশে পাশে জনবসতি গড়ে উঠে। এই খানকায় তাঁর একটি স্মারক মাযার এখনও বিদ্যমান। মাযারের পার্শ্বে এটি মসজিদ আছে। এ মসজিদের পার্শ্বে একটি পুকুর আছে। পুকুরে বংশ পরম্পরায় বহু বছরের পুরণো বিশালাকার কচ্ছপ বাস করে। কচ্ছপ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি জনশ্রুতি রয়েছে। যেমন-হযরত বায়িযীদ যখন জন মানবহীন এ পাহাড়ী এলাকায় আসেন সে সময় এ অঞ্চলে দু'টি দৈত্য বাস করত। তারা বায়িযীদকে নানাভাবে উত্যক্ত করলে তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে একটি বাঁশের চোঙায় ভরে তাদের শাস্তি দেন। অবশেষে তারা নতি স্বীকার করলে বায়িযীদ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে কচ্ছপ বানিয়ে পুকুরের রেখে দেন।

অন্য এক বর্ণনা মতে, এ অঞ্চলে তখন দু'টি জ্বিন বাস করত। বায়িযীদ এখানে আসার ফলে তাদের অবাধ বিচরণে বাধার সৃষ্টি হয়। তারা বায়িযীদকে নানা উপায়ে বিরক্ত করতে থাকে। পরে বায়িযীদের ব্যবহারের মুগ্ধ হয়ে তারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকে। বায়িযীদের অবর্তমানে তাদের কী হবে, এ চিন্তা করে তারা তাঁর কাছে দোয়া চায়। পরে বায়িযীদ দোয়া করেন যে , তারা কচ্ছপ হয়ে নিকবর্তী পুকুরের বসবাস করবে এবং সকলে তাদের লালন করবে। কেউ কোন দিন তাদের ক্ষতি করবেন না।[১]

হযরত বায়িযীদ তাঁর ইসলাম প্রচার মিশন শেষ করে পীরের নির্দেশে স্বদেশ প্রত্যার্বন করেন এবং ৮৪৭/৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিস্তাম নগরে ইন্তিকাল করেন। সেখানে তাঁর মাযার বিদ্যামান।[২]

অনেকেই আবার হযরত বায়িযীদ এবং বগুড়ার শাহ্ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ারকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। ড. এনামুল হক নামের আগে 'শাহ্ সুলতান' থাকায় এরূপ ধারণা পোষন করেছেন। এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, শাহ সুলতান বলখী প্রথমে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে বগুড়া আসেন। তিনি চট্টগ্রামের নাসীরাবাদ গিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উভয় দরবেশের নামের আগে শাহ্ ব্যবহার করা হয় ঠিকই। শাহ্ বা শাহা উপাধি সূফী-দরবেশগণের নামের সঙ্গে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া দু'জনের মাযারও দু'দেশের অবস্থিত। সুতরাং উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি। এক ও অভিন্ন নয়।

১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

২. A.J.Arberry, Muslim Saints and Mystics, London, p.100.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের বাংলা বিজয় ও মুসলিম শাসনের সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের বাংলা বিজয় ও মুসলিম শাসনের সূচনা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরবীয় মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কোন কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে আবার অনেকে মনে করেন যে, বখতিয়ারের বিজয়ের পূর্ব হতে বাংলাদেশের সাথে কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্কই ছিল না, বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে মুসলিম বসতিও ছিল। এমনকি অনেকে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্যের কথাও চিন্তা করেন।[১] মিনহাজের মতে, হিন্দু আমলে বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন-"মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী যখন আঠারজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়ায় পৌঁছেন (তাঁর প্রধান সৈন্যবাহিনী পেছনে পড়েছিল) তখন স্থানীয় লোকজন তাঁর দলকে ঘোড়া ব্যবসায়ী বলে মনে করেছিল। তাঁরা যে এদের শহর দখল করার অভিপ্রায়ে এসেছে এ সন্দেহ তাদের মনে উদ্রেক হয়নি।"[২] এতে ধারণা করা হয় যে, মুসলিম ব্যবসায়ীগণ মুসলিম পূর্বযুগের বাংলায় আগমন করত। আর তৎকালে এদেশের সাধারণ মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার ছিল।[৩] এ সময় জনশ্রুতি অনুসারে আরব ও ইরানীয় কিছু সংখ্যক আলিম, সূফী ও মুজাহিদ দরবেশ বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং হিন্দু রাজাদের আমলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাদের মধ্যে ঢাকা জেলার রামপালের বাবা আদম শহীদ, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরের শাহ সুলতান রুমী, বগুড়ার মহাস্থানের শাহ সুলতান মাহিসওয়ার এবং পাবনা জেলার শাহজাদপুরের মাখদূম শাহদৌলা শহীদের নাম উল্লেখযোগ্য।[৪] বাংলার প্রথম যুগের এসব সাধু-দরবেশদের আগমনেরকাল সম্বন্ধে স্থানীয় জনশ্রুতিগুলোর বিশ্বস্ততা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে এসমস্ত ঘটনাবলী আমাদের মনে এ ধারণা জন্মায় যে, মুসলিম বিজয়ের পূর্বে কিছু সংখ্যক সূফী-দরবেশ বাংলায় আগমন করে থাকবেন। মিনহাজের মতে-" মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে অনেকগুলি খানকাহ্ নির্মাণ করেন।"[৫] এতে অনুমিত হয় যে, বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই কতিপয় সূফী-দরবেশ এদেশে তাদের ধর্মীয় প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং এজন্য খানকাহ্ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

যাহোক দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি বড় বড় শহর-বন্দরে এবং গ্রামের অভ্যন্তরে একটি নিরব বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলছিল।[৬] বাংলায় তথা গোটা ভারতে যখন অন্তর্বিপ্লব চলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরি দিল্লী অধিকার করে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। দিল্লীর পরবর্তী শাসক কুতুবউদ্দীন আইবেকের সময় মুসলিম শাসন বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুসলিম শাসনের সুফল বার্তা বাংলার অভ্যন্তরেও পৌঁছে। বাংলার অভ্যন্তরীণ

১. ড. এনামুল হক ও ডঃ আব্দুল করিম, আরাকান রাজ সভায় বাঙলা সাহিত্য, পৃ. ৪
২. মিনহাজ -ই- সিরাজ, অবকাত -ই-নাসিরী, পৃ. ৬৩-৬৪
৩. পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য
৪. পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য
৫. মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, গৌড়ে মুসলিম শাসন নূর কুতুব উল আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ ইং, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা তখন খুবই নাযুক ছিল ফলে এদেশে অন্তর্বিপ্লবের গতি আরও বেড়ে যায় এবং বিপ্লবের মুখে রাজশক্তি ভীত, হতাশাগ্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ সময় কিছু দিনের জন্য বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন প্রধান রাজধানী শহর লক্ষণাবতী ত্যাগ করে অবকাশ যাপনকালীন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী অতর্কীতে নদীয়ায় উপস্থিত হন এবং বিনা যুদ্ধে, বিনা বাধায় নদীয়ার রাজ প্রাসাদ দখল করেন। রাজা গত্যন্দর না দেখে পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুরে পলায়ন করেন।

বখতিয়ার খিলজী ছিলেন জাতিতে তুর্কী এবং পেশায় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তিনি আফগানিস্তানের গরসমির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গোর অধিবাসী ছিলেন। তার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। মনে হয় দারিদ্রের নিস্পেষণে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় কর্ম শক্তির উপর নির্ভর করে তার অগণিত দেশবাসীর ন্যায় ভাগ্যান্বেষণে বের হন। গজনীতে সুলতান ঘোরীর সৈন্য বিভাগে চাকুরীর প্রার্থী হয়ে তিনি ব্যর্থ হন। খাট, লম্বাহাত এবং কুৎসিত চেহারার বখতিয়ার হয়ত সোনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সমর্থ হননি। গজনীতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দিল্লীর শাসক কুতুবউদ্দীন আইবেকের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানেও তিনি সেনাধ্যক্ষের সহানভুতি লাভে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি বদাউনে যান এবং বদাউনের শাসক মানিক হিযবর উদ্দীন তাকে নগদ বেতনে চাকুরিতে ভর্তি করেন। কিন্তু এ ধরণের চাকুরীতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিছুদিন চাকুরী করার পর তিনি অযোধ্যায় গমন করেন। অযোধ্যায় শাসনকর্তা মালিক হুসাম উদ্দীন বখতিয়ার খিলজীর প্রতিভা অনুধাবন করেন এবং তাকে ভিউলী ও ভাগত নামে দুইটি পরগণার জায়গীর প্রদান করেন এবং মুসলমান রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে সীমান্তরক্ষীর কাজে নিযুক্ত করেন। ভিউলী ও ভাগত আধুনিক উওর প্রাদেশের মীর্জাপুর জেলায় অবস্থিত।[১] এখানে এসে বখতিয়ার খিলজী তার ভবিষৎত উন্নতির উৎসের সন্ধান পান।

বখতিয়ার খিলজীর জায়গীর সীমান্তে অবস্থিত থাকায় তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বীয় রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি কিছু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে এক একটি হিন্দু রাজ্যে আক্রমণ ও লুন্ঠন করতে থাকেন। এই সময়ে ঠিক রাজ্য বিস্তার করা তার উদ্দেশ্য ছিলনা, রবং ধন-সম্পদ হস্তগত করে এবং বিরাট সৈন্য বাহিনী গঠন করে বড় একটি কিছু করাই তার পরিকল্পনা ছিল।[২] এসময় তার বীরত্বের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান তার সৈন্য দলে যোগদান করেন। ফলে তার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে একদিন তিনি এক প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গের মত স্থানে আসেন এবং আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষ কোন বাধাই দিলনা। দুর্গ জয়ের পর তিনি দেখলেন যে, দুর্গের অধিবাসীরা সকলেই মুন্ডিত মস্তক এবং দূর্গটি বই-পুস্তকে ভরা। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি এক বৌদ্ধ বিহার জয় করেছেন।[৩] এটা ছিল ওদন্তপুর বিহার বা ওদন্তপুরী বিহার। এ সময় হতেই মুসলমানগণ ঐ স্থানের নাম দিলেন বিহার এবং আজ পর্যন্ত শহরটি বিহার বা বিহার শরীফ নামে পরিচিত।

---

১. আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস(সুলতানী আমল), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩. মিনহাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১.

* আব্দুর করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

* ড. এ.এম. চৌধুরী. 'বাংলাদেশে মুসলমান আগমন ও বখতিয়ার খিলজী' বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান,ঢাকা-১৯৯৫ইং, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বিহার বিজয়ের পর বখতিয়ার খিলজী অনেক ধন-রত্নসহ কুতুব উদ্দীন আইবেকের সাথে সাক্ষাত করেন এবং কুতুব উদ্দীন তাঁকে সম্মানের সাথে পুরস্কৃত করেন। এখানে তিনি আরও সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পরের বৎসর নদীয়া আক্রমণ করেন। এ সময় বাংলাদেশের রাজা লক্ষণসেন রাজধানী নদীয়াতে অবস্থান করছিলেন। মিনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বখতিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পর সেন সাম্রাজ্যে গভীর ভীতি বিদ্যমান ছিল।[১]

এমনকি দৈবজ্ঞ, পন্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজা লক্ষণসেনকে এই বলে রাজধানী ত্যাগ করতে অনুরোধ করছিল যে, তাদের শাস্ত্রে তুরস্ক সেনা কর্তৃক বঙ্গ জয়ের স্পষ্ট ইংগিত আছে এবং বিজয়ীর যে বর্ণনা শাস্ত্রে আছে, তার সাথে বখতিয়ারের দেহের বর্ণনা হুবহু মিলে যায়।[২] রাজা লক্ষণসেন তবুও নদীয়া ত্যাগ করেননি।

নদীয়া অভিযানকালে বখতিয়ার ঝাঁড়খন্ড অরণ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এত ক্ষিপ্রগতিতে আসেন যে, তাঁর সঙ্গে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং তাঁর মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল। তিনি সরাসরি রাজা লক্ষণ সেনের প্রাসাদ দ্বারে এসে উপস্থিত হন এবং প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করেন। শহরের অভ্যন্তরের শোরগোল পড়ে যায়। রাজা লক্ষণসেন সে সময়ে মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান এবং নৌপথে বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন।[৩] বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়ের তারিখ নির্ধারণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মতানুসারে বর্তমানে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দই নদীয়া জয়ের তারিখ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[৪]

প্রায় বিনা যুদ্ধেই নদীয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বাহিনীও রখতিয়ারের সাথে মিলিত হয়; তিনদিন ব্যাপী নদীয়া লুঠ করেন এবং নদীয়ার ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেন। অতঃপর তিনি নদীয়া ত্যাগ করেন এবং লক্ষণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। লক্ষণাবতী বা গৌড়ই মুসলিম আমলে এবং মুসলিম লেখকদের লেখায় লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। রাজা লক্ষণসেন হয়তো বিক্রমপুরে পালিয়ে যাওয়ার পরে তাঁর সৈন্যবাহিনী আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করেনি বা যুদ্ধ করার সাহস পায়নি। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, বখতিয়ার খিলজী বিনা যুদ্ধেই লখনৌতি জয় করেন।

---

১. মিনহাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
২. মিনহাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৩. মিনহাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪
৪. দ্রষ্টব্যঃ A.M. Chowdory, Dynastic History of Bengal, p. 252-58.

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর বখতিয়ার খিলজী তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর অধিকৃত এলাকাকে কয়েকভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগেই এক একজন সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এ সময়ে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক বিভাগকে 'ইকতা' এবং ইকতার শাসনকর্তাকে 'মুকতার' বলা হত।১ বখতিয়ারের সেনাপতিদের মধ্যে মাত্র তিনজনের নাম পওয়া যায়; এদের মধ্যে আলী মর্দান খিলজী 'বারসৌল' এর এবং হুসাম উদ্দীন ইউজ খিলজী গঙ্গাতরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 'বারসৌলকে বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত খোড়াঘাট এলাকায় নির্দেশ করা হয়। এ স্থানটি বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর এ তিনটি জেলার মিলনস্থল। সম্ভবত তাভার গঙ্গকোয়ারকে 'গঙ্গতীর' বলা হয়। মুহাম্মদ শীরান খিলজীর ' ইকতার' নাম পাওয়া যায় না। তাঁর শাসনভার ছিল খুব সম্ভব লখনৌতির দক্ষিণে পদ্মার তীরে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, লখনৌতি রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বখতিয়ারের পূর্ব অধিকৃত বিহার বিহার পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল।২ "শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও বখতিয়ার খিলজী লখনৌতিতে মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ্ তৈয়ার করেন। যেই সকল মুসলমান অভিযান পরিচালনার সময়ে বা পরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য লখনৌতি আগমন করে তাহাদের সুবিধার জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করেন। মুসলমানদের নামায আদায়ের জন্য মসজিদ, ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য মাদ্রাসা এবং সূফীদের ধর্ম প্রচারের জন্য 'খানকাহ্' তৈয়ার করা হয়। একজন সৈনিক হইয়াও বখতিয়ার খিলজী বুঝিতে পারেন যে, মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতিত লখনৌতির মুসলমান রাজ্য শুধু সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না। সামরিক শক্তির প্রয়োজন একদিন শেষ হইবেই; কিন্তু অতঃপর, অর্থাৎ শান্তির সময়ে মুসলমান সমাজ রাজ্যের স্থায়ীত্ব বিধান করিবে।" ৩

বখতিয়ার খিলজীর জীবনের শেষ কাজ ছিল তিব্বত অভিযান। তিনি খুবই সতর্কতার সাথে তিব্বত অভিযানের পরিকল্পনা করেন। যদিও বাংলার বিশাল ভূ-খন্ড তাঁর অধিকারের বাইরে ছিল। সমগ্র বাংলা জয় না করে তিনি কেন দূর্গম পার্বত্য অঞ্চল তিব্বত অভিযান করতে গেলেন তা বলা কঠিন। যে কারণই এর পিছনে থাকুক না কেন, তাঁর তিব্বত অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনেক সৈন্য-সামন্ত হারিয়ে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে স্বীয় রাজ্যে ফিরে দেবকোটে অবস্থান করতে থাকেন এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়েন।

---

১. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

* ডঃ এ,এম, চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬.

৩. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

জনসম্মুখে মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ করেন। কথিত আছে যে, দেবকোটের বিধবা মহিলাগণ এবং অনাথ বালক-বালিকাগণ তাঁকে অভিশাপ দিত। এমনি অবস্থায় ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে রোগ শয্যায় তিনি ইন্তিকাল করেন। কারও মতে, আলী মর্দান তাকে হত্যা করেন।[১] ঘটনাক্রমে ঐ একই বৎসরে ভারত উপমহাদেশ বিজয়ী সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী ঝিলাম নদীর তীরে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন এবং বিক্রমপুরে রাজা লক্ষণসেন মৃত্যু বরণ করেন।[২]

বঙ্গ বিজয়ের ফলে হিন্দু বৌদ্ধ অধ্যুষিত বঙ্গ ভূমিতে সর্ব প্রথম মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের মুসলিম বিজয় ইসলাম সম্প্রসারণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। অবশ্য মুসলমান সৈন্যগণ ধর্ম প্রচার করেননি। বস্তুত মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই অনেক সূফী-দরবেশ এদেশে আগমন করেন। তবে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতি হিসেব ইসলাম সুদূর প্রসারী হয়। "বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান বহিরাগতদের জন্য বাংলার আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ এ দেশে শাসনকর্তা, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষণকারীরূপে আগমন করেন। এই আরব বহিরাগতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সূফী ও ধর্ম প্রচারকারী ও বণিক সম্প্রদায়। নতুন অধিকৃত প্রদেশে ধর্ম প্রচারকারী ও ইসলাম শিক্ষাদাতা কয়েকশত সাধু পুরুষদের প্রত্যেকেই ১২০ জন্য শিষ্য ও অনুচরসহ এদেশে আগমন করেন। শেখ শাহ্ জালাল ৩৬০ জন শিস্যসহ আগমন করেন এবং তারা সকলেই বাংলাই বসতি স্থাপন করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আবরদের বেশ বড় একটা দল বাংলায় আগমন করেন সূফী ও ধর্ম প্রচারক রূপে।"[৩]

আসকার ইবনে শাইখ বলেছেন-"মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার এমন এক সময়ে লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে যান, যখন পরাক্রান্ত আব্বাসীয় খেলাফত মোঙ্গলদের আক্রমনে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়ার এই চরম দূর্দিনে সেখানকার গণ্যমান্য বিদ্বান সূফীদের অনেকেই ভারতের সুদূর এই পূর্ব প্রান্তের রাজ্যটিতে এসে আশ্রয় নেন। এমন কি শক্তিদ্বন্দ্বে দিল্লী সালাতানাত যখন দূর্বল হয়ে পড়ে তখন উত্তর ভারতের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার লাখনৌতি রাজ্যে এসে বসতি স্থাপন করেন। এ দেশে বহিরাগতদের স্থায়ী বসবাসের ফলে এখানকার অধিবাসীদের সামাজিক কাঠামোয় ও মানসিক মূল্যবোধে সাধিত হতে আরম্ভ করে এক গুণগত পরিবর্তন । এতদিনকার বাংলাদেশ মুসলিম বাংলার রূপনিতে আরম্ভ করে।"[৪]

---

১. মিনহাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮.
২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৩. ড. এম.এ.রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৪. আসকার ইবনে শাইখ, মুসলিম শাসন আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ইং, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ড. কালিকারঞ্জন কানুনগোর উক্তি দিয়েই আমাদের বক্তব্যের শেষটানা যায় এভাবে-Malik Ikhtyar-ud-din Muhammad Bakhtyar was indeed the maker of the medieval history of Bengal. He made his mark in an age when from the makhas to the Masnad (from the Slavemarket to the carpet of royalty) was a more common phenomenon in the East than one 'From log cabin to white house' in the new world of the nineteenth century. But Muhammad Bakhtyar unlike other Indo-Muslim worthies was born a freeman and lived and died a freeman, elevating himself by his own unaided efforts form the position of a poor anventurer to that a sultan in all but the name. His life was to short and storymy to give hism time and oppurtanity to consolidate his conquests and prove his capacity as an administrator---- Mosques, Madrasas (schools of Muslim learning) and Khangahs (Monasteries) arose in the new abode of Islam through Muhammad Bakhtyar's beneficence and his example was warthily emitated by his Amirs, these have all perished----. But his fame endures and will endure So long as Islam Survives in the land. His chief monument of glory was the Muslim principality of Lakhnawati with tra ..ons of independent origin, which not only survived his death but went on expanding into the glorious sultanate of Gour."[১]

১. Dr. Kalika Ranjan Qanungo, Histrory of Bengal, vol.-II. pp. 12 and 14.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের স্বরূপ ও শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের স্বরূপ ও শিক্ষা

" Islam is not a mere creed . It is a life to be lived in the present a religion of rightdoing, rightthinking and right speaking, founded on divine love, universal charity and the equality of man in the sight of the lord."[১]

"Islam is indeed, much more than a system of theology . It is a complete civilization.----- no religion containded greater promise of development, no faith was purer or more in conformity with the progressive demands of humanity than Islam."[২].

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্ম সমূহের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সে সব ধর্মের নামকরণ হয়েছে প্রবর্তকদের নামানুসারে। যেমন-হযরত ঈসা (আঃ) এর ধর্মের নাম খ্রীষ্ট ধর্ম, গৃহীত হয়েছে তাঁর খ্রীষ্ট উপাধি থেকে। ইয়াহুদী ও বৌদ্ধ ধর্মের নামকরণ হয়েছে যথাক্রমে ইয়াহুদা ও গৌতম বুদ্ধের নামানুসারে । শুধু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ধর্মের একটি ভিন্ন পরিচয় রয়েছে, তার নাম ইসলাম। ইসলাম শব্দটি 'সলম' ধাতু হতে উৎপন্ন। 'সলম' ধাতুর মুল অর্থ হচেছ শান্ত হওয়া, বিশ্রাম থাকা, কর্তব্য নিস্পন্ন করা, দিয়ে দেয়া, পূর্ণ শান্তিতে থাকা। [৩] এর বুৎপত্তি গত অর্থ শান্তি, আপোষ, বিরোধ পরিহার। স্বর চিহ্নের তারতম্যে বিভিন্ন আকারে একই অর্থে কুরআনে এই ধাতু হতে নিস্পন্ন কয়েকটি পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন -

(১) যুদ্ধ বিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব;[৪]

(২) ইসলামি বিধান;[৫]

(৩) যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব;[৬]

(৪) শান্তি [৭] অথবা শান্তি কামনামূলক মুসলিম অভিবাদন;[৮]

সূতরাং ইসলাম অর্থ (১) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। [৯] (২) শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা, অর্থাৎ আত্মসার্পনে আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তার বিরুদ্ধতা পরিতক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সাথে একাত্মতার অনুভূতিতে, সাম্যনীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।[১০]

ইসলাম একটি 'দীন'[১১] এবং দীন অর্থ পারম্পারিক ব্যবহার, লেন-দেন ইত্যাদি। এই দীনের প্রধান

---

১. Sayed Amir Ali . The Spirit of Islam, Delhi. 1947. p. 178.

২. উদ্ধৃত ঃ ডঃ রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, ঢাকা- ১৯৮১.পৃ. ১০

৩. Sayed Amir Ali. op. cit .p.168.

৪. আল-কুরআন , সূরা- ৮, আয়াত- ৬১

৫. আল-কুরআন, সূরা -২, আয়াত -২০৮

৬. আল-কুরআন, সূরা- ৪, আয়াত-৯০-৯১

৭. আল-কুরআন -সুরা. ১০ আয়াত ২৫

৮. আল-কুরআন -সুরা-৫১, আয়াত -২৫

৯. আল-কুরআন -সুরা-২, আয়াত -১১২

১০. বুখারী শরীফ (২য় খন্ড)- ৩য় বাব

১১. আল-কুরআন, সুরা -৩ আয়াত ১৮

Dhaka University Institutional Repository

উৎস কুরআন । কুরআনে বিধৃত দীন ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি মানবের কর্ম জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে।

ইসলাম মানবের চিরন্তন ধর্ম।[১] এর মূল কথাঃ (ক) আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস, (খ) মৃত্যুর পর পুণরুত্থান ও বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস এবং (গ) সৎকর্মে (আমালে সালেহ) আত্মনিয়োগ। [বিশ্বাসের পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সাথে যোগসূত্ররূপে (১) ফিরিস্তাগণ, (২) আসমানী কিতাবসমুহ, (৩) সকল নবী -রাসূল, (৪) আল্লাহ সর্বময় নিয়ন্ত্রণ (তাকদীর)-এ বিশ্বাস ও উপরিউক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সাথে যুক্ত হয়]। আদি পিতা ও নবী হযরত আদম (আঃ) হতে শেষ্ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত কুরআনে উল্লেখিত বা অনুল্লিখিত সকল নবী রাসূলগণ [২] পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে [৩] উপরিউক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এই তিনের ভিত্তিতে কুরআন সমসাময়িক ইহুদী, খৃষ্টান, সাবিঈ ও মাজুসী তথা অপর সকল ধর্মাবলম্বীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিল[৪] এবং এই আহবানে সাড়া দিলে নিরাপত্তা ও মুক্তির নিশ্চয়তা দান করেছিল। এখনও সে আহবান কার্যকর ।

ইসলাম একটি দীন

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলাম একটি দীন এবং দীন শব্দের অর্থ পারস্পারিক ব্যবহার, লেন-দেন ইত্যাদি। কুরআনে বিধৃত দীন ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, যা বিশ্বাস,আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, দার্শনিকতত্ত্ব ইত্যাদি। মানবের কর্ম জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। উপরে ইসলাম শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে-তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর ব্যাপকার্থক হওয়ার আরও একটি প্রমাণ এই যে, ইসলামকে দীন নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ দীন সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যাবস্থা হিসেবে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে।দীন শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ আনুগত্য ও ইখলাস হলেও এর মর্মার্থ হচ্ছে মিল্লাত ও শরীআত।[৫] আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন-"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।"[৬] এভাবে কুরআনে আল্লাহ ইসলামকে সত্যের দীন,[৭] আল্লাহর দীন,[৮] এবং মযবূত দীন,[৯] বলে আখ্যায়িত করেছেন ।

দশম হিজরীতে যে আয়াতে আল্লাহ দীনের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হবার সুসাংবাদ শোনান, সেখানে ইসলামকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে দীন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ বলেছেন-"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।"[১০] ইমাম আবু হানিফার মতে, দীন শব্দটি ঈমান, ইসলাম এবং শরীআতের যাবতীয় বিধি-বিধান এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [১১]

১.আল-কুরআন, সুরা-৩ আয়াত ১৮
২. আল-কুরআন, সুরা০ ৪০ আয়াত ৭৮
৩.আল-কুরআন, সুরা-১০, আয়াত ৪৭
৪. আলকুরআন, সুরা-২, আয়াত ৬২
৫. ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড) ,পৃ. ২৯৯
৬. আল-কুরআন, সুরা-৩, আয়াত ১৯
৭. আল-কুরআন, সূরা -৯, আয়াত-৩৩
৮. আল-কুরআন, সূরা -১১০, আয়াত-২
৯. আল-কুরআন, সূরা -৩০, আয়াত-৩০
১০. আল-কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৩
১১. ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড), পৃ.-২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যায় যে, ইসলাম আকীদা, মৌখিক স্বীকৃতি ইসলাম 'আমল' আবার পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানও। আর উহাদের সবগুলোর সমষ্টির নাম হচ্ছে দীন। এই দীনে রয়েছে- (১) আকীদা (২) ইবাদাত এবং (৩) পারস্পারিক সম্পর্ক (ব্যক্তিগত,পারিবারিক,সামাজিক,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, আইন বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক)।

ইসলামী আকীদা ও ইবাদাতসমূহের প্রাণ

ইসলামী ব্যবস্থা যে সব প্রধান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে, (১) আল্লাহর একত্ব, বিমূর্ততা, ক্ষমতা, ক্ষমাশীলতা ও পরম প্রেমের প্রতি বিশ্বাস;(২) দান ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব; (৩) রিপু দমন; (৪) যিনি সব কল্যাণ ও নিয়ামত দান করেছেন, তাঁর প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং (৫) পরলোকে মানুষের কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহির ধারণা।[১] আর ইসলামী আকীদা ও ইবাদাতসমূহ একদিকে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যম ও উপায়, অন্যদিকে উহা উক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করবার উদ্দেশ্যে জীবনের কার্যাবলীকে সুমহান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠত করবার মহান লক্ষ্যের ধারকও বটে। এরূপ কার্যাবলী ব্যক্তিগত ও সমাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়ন করে। মোট কথা, ইসলামের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, আত্মার পবিত্রতা অর্জন, আত্মার শান্তি লাভ, অন্তরের পরিতৃপ্তি সাধন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান।

ইসলাম ও তাওহীদ

ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে তাওহীদই বুনিয়াদী আকীদা তাওহীদের অর্থ ও তাৎপর্য হল আল্লাহ এক, তিনি পবিত্র ও সর্বদোষমুক্ত ; তিনিই সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও পালন কর্তা; জীবন দান ও জীবন হরণ তাঁরই অধিকারে রয়েছে; তিনিই সকলের প্রয়োজন পুরণকারী, তিনিই ইবাদত পাবার যোগ্য এবং সাহায্য কেবল তারই নিকট চাইতে হবে। তার কোন শরীক নেই। তাওহীদ সুক্ষ ও স্থুল সর্ব প্রকারের শিরকের সম্পূর্ণ বিরোধী । উহা সর্ব প্রকার শিরককে বাতিল ঘোষণা করে। তাওহীদে বিশ্বাস মানুষের অন্তরে সৃষ্টির দাসত্ব না করার এবং শির উচ্চ করে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার সাহস সৃষ্টি করে। তাওহীদের কল্যাণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বিশৃংখলা হতে মুক্ত হয়ে শৃংখলা ও সংযমের গুণে বিভূষিত হয়। তাওহীদে বিশ্বাস বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণাকে মযবূত করে। তাওহীদে বিশ্বাসের কল্যাণে মানবাত্মা জীবনের সম্ভাবনাসমূহ সমন্ধে তাওয়াক্কুল ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করে। আল-কুরআনের মূল সুর হল আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালা তাওহীদের প্রচারকে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক নবীই তার জাতিকে সর্বপ্রথম তাওহীদের বাণী শুনিয়েছেন। রাসূল (সঃ) তাঁর মক্কা জীবনের তেরটি বছরে বিশেষত তাওহীদের প্রচার করেছেন। আল-কুরআন আল্লাহর সাথে তাঁর কোন সৃষ্টিকে ইবাদাতে শরীক করাকে শিরক বলেছে এবং শিরককে জঘন্য পাপাচাররূপে নির্দেশ করেছে।[২] অনুরূপভাবে উহা মুশরিক ব্যক্তির যাবতীয় নেক আমল গ্রহণ যোগ্য নয় [৩] এবং তার জন্য জান্নাত হারাম এ ঘোষণা দিয়েছে। [৪]

---

১. সৈয়দ আমির আলী (অনূ. মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান) দি স্পিরিট অব ইসলাম, ই.ফা.বা-১৯৯৩ইং, পৃ-১৭৬

২. আল-কুরআন, সুরা-৩১, আয়াত-১৩

৩. আল-কুরআন, সুরা-৬, আয়াত-৬৮

৪. আল -কুরআন, সুরা-৫, আয়াত-৭২

Dhaka University Institutional Repository

তাওহীদের আকীদা ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার অন্য সকল গুণ ও সেইগুলি তাঁর 'আসমাউল হুসনা' (সুন্দরত গুণবাচক) নামে বর্ণিত হয়েছে মানুষের অন্তরে শান্তি ও হিদায়াত আনয়ন করে। এ সকল গুণবাচক নামের মধ্যে রাব্ব (প্রতিপালক), হায়াত(প্রাণ), ইলম(জ্ঞান), কুদরত(শক্তি), ইরাদা (ইচ্ছা), সাম (শ্রবণ), বাসার(দর্শন), বাচন (কালাম)- বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ও প্রেম আল্লাহর একটি বিশিষ্ট গুণ। কুরআনে তাই আল্লাহকে বলা হয়েছে প্রেমময় (আল ওয়াদুদ) বলে। এসব গুণ অনাদি, অনন্তকাল ধরে আল্লাহর অন্তঃসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তিনি আদি স্রষ্টা, বিশ্বজগতের চালক ও নিয়ন্তা। তিনি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মধ্যে কাজ করেন। তিনি একাধারে জগতের অন্তর্গত ও বিশ্বাতিগ অর্থাৎ তিনি জগতে যেমন উপস্থিত তেমনি উপস্থিত জগতের বাইরেও।

আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রেম সম্পর্কে যে উচ্চ ও মহান ধারণা কুরআনে ব্যক্ত করা হয়েছে, তার তুলনা অন্য কোন ভাষায় নেই। অত্যন্ত কাব্যময় ও চিত্ত আলোড়নকারী অনুচ্ছেদগুলির বিরাম-বিচ্ছেদহীন মূলসুর হচ্ছে আল্লাহর একত্ব, তার বিমূর্ততা, মহিমা ও ক্ষমাশীলতা। জীবন, জ্যোতি আর আধ্যাত্মিকতার প্রবাহে যার শেষ নেই। কিন্তু আগা-গোড়া কোথাও অন্ধবিশ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই। আবেদন রাখা হয় শুধু মানুষের অন্তরের বিবেকের কাছে, তার সহজাত যুক্তির কাছে।১

"বল! তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ, কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি জন্মদান বা জন্মগ্রহণ করেন না, আর কিছুই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।" ২

"তিনিই আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যাতে করে জাহাজসমূহ তাঁর আদেশের মধ্য দিয়ে চলতে পারে; যাতে করে তোমরা তার কৃপা ভিক্ষা করতে পার এবং তোমরা হতে পার কৃতজ্ঞতা ভাজন। আর তিনি তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সমগ্র বস্তুকে। দেখ, এর মধ্যে রয়েছে যথার্থ নিদর্শনাবলী তাদের জন্য যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।"৩

"এক ইলাহ; তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই; তিনিই পরম দয়ালু ও দাতা। আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে আর দিবা রাত্রি পরিবর্তনে, আর সাগরের বুকে চলমান মানুষের জন্য কল্যাণকর পণ্যবাহী জাহাজের মধ্যে; আর আসমান থেকে আল্লাহর প্রেরিত বৃষ্টির পানিতে যা মৃত মৃত্তিকা আর মৃত্তিকার বুকে বিচরণকারী সব রকম জীব জন্তুকে আবার সঞ্জীবিত করে তোলে; আর আসমান ও যমীনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী বায়ু ও মেঘের সঞ্চালনে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। তবুও কতক মানুষ আল্লাহর সমকক্ষ বলে অপরকে গ্রহণ করে আর আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে।"৪

"আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই-চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনের সবকিছু তো তাঁরই জন্য। এমন কে আছে তার কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? তিনি জানেন যা আগে ঘটে গিয়েছে আর যা ঘটবে পরে; কিন্তু তিনি না চাইলে

---

১. সৈয়দ আমির আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
২. আল-কুরআন, সূরা -১১২, আয়াত ১-৫
৩. আল-কুরআন, সূরা -৪৫, আয়াত-১২-১৩
৪. আল-কুরআন, সূরা -২, আয়াত-১৬৩-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর জ্ঞানের কণামাত্র ও তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁর কুরসী বিস্তৃত আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে আর এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তিনি আনায়াসেই করে থাকেন" ।১

"তিনিই তো দিবসের উপর রাত্রির পর্দা পরিয়ে দেন আর দ্রুত এই অনুক্রম চলতে থাকে। আর সুর্য, চন্দ্র ও তারকা তাঁরই আদেশের বশবর্তী। জেনে রেখো, গোটা সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব তাঁরই। সারা বিশ্বের পালন কর্তা আল্লাহর বড়ই বরকতময়।" ২

" তিনিই তো তোমাদেরকে দেখান বিজলী-তোমাদের ভীতি ও আশা সঞ্চারের জন্য আর তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। বজ্রনির্ঘোষ ও ফেরেস্তাগণ উভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনিই বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তা দ্বারা আঘাত করেন। তবুও ওরা আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে।"৩

" তিনিই সঠিকভাবে আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন; ওরা যা কিছু তাঁর সংগে অংশীদার করে তিনি তা থেকে কত মহান! তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ক্ষুদ্র শুক্র কণা থেকে, আর দেখা! সে একজন প্রকাশ্য বিতন্ড সৃষ্টিকারী। আর তোমাদের জন্য তিনি গবাদি পশুও সৃষ্টি করেছেন,----- পশুগুলিকে যখন সন্ধায় ফিরিয়ে আন আর প্রভাতে চরাতে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর। -- তিনি রাত্রি আর দিন, সূর্য আর চন্দ্র তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আর তারকারাজীও তারই বিধানে ক্রিয়াশীল আছে।"৪

"যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত সমূহ গুনতে চাও, তবে তা হিসেব করে শেষ করতে পারবে না; আল্লাহ্‌ বাস্তবিক ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তোমরা যা গোপন কর, তার সবই আল্লাহ্‌ জানেন। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং এগুলোকে তো সৃষ্টি করা হয়, মৃত ও প্রাণহীন।" ৫

"আল্লাহ্‌ সব জিনিসের স্রষ্টা, সবকিছুর অভিভাবক। তিনিই আসমান ও যমীনের চাবির মালিক।"৬

"তোমার কণ্ঠস্বর উচু করার প্রয়োজন নেই, কারণ গোপন ফিসফিস আর তারচেয়েও বেশী গুপ্ত কথা তিনি জানেন। বল, আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিকানা কার ? বল, আল্লাহ্‌র; করুণা তিনি নিজের দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।"৭

"আল্লাহ্‌তো শস্যকণা আর আঁটি ভেদ করে অঙ্কুরের পথ নির্গম করেন। তিনি জড় থেকে জীবন আবার জীবন থেকে জড়কে নির্গত করেন। ইনিইতো তোমাদের আল্লাহ্‌। তারপরেও তোমরা পথহারা হয়ে কোথায় যাচ্ছ? অন্ধকার ভেদ করে ভোরের আলো ফুঁটিয়ে তোলেন তিনিই; তিনি রাত্রিকে বিশ্রামের জন্য

১. আল-কুরআন, সূরা- ২, আয়াত-২২৫
২. আল-কুরআন, সূরা- আরাফ, আয়াত-৫৪
৩. আল-কুরআন, সূরা- আররাদ, আয়াত-১২-১৩
৪. আল-কুরআন, সূরা- ৪৫, আয়াত-৩-১১
৫. আল-কুরআন, সূরা -৪৫, আয়াত ২১
৬. আল-কুরআন, সূরা-৩৯, আয়াত ৬৩-৬৪
৭. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১২

Dhaka University Institutional Repository

আর সূর্য ও চন্দ্রকে সময়ের হিসাবের জন্য স্থাপন করেছেন; এ হচ্ছে মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানবান আল্লাহ্‌র অলঙ্ঘ নিয়তি।"[১]

"ইনিতো তো হচ্ছেন আল্লাহ্, তোমাদের রব! তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই; তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, তারই ইবাদাত কর, কারণ, তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাধবায়ক।"[২]

"দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পায়না কিন্তু তিনি সব দৃষ্টিকেই দেখতে পান, এবং তিনি সুক্ষদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"[৩]

"বল, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবাণী, আমার জীবন ও আমার মরণ-আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই; আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলিমদের মধ্যে আমিই প্রথম।"[৪]

"তুমি কি দেখনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা, এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকূল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আল্লাহ্‌র অধীনেই আকাশও পৃথিবীর রাজত্ব, আর আল্লাহ্‌র সমীপেই ফিরে যেতে হবে।"[৫]

"সমস্ত প্রশসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক পরম দয়াশীল ও করুণাময়, শেষ দিনের মালিক, আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি, কেবল তোমারই সাহায্য চাই। তুমি আমাদের সরল-সহজ পথে চালাও তাঁদের পথ যাঁদের তুমি অনুগ্রহ করেছ, যারা পথ ভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত তাদের পথে নয়।"[৬]

"তারাই পূণ্যবান, যারা আল্লাহ্ প্রেমে নিজেদের রিযিক থেকে মিসজীন, ইয়াতীম আর বন্দীদেরকে আহার করায়, আর বলে আমরা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে খাওয়াই, তোমাদের থেকে পুরস্কার বা শুকরিয়া আশা করিনা।"[৭]

" মানুষে মানুষে বিচার করবে সত্যের মাপকাঠি দিয়ে; আর রিপুর অনুরসণ করোনা, কারণ রিপু তোমাকে আল্লাহ্‌র পথে বিভ্রান্ত করতে পারে।"[৮]

" অবশ্যই আমার রব হারাম করেছেন গোপন ও প্রকাশ্যে সব রকম অশ্লীল কাজ, পাপকর্ম, আর অসংযত বিরোধিতা।"[৯]

---

১. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ৯৫-৯৬
২. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১০২
৩. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১০৩
৪. আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত-১৬২-৬৩
৫. আল-কুরআন, সূরা আন নূর, আয়াত-৪১-৪২
৬. আল-কুরআন, সূরা আল ফাতিহা , আয়াত-১-৭
৭. আল-কুরআন, সূরা আদ্‌দাহর, আয়াত-৮-১০
৮. আল-কুরআন, সূরা আস্‌সাদ , আয়াত-২৬
৯. আল-কুরআন, সূরা আল আরাফ, আয়াত-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের রবকে বিনীত ভাবে আর নিরবে আহবান কর; যারা বাড়া-বাড়ী করে তাদের তিনি ভালবাসেন না। আর পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলা স্থাপিত হওয়ার পর আবার সেখানে বিপর্যয় ঘটিওনা, আর ভীত চিত্তে তাঁকে আহবান কর; নি:সন্দেহে আল্লাহ্‌র করুণাকামী লোকদের খুবই নিকটবর্তী।"[১]

"আল্লাহ্ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের অতিরীক্ত বোঝা চাপিয়ে দেননা । সে তার পূণ্য কর্মের পুরস্কার পাবে, আর দুষ্কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। হে আমার রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা অপরাধ করি; সে জন্য আমাদের শাস্তি দিওনা। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে ভার চাপিয়েছিলে, তা আমাদের উপর দিওনা। হে আমাদের রব! আরও যা আমাদের বহন করবার শক্তি নেই , তাও আমাদেরকে বহন করতে দিওনা; আমাদেরকে পাপমুক্ত কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি করুণা কর।"[২]

এ ভাবেই চলছে এই বিস্ময়কর গ্রন্থের বর্ণনা । আর মহানবী (স:) এর প্রচারের বিষয়বস্তুও এই। বৃহত্তর জগত আর অধিকতর অগ্রগামী মানব সমাজের প্রতি এই ছিল তাঁর দাওয়াতের ভাষা । বিশ্ব মানবের মহান প্রেমাকুল চিত্তের কাছে সত্য, বিশুদ্ধ আর পবিত্রের জন্য কঠোর সাধনা ও ব্যাকুলতার কাছে এ বাণী ছিল উচ্চ পর্যায়ের এক কোমল আবেদন। এ বাণী আবেদন করছে মানুষের মহৎ অনুভূতির কাছে,তাঁর অন্তর চেতনা ও তার নীতিবোধের কাছে; আর প্রমাণ করছে, প্রকাশ করে দেখাচ্ছে পৌত্তলিক বিশ্বাসের অস্বাভাবিকতা। এমন কোন অধ্যায়ই বলতে গেলে নেই যাতে আল্লাহর ক্ষমতা, দয়া আর একত্ব সম্পর্কে দু-একটি প্রদীপ্ত অংশ না আছে। ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সাদরে অঙ্গীভূত আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, দয়া , একত্ব ও স্নেহ-কোমলতা সম্পর্কিত এই উপদেশ মালা ইসলামী জগতের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কতর্ব্য হিসেবে নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়ে থাকে।

রিসালাতে বিশ্বাস

রিসালাতে বিশ্বাস ইসলামের একটি বুনিয়াদী আকীদা। আল্লাহ্‌র সত্তা অদৃশ্য। তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের প্রচারের জন্য কোনও দৃশ্যমান মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। নবী-রাসূলগণই হচ্ছেন আল্লাহ্‌র দীনের প্রচারের উক্ত মাধ্যম। তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রত্যাদেশ বাণীর (অহী) সাহায্যে লোকদের চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তি হতে মুক্ত করে সঠিক ও নির্ভুল পথে আয়ন করেন। একথা সত্য যে, ইসলামে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। কিন্তু তাতে মানবীয় বুদ্ধিকে জ্ঞান লাভের ও সুক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জনের একমাত্র উৎস বলে নির্দেশ করা হয়নি, বরং ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান লাভ ও সুক্ষ্মতত্ত্ব অর্জনের বিশুদ্ধতম উৎস হচ্ছে অহী, নবুওয়াত ও রিসালাত।[৩]

একমাত্র আল্লাহ্ প্রেরিত অহীর সাহায্যেই মানুষ তাওহীদের নিগুঢ় তত্ত্বকে হৃদয়াঙ্গম ও উপলব্ধি করতে পারে এং পাপাচার, অন্যায়, ফ্যাসাদ ও অন্য যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনচার সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাহতে মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ্ কর্তৃক নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্যে হল মানব জাতির হিদায়াত এব তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের পথ নির্দেশ। নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন সমাজ হতে গোরাহী ও সর্ব প্রকার অনাচার দূর করার জন্য, লোকদেরকে আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়া

১. আল-কুরআন, সূরা আল আরাফ, আয়াত-৫৫-৫৬
২. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-২৬১-৬৩
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খন্ড), পৃ. ৩৮০

Dhaka University Institutional Repository

কলাপের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে; পৃথিবীর আরম্ভ ও পরিণতির সাথে সম্পর্কিত অহীর মারফত প্রাপ্ত জ্ঞান সম্পদকে তাদের নিকট পৌঁছে দেবার উদ্দেশে এবং মৃত্যুর পর মানুষকে যে সকল মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয় তৎসম্বন্ধে তাকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে। উক্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক ও বুনিয়াদী তথ্য আমাদের বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ভান্ডারে নেই। প্রত্যেক নবী-রাসূলই লোকদিগকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।[১] দীনের ব্যাপারে পয়গাম্বরগণ নিজ হতে কিছুই বলেন না, বরং তাঁরা কেবল আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের প্রচার করেন।[২] রিসালাতের বিশ্বাসের কল্যাণে মানুষের অন্তরের আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও হিকমাতের বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং রাসূলের প্রতি ভালবাসাও আনুগত্যের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়।

ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস

ইসলামে আল্লাহ্‌ ছাড়াও বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে ফেরেস্তাদের সম্পর্কে। জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল, আযরাঈল সহ অসংখ্য ফেরেস্তায় বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ্‌ বলেছেন- "তিনি (আল্লাহ্‌) স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেস্তাদেরকে নাযিল করেন যে, হুঁশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব, আমাকে ভয় কর।"[৩] "---- বরং সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং ফেরেস্তাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর।"[৪]

ফেরেস্তাদের মধ্যে পদমর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের কাজই হল আল্লাহ্‌র হুকুম তামিল করা এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসায় নিয়োজিত থাকা। এ ছাড়া তারা প্রাকৃতিক সমূহকে উদ্বুদ্ধ করে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টিতে। এরা মানুষের মত মাটি থেকে সৃষ্ট নয়, সৃষ্ট আলোক দ্বারা। এদের মধ্যে কোন লিঙ্গ ভেদ নেই এবং কোন রকম পাপও তাদের স্পর্শ করতে পারে না।

আল্লাহ্‌র আদেশ পালন, প্রশংসা জ্ঞাপন এবং মানুষের কল্যাণ বিধান ফেরেস্তাদের কর্তব্য। আল্লাহ্‌ সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হলেও তিনি সরাসরি কিছু করেন না। আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেস্তাগণ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কার্যে রত থাকে এবং নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টিতে এবং পৃথিবীর বিবর্তন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান। তারা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃংখলার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে মেনে চলেন এবং সে সব নির্দেশকে কার্যকর করেন।

আদিতে ফেরেস্তাদের শিরোমনি ছিল ইবলিস। সে আল্লাহ্‌র প্রতি খুবই অনুগত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশে সব ফেরেস্তা মানুষ ও সিজদা করলেও ইবলিস তা করল না। সে নিজেকে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরী সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড় মনে করত। ফলে সে অভিশপ্ত শয়তান হয়ে গেল। বহিস্কৃত হল বেহেস্ত হতে এবং মানুষের ঈমান নষ্ট করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল সে।[৫]

---

১. আল-কুরআন, সূরা -১৬, আয়াত-৩৬
২. আল-কুরআন, সূরা-৫৩, আয়াত-৩-৪
৩ আল-কুরআন, সূরা-১৬, আয়াত-২
৪. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৭৭
৫. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-৩০-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

যাইহোক, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শুভ-অশুভ এ দু'টি দ্বন্দ্ব বর্তমান। শুভ শক্তির পরিচালক ফেরেশতাগণ আর অশুভ শক্তির চালক শয়তান। ফেরেশতাগণ মানুষকে অশুভ আচরণ থেকে বিরত রাখে এবং শুভ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এটা সত্য যে, এ সব অদৃশ্য আধ্যাত্মিক সত্তা আল্লাহ্‌র সন্তান নয়, এরা আসলে তাঁর দূতস্বরূপ। এরা আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ এবং তাঁর প্রতি অনুগত। আল্লাহ্ এদেরকে তাঁর সৃষ্টি বিশ্বশাসনে নিযুক্ত করেন। নিজেদের বিচার বুদ্ধি মত স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না। এরা নিজেদের প্রণীত কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করতে পারে না। এমনটি এরা মানুষের হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কোন সুপারিশও করতে পারে না। তাই মহানবী (সঃ) ফেরেস্তাদের উপাসনা করাকে এবং তাদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুক্ত করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, এসব ফেরেস্তা আমাদের চারদিকেই আছে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আছে। তাঁরা আমাদের আচরণ পর্যবেক্ষণও লিপিবদ্ধ করছেন, তারা প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনের ভাল-মন্দ কর্মের পুর্ণ তালিকা রক্ষা করেন। মৃত্যুঃপর আমাদের যখন আল্লাহ সমানে উপস্থিত করা হবে, তখন তারা পৃথিবীতে আমাদের সব প্রকাশ্য ও গোপন কৃত কর্মের উপর একটি পূর্নাঙ্গ বৃত্তান্ত উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ্‌র বলেছেন-"দু'জন লিখক ফেরেস্তা মানুষের ডান ও বাম পাশে বসে প্রত্যেকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখছে। এমন কোন শব্দ তাঁরা মুখে উচ্চারিত হয় না, যার সংরক্ষণের জন্য একজন সদা উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওযুদ না থাকে। সেই দিন প্রত্যেক ব্যক্তি এই অবস্থায় আসবে যে, তার সাথে একজন পরিচালক এবং একজন সাক্ষ্যদাতা ফেরেস্তা বর্তমান থাকবে।"[১]

তকদীর বা ঐশী নির্বন্ধ

ইসলাম এমন এক পরম বুদ্ধিমান সত্তার উপস্থিতি স্বীকার করে যিনি সমগ্র জগতকে নিয়ন্ত্রন ও শাসন করেন। সেই বুদ্ধিমান পরমসত্তাই আল্লাহ্। একমাত্র আল্লাহ্‌ই প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তিনিই আদি সক্রিয় কারণ। তাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছেই জগতের সব ব্যক্তি, বস্তু ঘটনাকে নির্দেশ করতে হবে। মানুষ আত্ম নিয়ন্ত্রিত সত্তা হতে পারে না কারণ, তাহলে জগতে যত মানুষ আছে, ঠিক ততটি আদিকরণ স্বীকার করতে হয় এবং তাতে করে আল্লাহ্‌র ক্রিয়াপরতাকে সীমিত ও বিঘ্নিত করা হবে। কিন্তু ইসলামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তা পরম ঐশী শক্তি ও ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাধীনতার সংযোগ ও সমন্বয় সাধনে সক্ষম। ইসলামের মতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীই হল আল্লাহ্‌র নির্দেশ বা বিধান। আর প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনা কিছু নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। এ সব প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমেই ঐশ্বরিক কার্যকরণ অগ্রসর হয়ে থাকে। মানুষ প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় তার কার্যকলাপ কতপিয়ক বাহ্য ও আন্তর নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও মানুষ তার সীমিত অস্তিত্বের আওতায় তার কর্ম ও আচরণের কর্তা। সে একটি নৈতিক সত্তা, আর সুনীতি ও দূর্নীতির পার্থক্য করা এবং স্বেচ্ছায় ভাল কিংবা মন্দ কর্মপন্থা নির্বাচন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয় ২ এ ছাড়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মোটেই যথেষ্ট নয়। মানুষ যে কর্মপন্থাকে শুভ ও সঙ্গত বলে নির্বাচন করে, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং এর জন্য আল্লাহ নয়, সে নিজেই দায়ী। আল্লাহ্‌র বলেছেন -"আল্লাহ্ কাউকে এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন

---

১. আল-কুরআন, সূরা -৫০, আয়াত-১৭-২১

২. Prof. Sayedur Rahman, An Introduction to Islamic Culture and Philosophy. Mullick Brothers, Dhaka-1963. p. 52.

Dhaka University Institutional Repository

করেন না, যা তার সাধ্যাতিত। সে যা ভাল উপার্জন করে সেটা তারই এবং সে যা মন্দ উপার্জন করে সেটাও তারই।"[১]

মানুষ তার কার্যাবলীর জন্য এবং তার শক্তির সদ্ব্যবহার কিংবা অপব্যবহারের জন্য দায়ী। সে ইচ্ছা করলে যেমন পারে উত্থাপন করতে তেমনি পারে অধঃপতিত হতে। কুরআনের মতে মানুষ সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।[২] সে একটি স্বাধীন দায়িত্বশীল কর্তা এবং নিজেই নিজের ভাগ্য বিধাতা।[৩] প্রত্যেক মানুষ জন্মায় স্বাধীন ও নিষ্পাপ হয়ে এবং একটি নৈতিক কাঠামো নিয়ে। কিন্তু জন্মের পর তাকে নানা রকম কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে তাঁর নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে বিকশিত করতে হয়। মানুষের নিজস্ব আচরণই তাকে দোজখে কিংবা বেহেস্তে নিয়ে যাবে এবং তার কোন আচরণই তকদীর বা অদৃষ্টের ফল নয়, কিংবা সে বেহেস্ত বা জোযখে যাওযার কোন অনিবার্য ডিক্রী নিয়ে জন্মায়না। তার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তারই কর্ম ও আচরণ দ্বারা। তাই আল্লাহ্‌র বলেছেন-"যে সৎ পথে চলে সে নিজের মঙ্গলের জন্যই তা করে। আর যে বিপথে চলে সে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই তা করে। একের বোঝা অপরে বহন করবে না। সর্তককারী না পাঠিয়ে আমি (কোন জাতিকে) শাস্তি প্রদান করি না।"[৪]

"জেনে রেখো, যতদিন পর্যন্ত কোন জাতি তাদের অন্তর প্রকৃতির পরিবর্তন না করে ততদিন পর্যন্ত আলল্লাহ্ তাদের পার্থিব অবস্থার ও পরিবর্তন করে না।"[৫]

সুতরাং দেখা যায় যে, জগত একটি আত্ম গঠনের স্থান। এখানে ভাল-মন্দ উভয় পথই রয়েছে। এ দু'য়ের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব মানুষের। আর মানুষ তা নির্ধারণ করবে প্রজ্ঞার সাহায্যে। জীবন মানুষকে কাজ করার এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করে। একমাত্র কর্মই মানুষের উত্থান কিংবা পতনের জন্য দায়ী। সুতরাং পূর্ণতা প্রাপ্তি কিংবা অধঃপতন মানুষের নিজেরই কর্মফল। তাই বুঝা যায় যে, মানব জীবনকে ইসলাম দেখে এমন এক অসীম শক্তি হিসেবে, যা কোন রকম অনতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি স্বীকার করে না।

নবুওয়াতের সমাপ্তি

নবুওয়াতের চূড়ান্ততায় বিশ্বাস ইসলামের অপর একটি মৌল উপাদান। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও অনুভূতিতে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। প্রাচীন বাইবেলে নতুন নবীর আগমনের পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু কুরআনে তা নেই। কুরআনে বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে আল্লাহর তরফ হতে পৃথিবীতে নবী প্রেরণ মুহাম্মদ (সঃ) এ সমাপ্তি হয়েছে।[৬] মহানবী (সঃ) স্বয়ং বলেছেন-"যখনই কোন নবী পরলোক গমন করেছেন, তারপর অবতীর্ণ হয়েছেন অন্য একজন। কিন্তু আমার পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না"।[৭]

---

১. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-২৮৬
২. আল কুরআন, সূরা-৪,আয়াত-১১১
৩. আল কুরআন, সূরা-৪২,আয়াত-৩০
৪. আল কুরআন, সূরা-১৬,আয়াত-১৫
৫. আল কুরআন, সূরা-১৩,আয়াত-১৯
৬. আল কুরআন সূরা, ৩৩ আয়াত-৪০
৭ বোখারী শরীফ (১ম খন্ড), পৃ-৪১৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এই নির্দেশ নিয়ে মতদ্বৈততার কোন অবকাশ নেই। একে যে-ই অন্যভাবে বা অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করবে, সে-ই পরিগণিত হবে অবিশ্বাসী বলে। [১]

মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে পথহারা দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথে আনয়নের জন্য অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন এ ধরাধামে। আল্লাহ্ তাদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে সুসংবাদ কিংবা সতর্ক করার জন্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাও ছিল অন্যান্য নবীর পালিত সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বেরই অংশ, যদিও এখানে এসে নবুওয়াত উপনীত হয়েছে তার শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-পয়গাম্বরের মাধ্যমে আল্লাহ্ পৃথিবীতে যে ধর্মীয় সত্য বা ভাবাদর্শ প্রেরণ করেছেন এবং যা নিয়ে ধর্মবিশ্বাস গঠিত, তা-ই পূর্ণতা ও চূড়ান্ততা অর্জন করেছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এ। আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন এজন্য যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির সবচেয়ে মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ পুরুষ।[২] মহানবী (সঃ) যে বাণী বহন ও প্রচার করেছিলেন, তা ছিল পৃথিবীতে নবী-পয়গাম্বরদের শিক্ষা। আর এবাণীই সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে আল-কুরআনে- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।"[৩] শেষনবী (সঃ) এর অমীয় বাণী ও শিক্ষা অতীতের ন্যায় আজও সজীব এবং তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে মানুষের অনন্ত প্রেরণার উৎস ও প্রাণ শক্তি হিসেবে।

মরণোত্তর জীবন

ফেরেশতায়, ভাল-মন্দ বিষয়ক তকদীরে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানব জীবনের জন্য একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে দেয় এবং তাকে নেক আমল করতে উৎসাহিত করে। এতদ্বারা মানব জীবন উদ্দেশ্য বিহীন একটি চলন্ত তরী-আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী বা অস্তিত্ববাদীদের ধারণা বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন-"তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না ?।"[৪] ইসলামে মানব জীবনের একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত রয়েছে। যা আখিরাত বা পরকালের সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের পারলৌকিক জীবন সম্পর্কিত প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণা গড়ে উঠেছে একটা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। সে হচ্ছে পরলোকের জীবনে প্রত্যেক মানুষকে পার্থিব জীবনের সকল কাজের হিসেব দিতে হবে, আর ব্যক্তির সুখ বা দুঃখ নির্ভর করবে স্রষ্টার আদেশ কতখানি কী প্রকারে পালন করেছে তার উপর। এতদসত্ত্বেও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অসীম আর তার সৃষ্টি জীবের উপর তা সমভাবেই বর্ষিত হবে। এই কেন্দ্রীয় স্তম্ভের উপরই ইসলামের সমস্ত পারলৌকিক জীবনের ধারণাটি আবর্তিত হচ্ছে। আল-কুরআনের বহু আয়াতে কিয়ামাত বা শেষ দিবসের কথা বলা

---

১. S Mahmudunnasir, Islam: Its Concepts and History, New Delhi-1981. p. 52
২. ডঃ আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৫ইং, পৃ. ৩৩-৩৪
৩. আল কুরআন, সূরা-৫ আয়াত-৩
৪. আল কুরআন, সূরা-২৩, আয়াত-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। কিয়ামতে মানুষকে আবার জীবিত করা হবে। আল্লাহ্ সব মানুষের বিচার করবেন এবং প্রত্যেককে তার কর্মফল অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা তিরস্কৃত করবেন। তারও আগে করবে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে যুক্ত করা হবে আত্মাকে। মুনকার ও নকির এই দু'ফেরেশত হাজির হবেন কবরে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন তার ইহজাগতিক কৃতকর্ম সম্পর্কে। কেবলমাত্র নেক ব্যক্তিগণই পারবেন সঠিক উত্তর দিতে। বিশ্বাসীগণ নিজ নিজ কবরেই অবস্থান করবেন শান্তি ও সুসুপ্তিতে; আর অবিশ্বাসীগণ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে তার পার্থিব জীবনের আমলনামা। পুণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ডান হাতে[১] আর পাপাত্মাদের বাম হাতে[২] এবং এর ভিত্তিতেই আল্লাহ্ সকলের বিচার করবেন।

পরকালে নেককার লোকদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও তার নিয়ামত সমূহ এবং বদকার লোকদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম ও তার শাস্তি। কুরআনে বেহেস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে পাহাড়,নদী, ছায়াময় বৃক্ষ ও প্রীতি দায়ক জলবায়ু পরিবৃত একটি নয়নাভিরাম উদ্যান হিসেবে।[৩] আর দোজখকে (জাহান্নামকে) চিত্রিত করা হয়েছে একটি উত্তপ্ত বিভীষিকাময় স্থান বলে। নেককারগণ পাবে বেহেস্তের চির শান্তি, আর পাপাত্মাগণ ভোগ করবে দোযখের অসহ্য যন্ত্রণা। বেহেস্তের অধিবাসীগণ থাকবেন এক অত্যন্ত প্রীতিকর ও মনোরম পরিবেশে এবং তারা উপভোগ করবে সুখ। তাদের মুখে ভেসে উঠবে আনন্দের ছায়া এবং তাঁরা পরম তৃপ্তি লাভ করবেন। তাদের পরিশ্রম থেকে।[৪] তারা কোন অলস আলাপ চারিতা শুনবে না । কোন মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করবে না।[৫] নিষ্ফল কোন কিছুতেই তারা জড়িত হবে না বরং পেতে থাকবেন শুধু শান্তি আর শান্তি।[৬] তাদের স্বাগত জানানো হবে শান্তির বার্তা দিয়ে।[৭] "ফেরেস্তাগণ তাদেরকে স্বাগত জানাবে এই বলে-আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আপনারা এসেছেন এক আনন্দময় পরিবেশে সুতারাং প্রবেশ করুন এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করুন।"[৮] তারা গরম বা ঠান্ডায় কোন ক্লান্তিকর অনুভূতি বোধ করবেন না।[৯] আল্লাহ্ তাদের বিশুদ্ধ পানীয় প্রদান করবেন।[১০] তারা বাগান ও ঝর্ণা পরিবৃত অবস্থায় বসবাস করবেন।[১১] কোন রকম দুশ্চিন্তা বা অবসাদ তাদের থাকবে না। তারা পরিপূর্ণ আরাম ও আনন্দের সুরভী উপভোগ করবেন। [১২]

---

১. আল কুরআন, সূরা-১৭, আয়াত-১৪

২. আল কুরআন, সূরা-৬৯, আয়াত-১৯-২৫

৩. আল কুরআন, সূরা-১৩, আয়াত-৩৫

৪. আল কুরআন, সূরা-৮৮, আয়াত-৯-১০

৫. আল কুরআন, সূরা-৭৮, আয়াত-৩৬

৬ .আল কুরআন, সূরা-১৯, আয়াত-৬৩

৭. আল কুরআন, সূরা-২৫, আয়াত-৭৬

৮.আল কুরআন, সূরা-৩৯, আয়াত-৭৪

৯. আল কুরআন, সূরা-৭৬, আয়াত-১৪

১০. আল কুরআন, সূরা-৭৬, আয়াত-২২

১১.আল কুরআন, সূরা-১৫, আয়াত-৪৬

১২.আল কুরআন, সূরা-৫৬, আয়াত-৯০

Dhaka University Institutional Repository

"তারা অভিভূত থাকবেন পরম উল্লাস বা আনন্দঘন অনুভূতিতে।"[১] "তাদের মুখমন্ডলে অভিব্যক্তি ঘটবে প্রশান্তির এবং তাদের পরিবেশন করা হবে কস্তুরীর মোড়কে আঁটা বিশুদ্ধ পানীয়।"[২] তারা তখন অবস্থান করবেন এক পরম প্রশান্তি ও আনন্দের রাজ্যে এবং তখন তারা বলবেন- " সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের বসবাসের জন্য প্রদান করেছেন এ পরমানন্দের বাগান।"[৩]

অন্যদিকে দোজখের শাস্তি কেমন কঠোর হবে এ ব্যাপারেও কুরআনে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পাপীগণ যখন যন্ত্রণা ভোগ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ সর্ব শক্তিমান, শাস্তি বিধানে তিনি কঠোর।[৪] তাদের ফুটন্ত পানি পরিবেশন করা হবে। সেই পানিতে তারা চুমুক দিবে বটে কিন্তু সহজেই তা গিলতে পারবে না।[৫] "শুধু ফুটন্ত গরম পানি ছাড়া ঠান্ডা কোন কিছুই তারা পাবে না। তাদের দেয়া হবে এক ধরনের শুকনো তেতো ও কণ্ঠকময় তৃনজাতীয় খাদ্য।"[৬] এখানে যেমন থাকবে না কোন পুষ্টি তেমনি তাতে ক্ষুধাও নিবৃত হবে না। পাপীদের এ সঙ্গে শৃংখলিত অবস্থায় যখন বন্দী করে রাখা হবে, তখন তারা ছটফট করতে থাকবে অসহ্য যন্ত্রণায় এবং কামনা করতে থাকবে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছে আসবে না।[৭]

ইসলামে বেহেস্তের সুখ-শান্তি ও দোজখের দুঃখ-কষ্টের যে ধারণা পেশ করা হয়েছে সে ধারণার সঙ্গে গুনাহ ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এর ধারণাও ইসলামের একটি অন্যতম দিক। এ বিষয়েও ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এমন মধ্যমপন্থা গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও যুক্তি সঙ্গত। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোনও গুনাহ করে বসে এবং অতপর সে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। আর এটাই হচ্ছে তার রহমত ও মাগফিরাতের দাবী। মানুষের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা তার জন্য সব সময় খোলা থাকে এবং আল্লাহ তাওবাকারীদিগকে ভালবাসেন।

সালাত

ইসলামে সালাত বা নামায এমন একটি গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদাত বা ব্যক্তির আত্মাকে পবিত্র করে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় চেতনা মাত্রই নিজের অপূর্ণতা সম্পর্কে ব্যক্তির অনুভূতি এবং জগতের সাথে নৈতিকভাবে যুক্ত ও জীবন সংগ্রামের মানুষের সহায়তা প্রদানকারী এক অধিকতর শক্তিশালী সত্তার উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতাকে বুঝায়। এই অনুভূতিই মানুষকে চালিত করে সেই সত্তার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার কাজে এবং সেই সত্তার প্রতি প্রেম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে। প্রার্থনা বলতে উল্লিখিত অনুভূতিসমূহের প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে বুঝায়। যথার্থ অর্থে ইসলামী প্রার্থনা আল্লাহ্‌র ও মানুষের

---

১. আল কুরআন, সূরা- ৭৬, আয়াত -১২
২. আল কুরআন, সূরা- ৮৩, আয়াত -২৫-২৭
৩. আল কুরআন, সূরা- ৩৯, আয়াত -৭৫
৪. আল কুরআন, সূরা- ২, আয়াত-১৬৬
৫. আল কুরআন, সূরা- ১৪, আয়াত -১৭-১৮
৬. আল কুরআন, সূরা- ৮৮, আয়াত -৭-৮
৭. আল কুরআন, সূরা- ২৫, আয়াত -১৪

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে এক ধরণের যোগাযোগ স্বরূপ। আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় হিসেবে প্রার্থনা মূল্য সব মহলে স্বীকৃত। ইসলামী প্রার্থনা খুবই সহজ। উইলিয়াম হান্টার বলেছেন -"ইসলামের একটি গৌরব এই যে, এর উপাসনালয় সমূহ মানুষের হাতের তৈরী নয় এবং এর আচারাদি স্রষ্টার স্বর্গ বা মর্তের যে কোন স্থানে সম্পন্ন করা যায়।"[১]

সালাত প্রবর্তন করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রতি মানবআত্মার প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাকুলতাকে স্বীকৃতি দান করেন, আর নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা আদায়ের ব্যবস্থা করে তিনি ইবাদাতে এমন একটি শৃংখলার সৃষ্টি করেন যা মনকে বস্তু জগতের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সালাতের প্রক্রিয়াসমূহ তাঁর নিজের উদাহরণ তার আচরণের মাধ্যমেই পবিত্রতা লাভ করেছে, আর প্রক্রিয়াগত বিধান সম্পর্কে দ্বন্দ্বের কুফল থেকেও মুসলিম জগতকে রক্ষা করেছে এবং তাতে বান্দার জন্য সর্বশক্তিমানের দরবারে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভক্তি ও বিনয় প্রকাশের ব্যাপকতম সুযোগ রাখা হয়েছে। "তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর। আর সালাত কায়িম কর; সালাত অশ্লীলতা আর অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর আল্লাহ্‌র যিক্‌রই সর্বশ্রেষ্ঠ।"[২]

ইসলামের জন্মভূমির স্মৃতিকে মুসলিম জগতের মনে জাগ্রত রাখবার উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশ দেন যে, সালাতের সময়ে প্রত্যেক মুসলমান মুখ করে দাঁড়াবে মক্কার দিকে যে মক্কা, যে গৌরবময় কেন্দ্র পুনরুজ্জীবিত সত্যের প্রথম আলোক রশ্মি দেখেছিল। নবুওয়াতের সহজাত প্রবণতা দ্বারা তিনি উপলব্ধি করেন-যদি একটি স্থানকে কেন্দ্র করে চিরকাল তাঁর উম্মাতের ধর্মানুভূতি আবর্তিত হয় তবে তাঁর সংহতিমূলক প্রভাব কতটা বড় হতে পারে। এ জন্য তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পেয়ে আদেশ করেন যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, মুসলমান সালাত আদায় করবে কাবার দিকে মুখ করে।[৩]

ইসলামে সমষ্টিগতভাবে সালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরূপ সালাত আদায় সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে এবং মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে, মানুষের মধ্যে শৃংখলাবোধ জাগ্রত ও সংরক্ষণ করে। সমষ্টিগতভাবে মুসলমানগণ যখন নিয়মিত প্রার্থনায় মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও সমতাবোধ সৃষ্টি হয়। এই একতাবোধ রক্তের সম্পর্কে উপর প্রতিষ্ঠি সংকীর্ণ একতা বোধে সীমিত থাকে না। বরং সব শ্রেণীর ও সব স্থানের মুসলমানদের একতাবোধে পরিনত হয়। এখানে পরিবার ও বংশ, সম্পদ ও ক্ষমতার অহমিকা, গরীব ও দূর্বলদের প্রতি ঘৃণা এসবই বিলীন হয়ে যায় এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের পারস্পারিক আলিঙ্গনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমতাভিত্তিক আনুগত্য গড়ে উঠে। এভাবেই সালাতের মাধ্যমে সংকীর্ণ পারিবারিক বা গোত্রীয় ঐক্যের স্থলে গড়ে উঠে মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের এক উচ্চতর চেতনা ও ঐক্যবোধ।[৪]

---

১. W.W. Hunter, Our Indian, Muslmans, p. 179.

২. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৮৩-৮৫

৩. সৈয়দ আমির আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৪. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. p. 38-39.

Dhaka University Institutional Repository

সিয়াম সাধনা

বছরে একমাস রোযা রাখার বিধান ইসলামের তৃতীয় স্তম্ব। কুরআনে সিয়ামের বিধান সংক্রান্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লক্ষণীয়। "হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান দেয়া গেল,----- যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সিয়াম কয়েকটি নির্ধারিত দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের কেউ যদি পীড়িত হয় অথবা ভ্রমণে থাকে, তবে তার জন্য অন্য সময়ে সমসংখ্যক দিন পূরণ করতে হবে; আর এটা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য-এর পরিবর্তে ফিদয়া হচ্ছে একজন মিসকীনকে খাওয়ানোয়। ------- তোমরা যদি বুঝতে, তবে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য ভাল। ------তোমাদের পক্ষে যা সহজ, আল্লাহ্ তাই-ই-চান।"[১]

সিয়ামের বিধান হচ্ছে দিবাভাগে যাবতীয় জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ থেকে এবং পানাহার থেকে বিরত থাকা। রাত্রিকালে ইবাদাত বন্দেগীর ও ভক্তি নিবেদনের ফাঁকে মুসলমান কিছু পানাহার করে বা অন্য প্রকার আইন সঙ্গত ও আনন্দ উপভোগ করে দেহ-মন সতেজ করে নিতে পারে। সম্ভবত নিতে সে বাধ্য। নবীর সত্যিকার নীতি অনুসরণ করে ফকীহগণ অলঙ্গনীয় নিয়ম করেছেন যে, সিয়াম পালনকালে শারীরিক বর্জনের মত মন থেকেও মন্দ চিন্তা বর্জন করা বাধ্যতামূলক। [২]

যাকাত

ইসলামের পূর্বে কোন ধর্ম যাকাত দান, বিধবা, ইয়াতীম ও অসহায় দরিদ্রের ভরণ-পোষণকে নীতিমালায় বিধিবদ্ধ করে ধর্মের অঙ্গে পরিনত করেনি। যাকাতের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের সাভাবিক প্রবণতা স্বার্থ পরতার দিকে। এ প্রবণতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন তা থেকে মানুষের মধ্যে সামাজিক মুল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এ উদ্দেশ্যে সামনে রেখেই ইসলাম সমাজের দরিদ্র ও অক্ষমদের সাহায্যার্থে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ইসলামের বিধান মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পত্তির কিয়দংশ তার অধিকতর হতভাগ্য প্রতিবেশীর সাহায্যের জন্য দান করতে বাধ্য। এ অংশ হচ্ছে যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির, উৎপন্ন শস্যের ব্যবসায়ের লাভের, মজুদ মালের ইত্যাদির চলিশভাগের একভাগ বা শতকরা আড়াইভাগ। কিন্তু এ দান বা যাকাত দিতে হবে যদি সম্পত্তির মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের হয়[৩] আর তা মালিকের হাতে পুরা এক বছর থাকে। আর যে সব পশু কৃষিকাজ ও ভার বহনে ব্যবহৃত হয়, তার জন্য যাকাত দিতে হবে না। তাছাড়া রমযান মাসে সীয়াম শেষে আর ঈদুল ফিতরের দিনে প্রত্যেক পরিবারের প্রধানকে তার নিজের, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আর রমজান মাসের তার বাড়ীতে সিয়াম পালন করে ইফতারকারী ও রাত্রি যাপনকারী এমন অতিথিদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম, যব, খেজুর, কিসমিস, চাউল বা অন্য যে কোন জিনিস অথবা তার মূল্য ফিতরা হিসেবে দিতে হয়। ইসলামের বিধান মতে, এ সব দানের নায্য অধিকারী হচ্ছে-(১) দরিদ্র আর অভাবগ্রস্থ, (২)

১. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৮৩-৮৫

১. সৈয়দ আমির আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৩. সাড়ে সাততোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা তার সমমুল্যের পরিমাণ।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত আদায় ও বিতরণে যারা সাহায্য করে, (৩) ক্রীত দাস-দাসী, যারা নিজেদের স্বাধীনতা খরিদ করতে চায়, কিন্তু সঙ্গতি নেই। (৪)ঋণগ্রস্থ, যার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নেই, (৫) মুসাফীর আর বিদেশী।[১]

হাজ্জ

"আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই গৃহে হজরত উদযাপন করা মানুষের জন্য ফরজ-অবশ্য যে ব্যক্তি পথ ভ্রমণে সমর্থ। যদি কেহ এ দায়িত্ব অস্বীকার করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বমানবের মুখাপেক্ষী নন।"[২] মক্কায় ও কাবায় বাৎসরিক হজ্জের কালজয়ী প্রথা ইসলামে অঙ্গীভূত হয়েছে; আর এই হাজ্জ মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে একা আর বিশাসের ভ্রাতৃত্ব সঞ্চারিত করেছে। সেই অন্ধকার যুগে পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছিল একটি বেহেশতের জ্যোতি, সমগ্র মুসলিম জগত কাবার কেন্দ্রবিন্দুতে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে হৃদয়ে জাগিয়ে রাখে সেই জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ। এখানেও আবার সেই অনুপ্রাণিত বিধান দাতার জ্ঞান বত্তার আলোক রশ্মি দেখতে পাই হাজ্জের শর্তাবলী প্রণয়নের মধ্যে- (১) বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির পরিপক্কতা, (২) পূর্ণ ও অবারিত স্বাধীনতা, (৩) ভ্রমণকালে যান বাহন ও আহার্যের জন্য প্রয়োজনীয়য় অর্থের মালিক থাকা, (৪) হাজ্জ যাত্রীর অনুপস্থিতিকালে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট সম্বল থাকা এবং (৫) ভ্রমণের সম্ভাব্যতা ও কার্যকরতা - এই শর্তাবলী পূর্ণ হলে হাজ্জ করা বাধ্যতামূলক হবে।[৩]

শরীআতের প্রত্যেকটি বিধানের একটি প্রগাঢ় অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে। সালাত বা নামায বলতে বুঝায় বিস্মৃতির স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়া তথা আল্লাহ্‌র ও মানুষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করাকে। রোযা সচল ও সুদৃঢ় করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছাকে এবং নির্দেশ করে প্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির এক নতুন পবিত্রতার শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়াকে। যাকাত নির্দেশ করে আধ্যাত্মিক বদান্যতা ও মহত্ত্বকে এবং তাতে করে তা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ককে। হাজ্জ নির্দেশ করে আপাত অস্তিত্বের পর্যায় থেকে আধ্যাত্মিক কেন্দ্রীয় অস্তিত্বে উত্তরণ লাভকে। সূফীদের ভাষায় এই কেন্দ্রীয় অস্তিত্ব অধিষ্ঠিত সেই অন্তকরণে যা কিনা পরিচিত আধ্যাত্মিক কাবা বলে। মানুষের মধ্যে এ ধরণের আধ্যাত্মিক গুণাবলী সৃষ্টি করা এবং মানুষকে উন্নত জীবনের সন্ধান দেয়াই ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য।[৪]

ইসলামের বৈশিষ্ট্য

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রচারিত ইসলাম সমসাময়িক ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাগুলি হতে বহুবিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে বহু মানবগোষ্ঠী বা অপর ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের অনেকগুলি নীতি সাকুল্যে বা আংশিকভাবে তাদের সমাজ বিধানের অন্তর্ভূক্ত করার ফলে

১. আল-কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-৬০
২. আল-কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-৯৭
৩. সৈয়দ আমির আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭
৪. ড. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আর তেমন প্রকটভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এরূপ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে চিহ্নিত করা হল ঃ

(১) ইসলামের আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতিপালক,[১] কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত মানব গোষ্ঠীর উপাস্য নয়। তিনি সর্বগুণে বিভূষিত, সর্বদোষমুক্ত সর্ব শক্তিমান নিরাকার এবং সদৃশ্যবিহীন সত্তা। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আসমাউল হুসনা'য় [২] যা সীমিত শক্তির আওতায় মানবের অনুকরণীয়। সুতরাং একাধারে মানবের উপাস্য এবং আদর্শ।

(২) ইসলামের দৃষ্টিতে কোন নবী অতি মানব নন, তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ধর্মাধিকরণরূপে অভ্রান্ত বিধান দেয়ার কোন অধিকার লাভ করেনা, অসুসারীর পাপ মোচনের ক্ষমতা অর্জন করে না। পৌরহিত্যকে ইসলাম স্বীকার করে না। কুরআন অধ্যয়ন ও তার ব্যাখ্যা দান কোন বিশেষ গোষ্ঠীর আওতাভূক্ত নয়, বরং ইবাদাত এবং নীতিনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনে কিছুটা কুরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামুলক।

(৩) সকল সম্প্রদায়ের নবী- রাসূলকে, সকল নবীর প্রাপ্ত আসমানী কিতাবকে স্বীকৃতি দানের [৩] মাধ্যমে ইসলাম অপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় দেয়, দীনের ঐক্য এবং বিবর্তননমূলক শরীআর বিকল্প ঘোষণা করে, মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং মানবজীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য অহী প্রসূত প্রজ্ঞার অপরিহার্যতা ঘোষণা করে। [৪]

(৪) ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসত্তা উৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্ট; [৫] পাপের পঙ্কে তার জন্ম নয়, আদি পিতার পাপের বোঝাও সে বহন করে না। সে তার আপন কর্মের জন্য দায়ী;[৬] মানবসত্তা সসম্মানিত; [৭] জ্ঞানে-গুণে সে ফেরেশতাকে অতিক্রম করতে পারে;[৮] সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিভ [৯] সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের সহজাত প্রবণতা নিয়ে সে জন্ম গ্রহণ করে। [১০]

(৫) ইসলাম ইহজীবনের পর অনন্ত পারত্রিক জীবনের পক্ষে রায় দেয়, এতে জন্মান্তরবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না, মোক্ষ বা নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দান করে না।

(৬) ইসলাম মানবাধিকারের অভূত পূর্ব ব্যবস্থা দান করেছে ঃ

---

১. আল-কুরআন, সূরা - ১, আয়াত-১
২. আল-কুরআন, সূরা - ৭, আয়াত-১৮০
৩. আল-কুরআন, সূরা - ২, আয়াত-২৮৫
৪. আল-কুরআন, সূরা - ৫, আয়াত- ৪৪-৪৭
৫. আল-কুরআন, সূরা - ৯৫, আয়াত - ৪
৬. আল-কুরআন, সূরা - ২, আয়াত - ২৮৬
৭. আল-কুরআন, সূরা - ১৭, আয়াত - ১০
৮. আল-কুরআন, সূরা - ৭, আয়াত - ১১
৯. আল-কুরআন, সূরা - ২, আয়াত - ৩০
১০. আল-কুরআন, সূরা - ৩০, আয়াত -৩০

Dhaka University Institutional Repository

(ক) নারীর মানবিক মর্যাদা বিধান ইসলামের বিধান । সম্পত্তির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণে সে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করেছে। স্বামী ও পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছে। সেক্রামেন্টের শৃংখল হতে মুক্তি লাভকরে সামাজিক চুক্তির আওতায় (বিবাহ) তার ব্যক্তি সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনকি নারী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পর্যন্ত পেয়েছে।

(খ) গোলাম ইসলামী বিধানে তার মানবিক মর্যাদা পেয়েছে। গোলামকে স্বাধীনতা প্রদান ইসলামের একটি পূণ্যময় অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে।

(গ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতি ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এমনকি অমুসলিমের ধর্ম মন্দির রক্ষার দায়িত্ব মুসলিমের উপর বর্তায়- যদি কেউ তা ধ্বংস করতে উদ্ধত হয়।[১] কাবায় উপাসনার অধিকারে হস্তক্ষেপকারী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মুলোচ্ছেদকামী মুশরিকদের বিচারেও হেরফের করা যাবে না।[২] ইসলামী আইনের শাসন অপর ধর্মাবলম্বীগণের প্রতি পক্ষপাত দৃষ্ট নয়।

(ঘ) যুদ্ধরত বিধর্মীরও মানরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে। যারা যুদ্ধরত যুদ্ধক্ষম নয় -যথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক -বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ - মন্দিরাশ্রয়ী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ, অথবা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করা যাবে না।

বিনা উস্কানিতে এককভাবে শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না।[৩] যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌছে না দেয়া হয় ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবে না।[৪] উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়।[৫] যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করতে হবে।[৬] ফলকথা ইসলাম অতি পরিচ্ছন্ন আন্তর্জাতিকতার ধারক ও বাহক।

(৭) ইসলামে ধন বৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণ মুলক সূদ হারাম, যাকাত ওয়াজিব, উত্তরাধিকার আইন সম্পদ বন্টনমূলক।

(৮) ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্;[৭] প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় খিলাফত নীতিতে; খলিফা আইনের উর্ধ্বে নয়, তার বিশেষ কোন সুবিধা নেই; জনগণের রায়ের উপর তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি; প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরামর্শে সেই ক্ষমতার পরিচালনা করতে হবে। খলিফা

১. আল-কুরআন, সূরা - ২২, আয়াত -৪০
২. আল-কুরআন, সূরা - ৫, আয়াত - ২, ৮
৩. আল-কুরআন, সূরা - ৮, আয়াত - ৫৮
৪. আল-কুরআন, সূরা - ৯, আয়াত - ৬
৫. আল-কুরআন, সূরা - ৮, আয়াত - ৭২
৬. আল-কুরআন, সূরা - ৭৬, আয়াত - ৮
৭. আল-কুরআন, সূরা - ৬, আয়াত -৫৭

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের আনুগত্য দাবী করতে পারেন - যতক্ষণ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।[১]

(৯) ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। এতে পার্থিব জীবন এবং ধর্মীয় জীবনের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না। কল্যাণকর সবকর্মই ইবাদাত যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা করা হয়। সব কর্মের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে।

সুতরাং ইসলাম দেশ-কালের সীমানায় আবদ্ধ কোন সংকীর্ণ ধর্ম নয়। এর ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। এটা একটা সার্বত্মক ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। তাওহীদ ভিত্তিক ধর্ম বলে ইসলাম কখনও আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। ইসলাম জীবনকে দেখেছে সার্বিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এ জন্যই এ থেকে বাদ পড়েনি কিছুই। ইসলামী আইন কানুনও প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জগত ও জীবনের মৌল স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। ইসলাম তাই শুধু সাধু পুরুষ বা মহাজ্ঞানী মনীষীদের কথাই বলে না, বরং সঠিক পথ নির্দেশ করে পাপ -পূণ্য ও সুখ-দুঃখ নিয়ে যাদের জীবন সেই সাধারণ মানুষকেও।[২]

ইহা মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল সমস্যার সার্থক সমাধান প্রদান করে। সৈয়দ আমির আলীর ভাষায় -"The wonderful adaptability of Islamic precepts to all ages and nations; their entire concordence with the light of reason; the absence of all mysterious doctorines to cast a shade of sentimental ignorance round the primal truths implanted in the human breast, all prove that Islam represents the latest development of the religious faculties of our being."[৩]

১. আল-কুরআন, সূরা - ৩, আয়াত -১৫৮
২. ডঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৩. Sayed Amir Ali, op.cit. p. 175.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে তাসাওউফ বা সূফীতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে তাসাওউফ তত্ত্ব

ইসলামে অ৭০৭১গ্দ৯াসাওউফ সূফীবাদ নামে পরিচিত। তাসাওউফ শব্দ বুৎপত্তি বাব তাফাউলের ওজনে মুল ধাতু 'সূফ' হতে উৎপন্ন । 'সূফ' অর্থ পশম আর তাসাওউফের অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। অতঃপর মরমীতত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন ইসলামের পরিভাষায় তিনি সূফী নামে অভিহিত হন। [১]

মানুষের জীবনধারাকে তথা কর্মকান্ডকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ্ মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান পেশ ও অনুমোদন করেছেন তারই নাম ইসলামী জীবন বিধান। আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য দীন [২] এবং অন্য যে কোন দীন বা জীবন ব্যবস্থা তাঁর নিকট অগ্রহণযোগ্য।[৩] সার্বিক পর্যায়ে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। ইসলাম একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে, অপরদিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে জগতের অন্যান্য প্রাণী-প্রজাতির সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করে। তাই ইসলামের জীবন ধারা দু'ভাগে বিভক্ত। যাহিরী বা বাহ্যিক (বস্তুগত) এবং বাতিনী বা অভ্যন্তরীণ (আধ্যাত্মিক)। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে জীবনের এই দু'টি দিকের কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন - "আমি তোমাদের জন্য একটি বিধি বা জীবন ব্যবস্থা এবং একটি বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।" [৪] এখানে বিধি-বিধান বলতে জীবনের যাহিরী দিক বা শরীআতের কথা এবং বিশেষ পথ বলতে ইসলামের বাতিনী দিক বা তাসাওউফতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। হাদীসেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন,"আমি নবী করীম (সাঃ) হতে দু'প্রকার ইলম হাসিল করেছি। এক প্রকার সাধারণ ইলম, যা আমি সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেছি। আরও এক প্রকার বিশেষ ইলম যার সবার কাছে প্রকাশ করিনি। যদি প্রকাশ করতাম, তবে আমার গর্দান যেত।" [৫]

সুতরাং দেখা যায় যে, শরীআতের অভ্যন্ত জুড়েই রয়েছে ইলম -ই-তাসাওউফের শিক্ষা। শরীআত ইসলামের যাহিরী বা বাহ্যিক দিকের পরিচায়ক। জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিকের বাহ্যিক রূপের যে বিধি বা নিয়ম তাই শরীআত। অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে, তাকেই শরীআত বলা হয়। আর ইসলামের বাতিনী বা আধ্যাত্মিক দিকের পরিচয় আত্তাসাওউফ। যেমন-একটি গাছের শিকর, গুড়ি, ডাল-পালা, পাতা ইত্যাদি ঐ গাছের শরীআত। আবার ঐ গাছের ফূল, ফল ও জীবনী শক্তি ঐ গাছের অভ্যন্তরীণ দিক বা তাসাওউফ। গাছের শাখা-প্রশাখা, শিকর, গুড়ি, পত্রাদি না থাকলে যেমন ফুল, ফল ও ঐ গাছের জীবন অসম্ভব, তেমনি শরীআত ব্যতিত তাসাওউফের কল্পনাও করা যায় না। শরীআত তাসাওউফের ভিত্তি ভূমি। শরীআত দেহ, তাসাওউফ আত্মা বা প্রাণ। যার মূলে রয়েছে কুরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন।

---

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (১ম খন্ড), পৃ. ৪৯৪
২. আল-কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-১৯
৩. আল-কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-৮৫
৪. আল-কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৪৮
৫. সহীহ্ আল বুখারী, কুতুব খানা রশিদিয়া, দিল্লী, ১৩৩৫হিঃ পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রীয় বাহ্যিক বিধান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিকর মূল্যবান। এ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক হলেন সূফী-সাধকগণ । এ জন্যই ইসলাম যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান সম্পন্ন এমন এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও দর্শন যাতে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। যাহিরী ও বাতিনী উভয় দিকই ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ।[১]

ইলম -ই- তাসাওউফ

ইসলামের ইলম-ই-তাসাওউফ একটা বহুরূপী বিষয়; যাতে বহু বিচিত্র অর্থের সমাবেশ ঘটেছে। এ জন্যই বিভিন্ন সূফীর ক্ষেত্রে এর বর্ণনা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই এর ধরাবাধা কোন সংজ্ঞা দেয়া যায় না। তথাপিও বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী বলেছেন - "তাসাওউফ শব্দটি সাওফ ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর আভিধানিক অর্থ পশমী কাপড় পরিধান করা। আর পারিভাষিক অর্থ সূফী সাধনায় ব্রত হওয়া, তরীকত সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, আত্যোৎকর্ষ সাধনে ব্রত হওয়া, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত হওয়া, আল্লাহ্‌তে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া, আল্লাহতে সমাহিত হয়ে যাওয়া, আল্লাহ্‌র ধ্যানে ব্রত হওয়া, আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্জিত হওয়া, আল্লাহ্‌র স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া, ঐশী গুণে গুণান্বিত হওয়া, আল্লাহ্‌তে বিলোপ হয়ে যাওয়া, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হওয়া, পাশব প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পূত-পবিত্র থাকা, কু-প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি সাধ্যাতিত সাধনায় সফলতা লাভের পর সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক বস্তুতে মহান স্রষ্টার জ্যোতির্ময় সত্তার অবলোকন, আল্লাহ্‌র সন্দর্শন লাভ প্রভৃতি অর্থ সমাহারে যে শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে তাকে বলা হয় তাসাওউফ বা সূফীতত্ত্ব।"[২]

সূফীগণ তাদের এরূপ নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের প্রেরণা লাভ করেন কুরআন মাজীদ থেকে এবং তারা কুরআনের কিছু কিছু বাণীকে ব্যাখ্যা করেন গুপ্ত জ্ঞানের উৎসরূপে। তারা মহানবী (সাঃ) কে প্রথম এবং হযরত আলীকে (রহ.) দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক গুরু ও পথ প্রদর্শক হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। সূফীগণের মতে কুরআনুল কারীমের দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি যারিহী বা বাহ্যিক; অপরটি বাতিনী বা গুঢ় জ্ঞান। সূফীর কার্যকলাপ এবং ইসরার বা গুঢ় রহস্যকে বলা হয় আত্‌তাসাওউফ বা সূফীবাদ। আর এর ভিত্তি ভূমির প্রতি ইঙ্গিত করে সৈয়দ আমির আলী বলেছেন- "যে সূফী দর্শন আধুনিক পারস্য সাহিত্যের জীবন ও আত্মা, তার উৎস হচ্ছে বুযূর্গানে দীনের দ্বারা কুরআন মজীদের আয়াত সমূহের নিগুঢ় তাৎপর্য নিরুপণ। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে অহীর প্রেরণার সম্প্রসারিত উচ্চ অনুভূতির দ্বারা প্রায়শঃ কথা বলতেন, আর তাঁর মুরাকাবার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও ভাববিহবলার যে গভীরতা দেখা যেত প্রধানত তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে মুসলিম অতিন্দ্রীয়বাদ বা ইলমে তাসাওউফ।"[৩] তিনি আরও বলেছেন-"প্রকৃত অতিন্দ্রীয়বাদ বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে অসীমের জন্য উচ্চতর আকাংখা আর তা উদ্ভুত হয় মুসলমানদের "অন্তরের আলোক তত্ত্বের মতবাদ থেকে। ইসলামী জগতে উচ্চতর মনের মধ্যে এই বলে ধারণা রয়েছে যে, কুরআন মজীদের বাণীতে

১. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, বাংলাদেশ ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

২. মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, সূফীতত্ত্বের আত্মকথা, পৃ. ৬৭

৩. সৈয়দ আমির আলী (অনূ. মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান),
দি স্পিরিট অব ইসলাম, ই, ফা, বা, ১৯৯৩ ইং, পৃ. ৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

গভীরতর ও অন্তরতর অর্থ নিহিত আছে, তা ভাষা ও বিশ্বাসের বাহ্য কঠোরতা থেকে বাঁচার প্রয়াস থেকে উৎপন্ন নয়, বরং এই রকম দৃঢ়মূল বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে, সাধারণ ব্যাখ্যাকারীরা যেটুকু অর্থ আছে বলে মনে করেন, কুরআন মজীদের ভাষা তার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যমন্ডিত। এই বিশ্বাস মিলিত হয়েছে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অনুভূতির সঙ্গে, সে এমন একটি অনুভূতি যার সঙ্গে কুরআন মজীদের শিক্ষার আর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর উপদেশ মালার সঙ্গতি রয়েছে আর এই মিলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে সেই ধ্যান মূলক বা আদর্শবাদী দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় সূফীবাদ (ইলমে তাসাওউফ)।"[১]

ইসলামে তাসাওউফ হচ্ছে বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌র জন্য তীব্র ভালবাসার মাধ্যমে আত্মার উন্নয়ন। এর উদ্দেশ্য হল নিজের সত্তা বা আত্মাকে চিনে বিশ্বসত্তা আল্লাহ্‌কে চেনা। "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" (দিউয়ান-এ-আলী)। এই আরাফা থেকে মাআরিফাত। যার অর্থ চেনা-জানা। সুতরাং মাআরিফাত অর্থ আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান ও পরিচয় লাভ এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিগুঢ় মিলন। মাআরিফাত নামে কুরআন মজীদের গুঢ় বা গুপ্ত জ্ঞানকেই সূফীগণ অধিক মূল্য দিয়ে থাকেন।তাঁরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য অন্যান্য পন্থা অপেক্ষা প্রেমের পথকে অধিক ভালবাসেন। প্রেমকেই তাঁরা ধর্মের সারবত্তা ও নির্যাস, সৃষ্টির কারণ ও এর বিস্তৃতির মূল হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রেমই আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনের একমাত্র নির্ভুল উপায়। আর এই প্রেম অর্জনের জন্য প্রয়োজন আত্মার বিশোধন। অন্তরের বিশুদ্ধির মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর জীবনের পরিপূর্ন বিকাশ সাধন করে ঐশীসত্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিরন্তন শান্তি লাভই ইলম-ই-তাসাওউফের শিক্ষা। মহানবী (সাঃ) নির্দেশিত পথে আত্মশুদ্ধির করে ইসলামের বাহ্য ও অন্তর জীবনের প্রেম পূর্ণ বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পরম সত্তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও তাঁর নৈকট্য লাভজনিত রহস্যময় উপলব্ধিকেই বলা হয় ইলম-ই-তাসাওউফ। সূফীদের বাণী ও কর্মধারায়ও এ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে থাকে। যেমন-সাহল বিন আব্দুল্লাহ্ তুস্তারী বলেছেন-"যার অন্তরে সঙ্কোচবোধ ও কুটিলতা নেই, সদা স ৎচিন্তায় বিভোর, আল্লাহ্‌র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক লোভ-লালসা থেকে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং স্বর্ণ ও মৃত্তিকা যার নিকট সমান, সমমর্যাদা ও সমমূল্যের বলে বিবেচিত, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সূফী।" তাঁর মতে, "যিনি স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা ও স্বল্প কথায় অভ্যস্ত এবং জাগতিক মোহ থেকে অনাসক্ত, তিনিই সূফী। আর সূফীকে বিশ্বসৃষ্টির আকর্ষন থেকে বিমুক্ত থাকাই তাসাওউফ।"[২]

জোনায়দ বোগদাদীর মতে,"বস্তুজগতের মোহ থেকে আপন প্রবৃত্তিকে প্রভাবমুক্ত রাখা, বিশ্ব প্রকৃতির ছলনা থেকে বিরত থাকা, ইতর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা থেকে আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখা, মানবিক চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং সমুদয় সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাঁরই মহান অস্তিত্বে নিজের ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়ার নামই তাসাওউস বা সূফী দর্শন।"[৩]

১. সৈয়দ আমির আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

২. Abdul Majid B.A. Tasawof-E- Islam. p

৩. Saiyed Abdul Hai, Muslim Philosophy, Islamic Foundation Bangladesh, 1982, p.142.

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী বলেছেন - "তাসাওউফ মানুষের আত্মার বিশোধনের শিক্ষা দেয়। তার নৈতিক জীবনকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের ভিতর ও বাহিরের জীবনকে গড়ে তুলে। এ বিষয়বস্তু হল আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং তার লক্ষ্য চিরন্তন সুখ-শান্তি অর্জন।" [১]

সুতরাং বুঝা যায় যে, তাসাওউফ বা সূফীবাদ আল্লাহ্‌র প্রেম ও ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের চিন্তাধারা। এ চিন্তাধারা ইসলামের একটি রহস্য আধ্যাত্মিক দিক। এ চিন্তাধারার লক্ষ্য হল আল্লাহ্‌র গুঢ় অনুভূতির অন্বেষণ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান। পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন সাধন ইলম-ই-তাসাওউফের মূল কথা । তাই বলা যায় নৈতিক শৃংখলা, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য কামনার্থে ইসলামে যে মরমী ভাবধারার উদ্ভব হয় তাকে তাসাওউফ বা সূফীবাদ বলা হয়।[২] আর এ (মরমী) ভাবধারা অদ্ভুত কিংবা সম্পূণ অভিনব কিছু নয় এবং তা সব সময় সব সমাজে কিছু কিছু ব্যক্তির মনে কোন না কোনরূপে উপস্থিত থাকে। মনের এ অবস্থার উৎপত্তি ঘটে আল্লাহ্‌র ভয় থেকে। যে ভয় ব্যক্তির মনে ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে উঠে। আত্মানুশীলন ও শৃংখলা চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি এই ভীতিকেই গভীর ঐশী প্রেমে পরিণত করেন। ----- এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়, তা এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে সরাসরি গমন করে। এ জ্ঞান যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রত্যয়গত (Conceptual) জ্ঞান নয়, বরং অনুভূতি ও অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বজ্ঞা প্রসূত জ্ঞান । এমন ধরনের জ্ঞান যা ব্যক্তি মানুষ গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অপরোক্ষভাবে অর্জন করে থাকে।[৩]

তাসাওউফ যে জীবনদৃষ্টির প্রতিষ্ঠিত তাহল সূফীগণ আধ্যাত্মিক বিকাশ লাভের জন্য পার্থিব জগতের সব কিছুকে ভুলে থাকতে চায় এবং কৃত পাপের জন্য অতীতকে অনুশোচনার সঙ্গে বর্ণনা করতে চায়। তাদের মতে, তাদের এ লক্ষ্য শুধু যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না; গভীর ধ্যান ও অনুশীলনের মাধ্যমে যে সূফী তাঁর হৃদয়কে আলোকিত করেছেন, তার আর কোন আলোচনার প্রয়োজন হয়না, বরং তিনি তা পরিহারই করতে চাইবেন। সুগভীর ধ্যানমগ্ন তন্ময় অবস্থায় সূফী এমন এক আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক পেতে চায়, যার সাহায্যে তিনি সত্যের মর্মদৃষ্টি অর্জন করে থাকেন। তিনি সত্যকে উপলব্ধি করেন এবং এর মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকে চান।[৪] তাদের এ তন্ময়বস্থাকে বর্ণনার চেয়ে বেশী অনুতব করা যায়। এটি প্রধানত এমন একটি আবেগাত্মক অভিজ্ঞতা, যা আল্লাহ্‌র ধ্যান ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই এই অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় সত্যের জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র প্রেম অর্জন করা যায়। তা চেতনার এমন এক নিগুঢ় অবস্থা উম্মোচিত করে, যেখানে ব্যক্তিত্ব (Individuality) লীন হয়ে ক্রমশ সীমাহীন ঐশী সত্তায় মিশে যায়। তবে ব্যক্তিত্বের এই বিলুপ্তির অর্থই হল অনন্ত জীবন প্রাপ্তি। মরমী অভিজ্ঞতার গভীরতম পর্যায়ে সূফী যে, মানসিক অবস্থায় উপনীত হয়, তাকে বর্ণনা করা খুবই দুরূহ, কারণ একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই একে উপলব্ধি করা যায়।[৫]

১. Saiyed Abdul Hai. op. cit. p. 143.
২. Syed Mohmudul Hasan, Islam, Islamic Foundation Bangladesh, 1983. P. 306.
৩. Prof. Sayedur Rahman, An Introduction to Islamic culture and Philosophy, Mullick Brothers Dacca. 1963. p. 101.
৪. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. 103.
৫. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. p. 103.

Dhaka University Institutional Repository

সূফীবাদ বা তাসাওউফ আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতির কথা বলে 'যাত্রা' হিসেবে এবং আল্লাহ্‌র সন্ধানকারীকে সালিক বা পথিক হিসেবে অভিহিত করে। এর শিক্ষা হল আল্লাহ্‌র সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান (মাআরিফাত) অর্জনে সেই একমাত্র সত্য যা বস্তুনিচয়ের মধ্য দিয়ে বিধৃত পথিককে পথ প্রদর্শন করে। পরবর্তীকালে পথ ভুলে যাওয়া আত্মা ধীর পর্যায়ে (মাকামাত) এবং বিশেষ কিছু অবস্থার (আহ্‌ওয়াল) অভিজ্ঞতায় আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনের অভিপ্রেত লক্ষ্য পথে (আততরিকাত) সম্মুখে পরিচালিত হয়, যাকে বলা হয় 'ফানা ফীল হাকীকত' বা পরম মূলের সঙ্গে মিলনে স্বকীয় সত্তার বিনাশ।[১]

সূফীগণ অদৃশ্য পরম প্রেমময়ের সঙ্গে মিলনের বা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার (ফানাফীল্লাহ) পূর্বে চারটি অবস্থায় ভিতর দিয়ে গমন করেন। যেমন -

(ক) ঈমান ঃ অদৃশ্য বস্তুর প্রতিবিশ্বাস,

(খ) তলব ঃ অদৃশ্য বস্তুর অনুসন্ধান;

(গ) ইরফান ঃ অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ;

(ঘ) ফানাফীল্লাহ্‌ ঃ অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে বিলীন হওয়া।

সূফীদের প্রথমে গায়েবী জগত বা মানুষের সাধারণ জ্ঞানের অগোচরে অদৃশ্যমান জগত সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হয়। এ অদৃশ্য জগত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তাঁর অস্তিত্ব ও নিগুঢ় তত্ত্বের প্রতি অটল বিশ্বাস (ঈমান) অপরিহার্য। তারপর ঈমান যখন শক্ত হল, অদৃশ্য বস্তুর পূর্ণ অস্তিত্ব বা নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ বা দ্বিধা দূর হল, তখন জ্ঞানকে পরিপূর্ন করতে হলে বিশ্বাস্য বস্তুর অনুসন্ধ্যান আবশ্যক। তার পক্ষে এটিই স্বাভাবিক। একটি বস্তুতে তার বিশ্বাস কেন্দ্রীভূত। তাকে সে অনুভব করে হৃদয় দিয়ে কিন্তু তার গুঢ় রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে মর জগতের মানুষ হয়ে কোথায় সেই অদৃশ্য বস্তুর খোঁজ পাবে ? সূফী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন- পাহাড় পর্বত বা জঙ্গলে সন্ধান করলে তাঁকে পাওয়া যাবে না, তাকে অনুসন্ধান করতে হবে এ পৃথিবীতে এবং তার নিজের মধ্যেই।[২] মাওলানা রুমীর কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি হয়েছে এভাবে-[৩]

"ক্রুশ ও খৃষ্টান জগত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম
তিনি ক্রুশের উপরে নহেন।
পুজামন্ডপ, প্রাচীন বৌদ্ধ মঠে গমন করিলাম
সেখানেও তার সাক্ষাত মিলিল না।
হিরাত ও কান্দাহারের পর্বত অনুসন্ধান করিলাম
তিনি সেই পর্বত উপত্যকার মধ্যে নাই।
আমি আমার ক্বলবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম,
তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম-তিনি অন্য কোন খানে নাই।"

---

১. J.A. Sobhan, Sufism: Its Saint and Shrine, p. 65.

২. গোলাম সাকলায়েরন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪.

৩. উদ্ধৃত ঃ ডঃ রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া ১৯৮১ ইং, পৃ. ৩৪৯

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং এ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি রহস্যের ভেতর দিয়েই সেই অদৃশ্য বস্তুর ইশারাকে বুঝতে হবে। এভাবে সৃষ্টি রহস্যের বিষয় চিন্তা করতে করতে এবং তৎপশ্চাৎ অদৃশ্য বস্তুর ধ্যান-ধারণা ও সাধনা করতে করতে সূফীর হৃদয় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন তিনি হঠাৎ জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাকে দেখতে পান এবং উপলব্ধি করেন যে, তার সেই বাঞ্ছিত অদৃশ্য বস্তু এখন আর অদৃশ্য নয়। এই উপলব্ধিই 'ইরফান' (জ্ঞান লাভ) । অতঃপর সূফী সাধনা বলে জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হন, তখন তিনি তার নিজের সত্তার ও অদৃশ্য বস্তুর সত্তার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পান না। আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

"হরকে হরকে 'লা ইলাহা' আজবর কুন্দ
আল মেরা গোম বখেশ আন্দর কুনদ।"[১]

সাধকের প্রাণে যখন 'লা ইলাহার' মন্ত্র কণ্ঠস্ত হয়ে যায়, তখন সমুদয় বিশ্ব তার মধ্যে হারিয়ে যায়। এ বিশ্ব তার করায়ত্ব হয়ে যায়।

এ সময় সাধক স্রষ্টা ব্যতিত অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে কিনা, এমন কি নিজের অস্তিত্ব ও সত্য কিনা তাও ভুলে যান। এ সময়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিভেদ রেখা মুছে যাওয়ায় সূফী স্বয়ং অদৃশ্য বস্তুতে বিলীন হয়ে গেছেন বলে মনে করেন। এই প্রজ্ঞার অবস্থায় সূফী বলে উঠেন - 'আনাল হক' বা আমিই সত্য।

সূফী শব্দের উৎস

সূফী শব্দটি সাধারণত ইসলামের মরমীবাদী ও সাধু পুরুষদের নামের সঙ্গে জড়িত। সূফী নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মত প্রচলিত রয়েছে। ইবনে খালদুন, আলকালাবাদী, আররুদবারী প্রমুখের মতে, সূফী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে আরবী 'সূফ' শব্দ থেকে যার অর্থ পশম । যিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে নিরাসক্ত জীবনের প্রতীক হিসেবে পোশাক পরিধান করেন তিনিই সূফী।[২] পশমী কাপড় ধর্ম প্রচারক সাধু ব্যক্তিদের প্রিয় পোশাক। মহানবী (সঃ)এর সময় বিশেষ করে ইসলামের প্রথম দু'শতাব্দীর মধ্যে দরিদ্র সাধারণ লোক ও সংসার ত্যাগী সাধু ব্যক্তিগণ মোটা কর্কশ পশমী বস্ত্র ব্যবহার করতেন। সংসার ত্যাগী ব্যক্তিদের অনেক সময় 'পশমী বস্ত্রধারী' বলা হত। পরবর্তীকালে সাংসারিক ভোগ-বিলাস, কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে সাধু জীবন যাপন করলে তাকে বলা হত সূফী বা পশমী পরিধানকারী। অতঃপর যখন এরূপ জাগতিক সুখে বিরাগী পবিত্র সাধু উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তখন তারা সূফী নামে পরিচিত হয়।[৩] ইসলামী বিশ্বকোষে ও এমত স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।[৪]

---

১. উদ্ধৃত ঃ গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২. Sayed Abdul Hai. op. cit. p.১৪০

৩. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দীন রুমী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪ইং, পৃ. ২

৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড), পৃ. ৪৯৪

Dhaka University Institutional Repository

এমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এতে সূফীদের অবয়ব ও পোশাকের প্রতিই বেশী ইঙ্গিতবহ। পশমী পোশাকধারী সূফীর সংখ্যা ইতিহাসে বিরল। কোন কোন সূফী পশমী পোশাক পরিধান করলে থাকলেও তা উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে পরেছেন এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই তাসাওউফ যেহেতু বাতিনী দিকের পরিচায়ক, সেহেতু শুধু বাহ্যিক অবয়বের নির্দেশক সূফ বা পশম থেকে সূফী শব্দের উদ্ভব হয়েছে একথা বলা যায় না। সূফী সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায়- সূফীগণ বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কলাপ অপেক্ষা অন্তরের পবিত্রতা এবং সাংসারিক ভোগ-সুখ অপেক্ষা দরিদ্রের মত বৈরাগ্যময় সাধু জীবন যাপনই অধিকতর কাম্য মনে করতেন। তাই পশমী বস্ত্র পরলেই সূফী হয়না। অন্তরের পবিত্রতা সূফী নামের জন্য অধিকতর প্রয়োজন।[১]

তাই মোল্লাজামী ও তাঁর অনুসারীদের মতে, 'সাফা' অর্থাৎ পবিত্রতা শব্দটি থেকে সূফী শব্দটি এসেছে। যারা সাংসারিক নানা পাপ হতে মুক্ত এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, কেবল তারাই সূফী নামে অভিহিত হতে পারে। কেননা, আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধনা হল তাসাওউফের লক্ষ্য। এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য প্রয়োজন আত্মিক পবিত্রতা। তাই সূফীগণ এ পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করেন বলে তাদেরকে সূফী বলা হত।[২] এ মতও অসম্পুর্ণ; তাই - তা গ্রহণ করা যায় না। কেননা, এ মতবাদ সূফী জীবনের একটি মাত্র দিকের পচিায়ক।[৩]

অন্য একটি মতানুসারের সূফী শব্দের উৎস আরবী 'সাফ' শব্দ। এর অর্থ সারি, কাতার, পংক্তি। আর সূফীগণ জ্ঞান, পবিত্রতা, সাধনার দিক দিয়ে সাধারণ লোকজনের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন বলে তাদেরকে সূফী বলা হয়।[৪] এ মত কল্পনা প্রসূত, তাই এমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অধ্যাপক নিকলসনের মতে, ইহা 'সূফ'[৫] অথবা পশম অর্থাৎ অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা, আহল-ই-সূফফা অর্থাৎ মদীনা মসজিদে বসবাসকারী সাহাবীগণ, বেদুইন গোত্র বানু সূফফা, সাফানা নামক এক প্রকার শব্জী, সাফওয়াত বিন আল কিফা এবং ঘাড়ের নিকট একগুচ্চচুল, সর্বোপরি 'সফিস্ট' নামধারী গ্রীক দার্শনিক গোষ্ঠী।[৬]

সূফী শব্দের উৎস সম্পর্কে অধ্যাপক নিকলসন সাহেব যে সকল শব্দের কথা বলেছেন - তার যথার্থ প্রমাণ তিনি উপস্থাপন করতে পারেনি। সর্বোপরি 'সোফিস্ট' এই বিদেশী পরিভাষার শব্দটি যে ইসলামী সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে এ দাবীর সপক্ষে ও তিনি কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। কাজেই এ দাবী প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

---

১. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
২. মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২
৩. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
৪. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৫. আল-কুরআন, সূরা -১৬, আয়াত -৮৬
৬. R.A. Nicholson, Mystics of Islam, p.35.

Dhaka University Institutional Repository

এস,এম, নদভীর মতে, 'আহল-ই-সূফফা' শব্দ হতে সূফী শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। নবী করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবা সর্বদাই মসজিদ-ই-নববীতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। পার্থিব জীবনের প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষন ছিল না। তাদের সংখ্যা ছির প্রায় পাঁচশত জন। দরিদ্র ছিল এদেরে ভুষণ। তারা জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র আরাধনায় সময় কাটাতেন। এ জন্য তাদেরকে 'আহল-ই-সূফফা' বা বারান্দার অধিবাসী বলা হত। এই আহল-ই-সূফফা থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি।[১]

সুতরাং দেখা যায় যে, তাসাওউফ বা সূফী জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক ফুটে উঠেছে একমাত্র 'আহল-ই-সূফফা'দের মধ্যেই। তারাই দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করতেন। বস্ত্রাভাবে পশমী পোশাক পরিধান করতেন। সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যাপৃত থাকতেন। তারাই নবী করীম (সাঃ) এর সাহচর্যে থেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানে জ্ঞানবান হয়েছিলেন। কাজেই 'আহল -ই- সূফফা' থেকে সূফী শব্দের উৎপত্তি ও সূফীতত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাব প্রকাশ পেয়েছে- সার্বিক বিচারে এমতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

সূফী অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য

সূফী অভিজ্ঞতার জটিলতা ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেকেই এর স্বাধীন আলোচনা এড়িয়ে যেতে চান। এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হয় তা এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে সরাসরি গমন করে । এ জ্ঞান যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমপ্রত্যয়গত জ্ঞান নয়,বরং অনুভূতি ও অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বজ্ঞা প্রসূত জ্ঞান। এ জ্ঞান ব্যক্তি মানুষ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অপরোক্ষভাবে অর্জন করে থাকে। আল্লামা ইকবাল এ সব অভিজ্ঞতার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ

প্রথমতঃ সূফী অভিজ্ঞতা সাক্ষাত, অনুমান জাত বা পরোক্ষ নয়। এ অভিজ্ঞতা বাস্তব সত্তার অব্যাবহিত (Immidiat) ও অপরোক্ষ (Direct) প্রতীতিস্বরূপ। তা বুদ্ধি প্রসূত জ্ঞানের চেয়ে ভিন্নতর। কারণ বুদ্ধি প্রসূত জ্ঞান ব্যবহিত ও পরোক্ষ । অর্থাৎ মানুষের অন্যবিধ অভিজ্ঞতা যেমন জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে, সূফী অভিজ্ঞতাও তেমন জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে। বস্তুত সকল অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষ। বহির্জগতের জ্ঞানের জন্য যেমন আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলো ইন্দ্রিয় নির্ভর বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের জন্য তেমনি মরমীয় অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মরমীয় অভিজ্ঞতার অব্যবহিতত্ত্ব বা প্রত্যক্ষতার অর্থ হল আমরা অন্যান্য বস্তুকে যেমন জানি, আল্লাহ্‌কেও তেমনি জানি। আল্লাহ্‌ কোন গাণিতিক সত্তা ও বা পরস্পর সংযুক্ত কোন মৌলিক বস্তু কিংবা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ধারণা নয়।[২]

এ অভিজ্ঞতা আবার প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান থেকেও পৃথক। প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান খন্ডধর্মী এবং তাতে সংবেদনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। স্বজ্ঞা প্রসূত অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি সমগ্র বাস্তব সত্তাকে এক সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারেন। এটা সমগ্র সত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।[৩]

---

১. S.M.Nadvi, Mustim Thought and its sourse, p.71.

২. Sir.Md. Iqbal, bhe Reconstruction of Religious thought in Islam, Lahore, 1965. p. 19.

৩. Dr. Ishrat Enver. Metaphysiscs of Iabal. p. 17.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ সূফী অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণধর্মী নয়। এ অভিজ্ঞতা অবিভাজ্য সমগ্রতা । এ ধরণের অভিজ্ঞতায় পরমসত্তা আল্লাহ্ সমগ্রতা নিয়ে হাজির হন - এ অবস্থায় কর্তা ও কর্মের ব্যবধান থাকে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য অনুভব করি, সূফী অভিজ্ঞতায় তেমন পার্থক্য অনুভূত হয় না। কারণ এখানে চিন্তা অত্যন্ত গৌণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক মিশ্রিত হয়ে এক অখন্ড ঐক্যে পরিণত হয়। ফলে এ ধরনের অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের সুস্পষ্ট ভেদ রেখা অপসৃত হয়। [১] মজীদ আলী খানের ভাষায়-"In mystic state, however vivid and rich it may be, thought it revealed to a mininum and such an analysis is not possible as we can do in the observation of materialistic things. As against the ordinary consciousness, which takes Reality in picemeal and selects successive insolated sets of stimuli for response, the mystic state brings us into contact with the total passage of Reality in which all the diverse stimuli merge into one another to form a single unanalysable unity in which the ordinary distinction of subject does not exist."[২]

তৃতীয়ঃ সূফীর কাছে ভাবাবিষ্ট অবস্থা মুহূর্তের জন্যে ব্যক্তিগত সমস্ত অভিজ্ঞতা অতীত এক অতুলনীয় অন্য সত্তার ঘনিষ্ট সঙ্গ লাভ ঘটে। এ সময় মরমী ব্যক্তির সমস্ত সত্তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। তাই বলে এ অভিজ্ঞতা আত্মগত নয়। অভিজ্ঞতার বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে এ ধরনের অভিজ্ঞতা বিষয়নিষ্ঠ। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আত্মগত হলে আমাদের নিজেদের সত্তা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারতাম না। আল্লামা ইকবাল বলেন- "আমরা আমাদের সত্তা সম্পর্কে সচেতন, অন্তর্দর্শন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে আমরা ইহা জানতে পারি। কিন্তু অন্যের সত্তা বা অপরের মনকে জানবার জন্য স্বতন্ত্র কোন ইন্দ্রিয় নেই। আমরা নিজেদের দৈহিক সঞ্চালনের ভিত্তিতে অন্যের সচেতন সত্তার অস্তিত্বের অনুমান করি।[৩] "------ And as such mystic experience is highly objective and cannot be regarded as a mere retirement into the mists of purc subjectivity. We infar the presence of another conscious being through inner reflection and sense perception. Similar is the case of Mysitc experience. A true mystic experience is always responded, because the response is the test of the presence of a conscious self."[৪]

---

১. Sir, Md. Iqbal, op. cit. p.19

২. Majid Ali Khan, Islam on Origin and Evolution of Life, Delhi, 1978. p. 46.

৩. Sir Md. Iqbal, op. cit. p.20.

৪. Majid Ali Kham. op. cit. p. 46-47.

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের মতেও সচেতন সত্তার পরীক্ষা হয় এ জবাব বা প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ্ বলেন

(ক) "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।" [১]

(খ) "যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি তাদের নিকটবর্তী হই এবং আমার কাছে যে কাতরভাবে প্রার্থনা করে তার প্রার্থনার জবাব আমি দান করি।" [২]

চতুর্থত ঃ সূফী অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ (Direct)। কাজেই এটা যোগাযোগ রহিত। এ অভিজ্ঞতা চিন্তার চেয়ে অনুভূতির ব্যাপার। সূফী কিংবা নবীগণ তাঁদের এ অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করতে পারেন বটে, কিন্তু তা অন্যের নিকট অবিকল প্রবিষ্ট করাতে পারেন না। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "আর ইহা মানুষের জন্য স্বাভাবিক নয় যে, আল্লাহ্ ওহী দ্বারা অথবা পর্দার অন্তরাল হতে অথবা আল্লাহ্র মরজী মোতাবেক আল্লাহ্রই আদেশ নাযিল করার জন্য রাসূল প্রেরণ ব্যতিত তাদের সাথে কথা বলেন। নিশ্চয় তিনি মহিমান্বিত ও বিজ্ঞানময়।" [৩]

এ অভিজ্ঞতা হল অব্যক্ত অনুভূতির ব্যাপার। বুদ্ধিগত বিচারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অন্য সকল অনুভূতির মত অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিরও একটা জ্ঞানাত্মক উপাদান আছে। এ অনুভূতির প্রকৃতি হল-এটা ধারণার মধ্যে ব্যক্ত হতে চায়। তাই এ অনুভূতির শেষ হয় সীমানার বাইরে, বিষয়ের চেতনায়।[৪] হকিং তাই বলেছেন-"ধারণা যেমন বহিঃপ্রকাশী, অনুভূতি তেমনি বহির্গামী। আর কোন অনুভূতিই এমন অন্ধ নয় যার নিজের বিষয়বস্তুর কোন ধারণা নেই।" [৫]

পঞ্চমত ঃ সূফী অভিজ্ঞতায় চিরন্তনতার এক নিবিড় অনুভূতি জন্মে। এটা ক্রমিক সময়ের অবাস্তবতার ধারণা দিলেও ক্রমিক সময়ের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে না। অনন্যতার দিক দিয়েও সূফীর তন্ময়তা সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্ক শূন্য নয়। কারণ সূফীদের অতীন্দ্রিয়ভাব শিঘ্রই কেটে যায়; দীর্ঘক্ষণ তা স্থায়ী হয়না। সাধক তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেন। পরম সত্তার সাথে মিলনের তন্ময়তা ক্ষনস্থায়ী হলেও সূফীর চেতনার উপর তার গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৬] মজিদের ভাষায়-"Though a mystic establishes his intimate association with the eternal, yet the mystic state in respect of its uniqueness remans in some way related to common experience. This is clear from the fact that the mystic state soon fades away, though it leaves a deep sense of authority after it has passed away."[৭]

১. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৫২.
২. আল-কুরআন, সূরা-৪০, আয়াত -৬০.
৩. আল-কুরআন, সূরা-৪২, আয়াত-৫২.
৪. ড. মুহাম্মদ কুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৫. Sir. Md. Iqbal, op. cit. p.21.
৬. Sir. Md. Iqbal. op. cit. p.23.
৭. Majid Ali Khan. op. cit. p. 48.

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যায় যে,পরম সত্তাকে জানার বিভিন্ন পথ রয়েছে। বহিঃ প্রত্যক্ষের সাহায্যে সাধারণ লোক বাহ্যজগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এ ধরনের জ্ঞানে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। আর এটা বহিঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের লৌকিক পন্থা। সূফীগণ আন্তঃপ্রত্যক্ষের সাহায্যের পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করেন। কুরআনের মতে, হৃদয় একটা জ্ঞান লাভের শক্তি। হৃদয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায় সে জ্ঞান বহিঃ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। হৃদয়ের উপলব্ধি যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হয় তবে তা সত্য হয়ে থাকে। তবে এ উপলব্ধির জন্য হৃদয়কে প্রবৃত্তির আবিলতা ও জঞ্জাল হতে মুক্ত রাখতে হয়। তাই সূফীগণ হৃদয়ের পবিত্রতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

কাজেই দেখা যায় যে, সূফী অভিজ্ঞতা কোন অসাধারণ বা অলৌকিক অভিজ্ঞতা নয়। ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা যেমন বহিঃ প্রত্যক্ষের জন্য প্রয়োজন মস্তিষ্কের সুস্থতা যেমন চিন্তার জন্য প্রয়োজন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা কাশফের জন্য তেমনি হৃদয়ের সুস্থতা অপরিহার্য। প্রবৃত্তির উদ্দাম আবিলতা হতে হৃদয়কে মুক্ত করতে পারলে এবং হৃদয়ের শক্তি অনুশীলন করলে সাধারণ লোকও সূফীর উপলব্ধি লাভ করতে পারে। মানুষের জ্ঞানের পরিকল্পনায় ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞার যেমন এক একটা সুর্নিদিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, ক্বলব্ বা হৃদয়ে তেমনি সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা ও হৃদয় এই তিন-এরই ক্রিয়ার সীমানা রয়েছে- সীমানার বাইরে গেলে তারা অচল। তবে এদের মধ্যে বিরোধ নেই। [১]

তাসাওউফ দর্শন

সূফীদের মতে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি আত্মাকে সার্বিক আত্মায় মিশিয়ে ফেলা। ব্যক্তি সত্তার চেতনার বিলোপ এবং স্বর্গীয় সত্তায় অব্যাহত অস্তিত্ব তাসাওউফের লক্ষ্য। তাই তাসাওউফ ইসলামের বাতিনী দিকের পরিচায়ক। শরীআত এর সামাজিক বিধি-বিধানের নির্দেশক। পরম সত্তাকে চেনার ও জানার আকাংখা মানুষের চিরন্তন। মানুষ তার মনের আকাংখা চরিতার্থ করার মানসে তার হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমসত্তার সন্ধান লাভ করে যার সাথে নিবিড় যোগসূত্রে সে মিলিত হয়। তার এই পরম সত্তা আল্লাহ হলেন প্রেমময়। তিনিই একমাত্র সত্তা, জগত তার পরম সুন্দরের বহিঃপ্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু আল্লাহ হতে নিঃসৃত। সমস্ত বস্তুতে তার মহিমা বিচ্ছুরিত। এজন্য আল্লাহ পরম দয়ালু, তিনি সকল প্রেম ও সমস্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের। প্রেমই ধর্ম। আল্লাহর প্রেম লাভই মানব জীবনের পরম সম্পদ। আল্লাহর প্রেমে শক্তিশালী হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য। প্রেমের মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের অন্তঃস্থলে তার প্রেমাস্পদের উপলব্ধি করে। তিনি তার মাহবুবের অন্তরের আহবানে সাড়া দিয়ে থাকেন।

তাসাওউফ চিন্তাধারার মূল সুরই হল আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ-ই এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। যা কিছু দৃশ্যমান ও প্রকাশমান সবই তাঁর বিকশিত রূপমাত্র। এ বিশ্বজগত সেই পরম সুন্দরের প্রকাশ সব কিছু তার থেকেই নিঃসৃত হয়েছে এবং জগতের সব কিছুতে তাঁরই মহিমা, তাঁরই গুণ ও সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত। এ পরম

১. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

সত্যটি যখন একজন মানুষের গভীর উপলব্ধিতে আসে তখন তিনি তার প্রাণের কোণে এক অজানা শূণ্যতা উপলব্ধি করেন। সে শূণ্যতাকে নিয়ে যায় গভীরে যেখানে সে দেখতে পায় ব্যথা ও হাহাকার। জীবনের প্রতিটি হিয়ায় হিয়ায় জগতের সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি দেখতে পান এক পরমসত্তার সৌন্দর্য ও মহিমা। সেই সৌন্দর্য ও মহিমাই তাকে জানিয়ে দেয়-অনন্তের সাথে তার আত্মীয়তা রয়েছে।[১] এজন্য পরমাত্মার সাথে মিলনের জন্য মানবাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠে । সূফীদের মতে, মানুষ সৃষ্টির চরম কারণ নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে পরমসত্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। ঐশী চিন্তায় মানুষ প্রথম উদিত হয়েছিল এবং বিবর্তনের শেষ স্তরে তার আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথম সৃষ্টি সার্বিক প্রজ্ঞা, যা সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতায় মহিমামন্ডিত করেছে। জগতের সমুদয় বস্তুর স্তরে স্তরে নিঃসৃত হয়েছে। তাসাওউফ মানুষকে একটি ক্ষুদ্র জগত বলে অভিহিত করেছে।[২] সূফীরা কুরআন ও হাদীস হতেই তাদের মতের মতবাদের ভিত্তি গ্রহণ করেছে।

তাসাওউফবাদ অনুসারে, জগতের সবকিছুই থাকে আল্লাহর সত্তায়, সব কিছুই আল্লাহর প্রকাশ স্বরূপ। সূফীগণের অধিকাংশই আশাবাদী। তাদের মতে, এজগত সর্বোৎকৃষ্ট জগত, এখানে অশুভের কোন বাস্তবতা নেই। আমরা যাকে অশুভ বলি আসলে তা একটি অসত্তা। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আসলে এ জগতে অশুভ বলে কিছু নেই। সবকিছুই পরিণামে শুভ ও কল্যাণকর। যা অশুভ ও অকল্যাণকর বলে প্রতিভাত হয়, তা নিতান্তই একটি আত্মগত ব্যাপার। এটা এমন ব্যাপার যার কোন অস্তিত্ব নেই।[৩] চেতনা যখন ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উন্নীত হয় তখন মানুষ কোন অশুভ, অমঙ্গল বা অনিষ্ট দেখতে পায় না যতক্ষণ মানুষ অহং দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অশুভ শক্তির অস্তিত্ব অনুভাব করে। কিন্তু ঐশী আলোকে আলোকিত মানুষ অশুভের কোন অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেনা। সে জগতব্যাপী আল্লাহর অভিব্যক্তি দেখতে পায়। তাই তাসাওউফ শিক্ষায় আত্মিক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।[৪] সূফীগণ আত্মার উন্নয়ন ও বিকাশে বিশ্বাসী। তাদের মতে, আত্মার উৎপত্তি ঘটেছে এক ঐশী আদিনিবাস থেকে। ভাগ্যচক্রে তা সেখান থেকে অধঃপতিত হয়েছে। সুতরাং আদি পবিত্রতা পূণরুদ্ধার করতে হলে তাকে অবশ্যই বেশ কয়েকটি পর্ব অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু এ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কী? আল-কুরআনে বলা হয়েছে-"আত্ম তোমার প্রভূ আল্লাহর আদেশ স্বরূপ।"[৫]

"আমরা তার (মানুষের) মধ্যে আমাদের নিজেদের আত্মাকে প্রবিষ্ট করে দিয়েছি।"[৬] অবশ্য আত্মা ও চিদাত্মা (Spirit) এ দু,টি কথাকে ভিন্ন অর্থে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে- দেহ একটি মাংস পিন্ড এবং এই পিন্ডের মধ্যেই রয়েছে ক্বলব বা মন। মনে রয়েছে কল্পনা (প্রজ্ঞা) এবং এই কল্পনাই রয়েছে চিদাত্মা। চিদাত্তায় রয়েছে গুপ্ত জ্ঞান এবং গুপ্ত জ্ঞানেই রয়েছে আত্মসত্তা বা আমি (আনা)। এই আমি বা অহং নিম্নতম

১. ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
২. ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫০
৩. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. p. 124-25.
৪. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০
৫. আল-কুরআন, সূরা -১৭, আয়াত-৮৫
৬. আল-কুরআন, সূরা-১৫, আয়াত-২৯

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ের প্রতিভাস নয়। এটি আত্ম সচেতন বাস্তব সত্তারই একটি চেতনা। এখানে বিষয়ী (Subject) এবং বিষয় (Object) এর কোন দ্বৈততা নেই। এই আমি পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে পূর্ণ মানুষে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ। ইতর প্রাণীদের অহং মানুষের অহমের চেয়ে নিম্নতম; এজন্য শুধু মানবাত্মাই সার্বিক আত্মাকে দেখার ক্ষমতা সম্পন্ন।[১]

কোন কোন সূফীর মতে, আত্মা এমন একটি আলোক (নূর), যা দেহের কোন একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে না থেকেও গোটা দেহকে আলোকিত করে। এ আত্মার চারটি পর্যায় রয়েছে। যথা রূহ-ই-নামা (উদ্ভিদাত্মা), রূহ-ই-মুতাহরিকা(প্রেষণাত্মা), রূহ-ই- নাতিকা (বৌদ্ধিকাত্মা), রূহ-ই-কুদসিয়া (পবিত্রাত্মা)। সবশেষে উল্লেখিত আত্মাটিকে বর্ণনা করা হয়েছে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত (অহী) চিদাত্মা বলে। অতীতে সে কী ছিল এবং ভবিষ্যতে কী হবে তা সে জানে এবং তা আল্লাহর ক্রিয়াপরতারই ফল।

রূহ্ ব্যতীত আর একটি শক্তি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান তা হল নফস। রূহের আকর্ষণ আল্লাহর দিকে আর নফসের আকর্ষণ পার্থিব জগতের দিকে। মানুষ এই দ্বিবিধ শক্তির মোকাবেলার কেন্দ্র। সূফীগণকে আত্মিক বিবর্তনের উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে থাকেন তা হল নফসের ক্রমবিবর্তন। রূহ ঐশী শক্তি, আল্লাহর আদেশ, এর কোন পরিবর্তন নেই। নফস নিম্ন লিখিত স্তরসমূহ অতিক্রম করে-প্রথমটিকে বলা হয় নফস-ই-আম্মারা অর্থাৎ অন্যায় ও অশুভ প্রবণ নফস। এটা মানুষকে অমঙ্গলের দিকে পরিচালিত করে এর পূর্ণতার পথ থেকে সরিয়ে রাখে। এটা তাকে নিম্নতম পাশবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য করে। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় নফস-ই-রাহমানি (উচ্চতর আত্মা), যা নিম্নতম প্রবণতা ও প্রবৃত্তি সমূহকে দমনের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করে। তৃতীয়টিকে বলা হয় নফস-ই-মুলহিমা (অহীপ্রাপ্ত আত্মা), যা নিজের উপর নিজে কল্যাণ বর্ষন করে। চতুর্থটিকে বলা হয় নফস-ই-মুতমাইন্না (পরিতুষ্ট আত্মা), যা আল্লাহতে স্থায়ী অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটাই নফসের সর্বোচ্চ নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ পর্যায় এবং এখানে আত্মা আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাকে ছাড়া থাকতে পারে না। এ পর্যায়ে আত্মা আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রেমের বন্ধনে এবং স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকে তার প্রেম।[২]

ইলম-ই-তাসাওউফে জ্ঞানতত্ত্বের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনটি পথে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে থাকে-ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রজ্ঞা ও অতীন্দ্রিয়ানুভূতি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেননা, পরমসত্তা দৈহিক কিংবা বস্তুগত সত্তা নয়। চিন্তার আকার ও প্রকার সমূহ আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দান করতে পারে না। সূফীগণের মতে, অতীন্দ্রিয় (কাশফ) অনুভূতির মাধ্যমেই পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়। এজন্য তারা কাশফের উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে থাকেন।[৩] অবশ্য এ ব্যাপারে তারা অহীর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না।

---

১. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. p. 115.

২. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. p. 115.

৩. Saiyed Abdul Hai. op. cit. p. 145-46

Dhaka University Institutional Repository

সূফীদের পথ পরিক্রমা

সূফীগণ আত্মার উন্নয়ন ও বিকাশে সর্বাধিক জোর দিয়ে থাকেন। আল্লাহর সন্দর্শন লাভ ও তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাওয়াই সূফী জীবনের পরম লক্ষ্য। তাই সূফীগণ মনে করেন যে, মানুষ জীবিত অবস্থায়ই আল্লাহর অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে পারে। আবার পরলোকেও আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে থাকে। বস্তুতঃ মানবাত্মা পরমাত্মা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলন অবশ্যম্ভাবী। তবে এ মিলন সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। ইপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সূফীকে অনেক ত্যাগ-তীতিক্ষা, কষ্ট-ক্লেশের মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে বিনয়াবনত চিত্তে পথ অতিক্রম করতে হয়। সূফীর এই যাত্রাপথে নিম্নোক্ত মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয়।

শরীআত

শরীআত সূফীর যাত্রাপথের প্রথম স্তর। শরীআত শব্দটি 'শরা' (পথ) হতে উদ্ভুত হয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে শরীআত বলা। ইসলাম কতগুলো মৌলনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি জীবনকে সুষ্ঠ ও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) নির্দেশিত বিধি-নিষেধ পালন করতে হয় এবং তাঁর মাধ্যমেই গড়ে উঠে সত্যিকার মুসলিম জীবন, সে জীবন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পিত। ইসলামী পরিভাষায় এসব কাণুন ও বিধি-নিষেধকে বলা হয় শরীআত।

আল্লাহ স্বয়ং ইসলামী কানুন রা বিধানের রচয়িতা এবং সেই কানুন মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পথ নির্দেশ করে। আল্লাহ বলেছেন "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে মেনে চল, রাসুলকে মেনে চল, আর তোমাদের চালক ও নেতাদের। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিষয়ে মীমাংসার সূত্র আল্লাহর ও রাসূলের বাণীতে অন্বেষণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস কর। এটাই কল্যাণ কর ও শ্রেষ্ঠতম মীমাংসা।" [১] শরীআত হচ্ছে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং এর সাহায্যে মানুষ দুনিয়ায় তার জীবনকে সঠিক পথে চালিত করতে এবং নিজেরকে ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে।[২] ইসলামী বিধানের রচয়িতা আল্লাহ। তাই শরীআতের যাবতীয় বিধান আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আদেশ-নিষেধের প্রকাশ। এর বিধানাবলী মেনে চলা ঈমানের অন্যতম শর্ত এটা সমাজিক কর্তব্য ও বটে। শরীআতের কোন বিধানের খেলাফ করা পাপ ও অপরাধ। শরীআত মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধি, সকল কার্যের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মাপকাঠি। মানুষের জন্য ভাল-মন্দের কার্যাবলী শরীআতই নির্ধারণ করতে পারে। শরীআত মানুষের বাহ্যক্রিয়াবলীর ভাল-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার করে। শরীআত মানুষের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করে না। শরীআত মানব কর্তব্য সম্পর্কে নির্ভুল মতবাদ এবং এতে ইসলামের অনুসারীদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিকের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা রয়েছে।[৩]

---

১. আল-কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-৫৯

২. অধ্যাপক কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতিক ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৭৯ইং, পৃ. ৫২

৩. অধ্যাপক কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

সূফী সাধকগণ শরীআতকে তরীকাতপন্থীর আধ্যাত্মিক পথের প্রাথমিক স্তর বলে মনে করেন। শরীআত সূফীর আধ্যাত্মিক পথ পর্যটনের প্রথম ও অপরিহার্য স্তর। শরীআত ব্যতিত মাআরিফাত অসম্ভব। ইহা পার্থিব জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। মুসলিম জাতির ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনের সকল দিকই শরীআতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-

(ক) আল্লাহর অধিকার

(খ) মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার

(গ) মানুষের সামাজিক অধিকার এবং

(ঘ) জগতের অন্যান্য জীবের অধিকার।

(ক) আল্লাহর অধিকারঃ

শরীআতে আল্লাহর অধিকারকে হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক বলা হয়। সর্বগুণ ও সর্বশক্তির আধার মহিমান্বিত স্রষ্টা আল্লাহর সকল গুণ ও শক্তির সাথে অংশীদার না করা, স্রষ্টার নিকট একান্ত আত্ম সমর্পন ও স্রষ্টার আদেশ-নির্দেশ মত হালাল-হারামের বিধান মান্য করে জীবন যাপন, সর্বোপরি সর্বদা তাঁর স্মরণ ও সর্ব কাজে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন এটাই হল হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক। মানুষের উপর আল্লাহর প্রথম অধিকার হল আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি প্রেরিত রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের পথ চলার নির্দেশাবলী পাঠিয়েছেন। তিনিই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে তাঁর নির্দেশাবলী ও হুকুমসমূহ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর কালাম কুরআন এবং হযরতের জীবনাদর্শ ও নির্দেশাবলী-সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য। এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত -

১. "এক ইলাহ; তিনিই তোমাদের ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনি পরম দয়ালু ও দাতা।"[১]

২. "আল্লাহ! তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই-চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে না, নিদ্রাও না। আসমান ও যমীনের সব কিছু তো তারই জন্য। এমন কে আছে তার কাছে সুপারিশ করবে তার অনুমতি ব্যতিরেকে?"[২]

৩. "কার হতে আকাশ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব ? একমাত্র আল্লাহর; তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। জীবন ও মৃত্যু তিনিই দান করেন। ----তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। অতএব তাঁকেই ডাক, আর তাঁর উদ্দেশ্যেই বিশুদ্ধ ইবাদত কর। সকল প্রশংসাই বিশ্ব প্রতিপালকের।"[৩]

---

১. Prof. Kazi Ayub Ali, An Introduction to Islamic Culture. p.119.

২. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৬৩

৩. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

৪."বলুন! আল্লাহ একক; তিনি মুখাপেক্ষীহীন। তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেনওনি। আর তার সমকক্ষ কেহ নেই।"[১]

৫। "যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর ইহাই তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। ইহা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।"[২]

আল্লাহ মানুষকে কেবল তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর উপাসনা করা মানুষের কর্তব্য। মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করবে এটাই আল্লাহর হক । আল্লাহর হকসমূহ ইসলামের পাচঁটি স্তম্ভ কায়েমের মাধ্যমে আদায় করা হয়। যেমন- প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ রার সালাত আদায় করা, বাৎসরিক উদ্বৃত আয় হতে নির্দিষ্ট পরিমাণে আল্লাহর পথে ব্যয় করা, বিত্তবানের পক্ষে জীবনে একবার মক্কার কাবাগৃহে হজ্জব্রত পালন করা, রমজান মাসব্যাপী রোযা রাখা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। সুতরাং আল্লাহ যা সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা হতে বিরত থাকার আদেশ করেছেন তার যথার্থ বাস্তবায়নই আল্লাহর প্রতি মানুষের করণীয়।

(খ) মানুষের ব্যক্তিগতঅধিকার

শরীআতের লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণ সাধন। আল্লাহ বলেন-"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে।"[৩] উক্ত কারণে শরীআত প্রতিটি মানুষকে তার নিজের উপর অধিকার নির্দেশ করে দিয়েছে। মানুষের দেহের নিরাপত্তা, ইজ্জতের নিরাপত্তা, উত্তরাধিকারের নিরাপত্তা, আইন সংগত কার্যকলাপে স্বাধীনতার নিরাপত্তা প্রভৃতি মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্গত।

(গ) মানুষের সামাজিক অধিকার

সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনই হল শরীআতের উদ্দেশ্য। কাজেই শরীআত ব্যক্তি মানুষের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অপরাপর মানুষের প্রতি তার কতকগুলো কর্তব্য নির্দেশ করেছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রতিটি মানুষকে সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে তা এমনভাবে ভোগ করবে না যাতে অপরের অধিকার ব্যহত হয়। অপরের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে এমন ভাবে সে তার স্বাধীনতা ভোগ করবে না।[৪] শরীআত মানুষকে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে। চুরি, ডাকাতি, উৎকোচ গ্রহণ, জালিয়াতি, অসাধুতা ও

---

১. আল-কুরআন, সূরা- শূরা, আয়াত-১৬৩
২. আল-কুরআন, সূরা-১১২, আয়াত - ।
৩. আল-কুরআন, সূরা-মুহাম্মদ, আয়াত-১-৩
৪. আল-কুরআন, সূরা-যারিয়াত, আয়াত-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রতারণা এতে নিষিদ্ধ। কারণ এসব জঘন্য কার্যকলাপ দ্বারা মানুষ অপরের স্বার্থ বিপন্ন করে লাভবান হয়। শরীআতে জুয়া, লুটতরাজ, মদ্যপান, ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও সর্ববিধ বাজি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। একচেটিয়া ব্যবসায়, মজুদদারী, চোরা কারবার ও অন্যবিধ ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করাও ধর্ম বিরুদ্ধ।

(ঘ) জগতের অন্যান্য জীবের অধিকার

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।[১] মানুষের কল্যাণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য জীব, উদ্ভিদ ও বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে।[২] এসব জিনিসের প্রতি শরীআত মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। সুতরাং তাকে তাদের প্রতি সংগত আচরণ করতে হবে। তাদের নিকট হতে খেদমত নিতে গিয়ে অযথা তাদেরকে আঘাত দেয়া বা তাদের অনিষ্ট করা অন্যায়। বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতিত পাখি ধরা ও তাদের পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখা নিষিদ্ধ। অপ্রয়োজনে বৃক্ষাদি কর্তন ইসলামে অনুমোদন করে না। মানুষ এদেরকে ভোগ করতে পারে কিন্তু এদেরকে বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই। সুতারাং দেখা যায় যে, শরীআত ইসলামী জীবন বিধানের বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে আলোচন করে। আধ্যাত্মিক জীবনের রূপায়নের জন্য শরীআতের বিধি-বিধানের অনুশীলনের মাধ্যমে সূফীকে ভবিষ্যতের কঠোর ব্রত পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং আল্লাহ ও রাসূলের অন্যান্য বিধান পালনের মাধ্যমে সূফী আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করেন। শরীআতের বিধি-বিধান পালনের মধ্যদিয়ে সূফী তাঁর প্রবৃত্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, দেহকে আত্মার অধীনে আনয়ন করেন।[৩] অতএব সূফীর পথ পরিক্রমায় শরীআত হল প্রারম্ভিক স্তর এবং এর বিধান সর্বোতভাবে পালনীয়।

তরীকত

সূফীর পথ পরিক্রমার ২য় স্তর হল তরীকত। প্রথম স্তরের তুলনায় এটা উচ্চতর স্তর। তরীকত অর্থ পথ চলার নিয়ম-কানূন। শরীআত থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তরীকতের যে পথ ধরে মাআরিফাত, হাকীকত ও ওয়াহদানিয়াতের লক্ষ্যবিন্দুতে পৌছা যায় তাকেই তরীকত বলা হয়। অন্যকথায় শরীআত থেকে মাআরিফাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে পথ অনুসরণ করতে হয় সেই অনুসৃত পথের নামই তরীকত।[৪]

বাহ্যিকভাবে শরীআতের ইবাদতের বিধানসমূহ অনুশীলন করার, তা বিশেষ কর্ম পদ্ধতি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক আলোক দ্বারা সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয় তরীকতের মাধ্যমে। শরীআতপন্থী যখন শরীআতের যাবতীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হন এবং শরীআতের নির্দেশাবলী জীবনে প্রতিফলিত

---

১. আল-কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-
২. অধ্যাপক কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪
৩. আল-কুরআন, সূরা-ত্বীন, আয়াত-৪
৪. আল-কুরআন, সূরা-যাসিয়া, আয়াত-১৩

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে উঠে তখনই তার জন্য শরীআতের শিক্ষা থেকে তরীকতে দীক্ষা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শরীআত থেকে তরীকতে ব্রত হবার বা দীক্ষা নেবার সাধনাকে বলা হয় বেলায়েত-এ-খাসসা। বেলায়েত-এ-খাসসার প্রথম ধাপই হল তরীকতের শিক্ষা। তরীকতের স্তরে এসে সূফীকে পীর বা শায়খের নিকট হতে আত্মিক নির্দেশ বা তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করতে হয়। এ সব শর্ত পালনের পর শায়খ তাকে সূফী সিলসিলা বা শৃংখলার অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তখন তাকে বিনা বিতর্কে, বিনা দ্বিধায় শায়খের নির্দেশ মেনে নিতে হয়।[১] একে বলা হয় ফানা ফীশশায়খ বা শায়খের মধ্যে আত্মবিলোপ।

যে মুরিদ তার শায়খের দেয়া শর্ত পালন করতে পারে-তাকে শায়খ তরীকতের গোপন রহস্যভেদ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন এবং তরীকতে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে তিনি খিলাফত প্রদান করে থাকেন। ফলে মুরিদের অন্তরে ঐশী প্রেমের উদ্রক হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তরীকতের উচ্চমার্গে পৌছে যায়। তরীকত আলমে মালাকুতের অন্তর্ভুক্ত। আলমে মালাকুত বলা হয় খোদায়ী জগত, ফেরেস্তার জগত এবং আত্মজগতকে। এটা অশরীরী আত্মজগত। এ জগতে প্রবেশ করতে হলে মানুষের দৈহিক স্বভাব পরিহার করে আত্ম জগতের স্বভার ও প্রভাব অর্জন করতে হয় । এ স্বভাব ও প্রভাব অর্জন করতে হলে মানুষের চরিত্রের কতকগুলি মন্দ স্বভাব পরিহার করতে হয় এবং তদস্থলে ভালগুণ দ্বারা বিভূষিত হতে হয়। শরীআতে যেমন ১৩টি আরকান ও আহকাম রয়েছে, তেমনি তরীকতেও মাশায়িখগণ ১৩টি জিনিসের উপর জোর দিয়ে থাকেন। যেমন তরীকতের আরকান-

(১) আল্লাহকে জানার মত সময়োপযোগী জ্ঞান অর্জন

(২) দুনিয়ার লোভ-লালসা ত্যাগ করা

(৩) দু:খ-দৈন্যে ধৈর্য্য ধারণ করা

(৪) আল্লাহর নিয়ামতের শুকর করা

(৫) হৃদয়ে আল্লাহর ভয় রাখা

(৬) আল্লাহর স্মরণে সর্বক্ষণ তন্ময় থাকা

(৭) মুরাকাবার মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধ্যান-ধারনায় তন্ময় থাকা।

তরীকতের আহকাম

(১) আল্লাহর মাআরিফাত লাভ

(২) দানশীলতা বা বদান্যতা প্রদর্শন

(৩) সত্যবাদী হওয়া

(৪) তকদীরের প্রতি অটল বিশ্বাস

১. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

(৫) আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা

(৬) পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা

উপরন্ত কম কথা, কম ঘুম ও কম খাবারে অভ্যস্ত হওয়াও আবশ্যক। নির্জন বাসও প্রয়োজন। এসব নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের উপর নির্ভর করছে আত্মিক উন্নতি। আত্মকর্ম সাধনের উপরই নির্ভর করছে তরীকতের সফলতা এবং সৎগুণাবলী অর্জনের উপরই নির্ভর করছে আলমে মালাকুতে প্রবেশ করার ক্ষমতা।

মাআরিফাত

এটি সূফী সাধনার তৃতীয় স্তর। মাআরিফাত অর্থ-চেনা-জানা, কোন কিছুর সম্যক জ্ঞান লাভ করা, কোন কিছুর প্রকৃতি ও সত্তা সম্পর্কে অবগত হওয়া। ইসলামী পরিভাষায় জানা-শুনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, তাকে মাআরিফাত বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর পরিচিতি জ্ঞান তথা আল্লাহর পরিচয় জানাকে মাআরিফাত বলে। বিশ্বসৃষ্টির পরমসত্তা আল্লাহ ও তাঁর বিশাল জগত এবং আপন সত্তাকে জানার নামই মাআরিফাত।

মাআরিফাত আধ্যাত্মিক আলোকের স্তর। এ স্তরে সূফীর কল্‌ব ঐশী আলোকে আলোকিত হয়। তিনি বস্তুর নিগুঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে শুরু করেন। সৃষ্টি রহস্যের কালো যবনিকা তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হতে সরে যায়। তাই মাআরিফাত মানেই ঐশী আলোকে আলোকিত মন নিয়ে আল্লাহর স্বজ্ঞাত ও ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ অনুধ্যান। এখানে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয় এবং এর স্থলে মানুষের মধ্যে ঐশী গুণাবলীর অভ্যুদয় ঘটে। তাই যে সূফী মাআরিফাত লাভ করেছেন, তিনি এক আলোকিত আত্মার অধিকারী এবং এ জন্যই তিনি শরিআতের বিধি-বিধান বা আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তিনি উদাসীন।

"সূফী মুরাকাবা' সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি কৌশল মানব জীবনের গুপ্ত রহস্য ভেদ করে এক ঐশী জ্ঞানালোকের আভা প্রাপ্ত হন। সূফীর ধ্যানি অন্তরের সম্মুখে উম্মোচিত হয়ে যায় এক অপার ঐশী শক্তির লীলা চাঞ্চল্য এক তীব্র জ্যোতির্ময় আলোর বিচ্ছুরণ । এ স্তরে সূফী সাধকের হৃদয় ঐশী আলোকে দীপ্ত করে তাকে সৃষ্টির গভীর রহস্য উপলব্ধির উপযোগী করে তোলেন।[১] এখানে সাধক আল্লাহতে পরিপূর্ন ভাবে নিবেদিত প্রাণ। তার সমস্ত সত্তা জুড়ে ঐ প্রার্থনা বের হয়-"আমার উপাসনা-আরাধনা, উৎসর্গ-অনুষ্ঠান, আমার জীবন-মরণ সমস্তই বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহর জন্য।"[২]

যে ব্যক্তি এই উচ্চতম পর্যায়ে আরোহণ করেন তাকে বলা হয় 'সালিক'। পূর্ণতার এ পর্যায়ে উত্তরণের আগে তাকে বিভিন্ন পর্ব অতিক্রম করতে হয়। এই প্রক্রিয়া বা পথের চারটি পথ রয়েছে। প্রথম পর্বে তাকে তথ্য বিষয়ক প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করতে হয় এবং দ্বিতীয় পর্বে তাকে নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয়

১. আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
২. আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে, তৃতীয় পর্বে তিনি সর্বত্র আল্লাহকে দেখতে পান এবং চতুর্থ ও শেষ পর্বে লক্ষ্য অর্জনের পর তিনি আগের অবস্থান ফিরে আসেন।[১]

মাআরিফাত ও সত্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত চেতনাকে আল্লাহর চেতনায় মিশিয়ে ফেলতে হয় এবং এর ফলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় স্বতন্ত্র না থেকে একীভূত হয়ে যায়। এখানে ব্যক্তির চেতনা আল্লাহর চেতনায় মিশে যায় এবং এর ফলে ব্যক্তি চেতনা লুপ্ত হয়ে শুধু ঐশী চেতনাই অবশিষ্ট থাকে। এ অবস্থাকে বলা হয় 'কুরব-ই-ফারাগাত' এবং এখানে আল্লাহর বার্তা, আর সালিক তার উপলক্ষ বা হাতিয়ার মাত্র । এ অবস্থার বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় ' কুরব-ই- নাওয়াফিল। এখানে সালিকের স্বতন্ত্র সত্তা ও গুণ তিরোহিত হয় এবং আল্লাহর সার্বিক গুণ তার সম্বল ও সহায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রথমটিকে বলা যায় নবুওয়াতের পর্যায়, যেখানে নবীর কথা ও কাজ আল্লাহর কথা ও কাজে পরিণত হয়। আর দ্বিতীয় পর্বে সালিক প্রকৃতির শক্তিসমূহকে নিয়ন্তণ করেন এবং এখানে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটে থাকে।[২]

হাকীকত

হাকীকত শব্দটি 'হাকিকুন' শব্দ থেকে এসেছে। আবার হাকিকুন এসেছে 'হাক্কুন' শব্দ থেকে।এর শাব্দিক অর্থ –পরম সত্য, পরম সত্তা, ধ্রুব সত্য, বাস্তব ইত্যাদি। আর 'হাকিকুন 'শব্দের অর্থ -পরম সত্য বিষয়, যে পরম সত্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাকেই হাকিকত বলা হয়। এ নশ্বর স্থূল বিশ্বের অন্তরালে যে অবিনশ্বর সত্তা বিদ্যমান রয়েছে, সেই পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহতে অভিনেশিত, স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াকেই হাকিকত বলা হয় ।[৩]

এই স্তরে সূফী সত্য উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধি আল্লাহর করুণার উপর নির্ভর করে। আল্লাহর অনন্ত রহমতের পরশ ব্যতিত কেউই তার জ্ঞানের সৃষ্টির কণা মাত্রও জানতে পারবে না । এ স্তরে উত্থীত হতে পারলে সাধক পরম সত্য বা সত্তার সন্ধান ও স্বরূপ লাভ করতে পারেন। এই পরম প্রেমাস্পদের ভালবাসায় নিজের অস্তিত্ববোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন; আত্মবিস্মৃত হয়ে আপন সত্তাকে পর্যন্ত পরমসত্তায় হারিয়ে ফেলেন। এটা ফানাফিল্লাহর স্তর । আল্লাহর গোপন প্রেমে যে প্রেমিক মত্ত , তারই অবস্থান হাকীকতে।

পাঁচ প্রকার অনুসন্ধান পদ্ধতির মাধ্যমে এ পরম সত্যের উপলব্ধি হয়- (১) বুদ্ধি, (২) অভিজ্ঞতা, (৩) বিচার-বিশ্লেষণ, (৪) বিবর্তনমূখী মতবাদ এবং (৫) প্রজ্ঞাবাদ। সালিক বা আরিফগণ শরীআতগত জ্ঞান, তরীকতগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এরং মাআরিফাতের পরিচিতিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে আধ্যাত্মিক বির্তনের মধ্য দিয়ে সজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মৌলজ্ঞান লাভ করে থাকেন। সত্যোপলব্ধির এসব মাধ্যমকে তাসাওউফের পরিভাষায় 'কাশফ ' নামে অভিহিত করা হয়।"[৪]

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

২. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

৩. আল কুরআন, সূরা-৭, আয়াত- ১৬৩

৪. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. p. 118.

Dhaka University Institutional Repository

মূলত: হাকীকত আলম-ই-লাহুতের অন্তর্গত। সৃষ্টির আদিতে এই স্তর প্রথম আবির্ভূত হয় । এ স্তরে সাধক ফানাফীর রাসূলের মধ্য দিয়ে ফানাফীল্লাহ্‌র স্তরে প্রবেশ করেন। হাকীকতের এ স্তরে সাধক তার নিজস্ব স্বকীয়তা, নিজ বৈশিষ্ট্য, স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি , চিন্তা ও অনূভূতি, পৃথক অস্তিত্ববোধ সব কিছুই হারিয়ে ফেলেন এবং আল্লাহ্‌র সত্তায় লীন হয়ে যান। এ অবস্থায় মানুষ আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়। এ স্তরে সাধকের হৃদয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকেনা। এ অবস্থা অর্জনকারী সাধক 'ইনসান-ই-কামিল' বা পূর্ণাঙ্গ মানব মর্যাদায় ভূষিত হন। এমন সাধনাসিদ্ধ আত্মার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে-"হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষ প্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।"[১]

ওয়াহ্‌দানিয়াত

এটা সূফী পথ পরিক্রমার সর্বশেষ বা চূড়ান্ত স্তর । 'ওয়াহ্‌দানিয়াত' শব্দটির অর্থ একত্ব, যার কোন দ্বিত্ব নেই।[২] যা আদি, যা মৌলিক ও অভিভাজ্য, যা সর্বস্থানে, সব কিছুতে সমভাবে বিরাজমান ও স্থিতিবান, যা সবকিছুর মূল্য নিধারক ও পরিমাপক, যা আপনা-আপনিই মুল্যায়িত এবং আপনা-আপনিই বিকশিত অর্থাৎ সয়ম্ভূ তা-ই ওয়াহদানিয়াত।[৩] এরূপ একত্বের গুণে গুণান্বিত একমাত্র আল্লাহ। তাঁর একত্ব অনাদি, অনন্ত, অভিভাজ্য, তাঁর মৌল সত্তা অবিমিশ্রি, যে সত্তাতে কোন মিশ্রণ নেই।

এস্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই। এ স্তরে এসে সূফী তার অস্তিত্ববোধকে একত্ববোধের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন। এটা-ই হল তার পথ চলার অভীষ্ঠ লক্ষ্য। ওয়াহদানিয়াত আলম-ই-হাহুতের অন্তর্ভূক্ত। এটা হল আল্লাহর নির্গুণ অবস্থা। এখানে তিনি গুণবিহীন অবস্থায় চিরজীবি হয়ে প্রকৃতি শূণ্য অবস্থায় বিরাজ করছেন। তাঁর এ মৌল সত্তা সৃষ্টি, প্রকৃতি, গুণ ও অবরোহ শূণ্য। এ হল স্রষ্টার আদি ও সর্বশেষ অবস্থা।[৪] আদিতে কেবলমাত্র তিনিই ছিলেন আর কেউ ছিল না। পূনরায় সবকিছু ধ্বংস করে কেবল তিনিই থাকবেন আর কিছুই থাকবে না।

এখানে এসে সাধক তার সবকিছুকে এমনকি নিজকে পর্যন্ত ধবংস (ফানা) করে আল্লাতহর যাতে স্থিতি লাভ করেন। এখানকার চেতনা আল্লাহরই চেতনা, এখানকার চৈতন্য স্বরূপ আল্লহরই স্বরূপ, এখানকার জীবন আল্লাহরই জীবন, এ অবস্থাকে সাধকের 'বাকা'(আল্লাহতে স্থিতিলাভ) বলা হয় । এ স্তরে উন্নীত মানব হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন-"এই কুরআন শ্রুত, আর আমি এর সবাক জীবন্ত কুরআন" হযরত বায়িজীদ বিস্তামী (রহ.) বলেছিলেন, - "সমুদয় প্রশংসা আমারই জন্য, আর আমি কতইনা গৌরবের অধিকারী।" হযরত আবু বকর শিবলী বলতেন- "আমি ছাড়া দ্বিতয়ি কেউ নেই।"[৫]

---

১. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. p. 118.
২. আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
৩. আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
৪. ফকির আব্দুর রশিদ, সূফীদর্শন, ই.ফা.বা. ১৯৮০ইং. পৃ. ১৬২
৫. আল কুরআন, সূরা-৮৯, আয়াত-২৭-৩০

Dhaka University Institutional Repository

তাসাওউফ বা সূফীবাদের মূলনীতি

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভই হল তাসাওউফের মূলনীতি। পরমসত্তা আল্লাহ্‌র সাথে মিলনে পরম পাওয়ার যে পরিতৃপ্তি তা-ই-সূফী সাধককে ক্ষণস্থায়ী ইহ জাগিতক প্রলোভন এবং আপাত মধুর ইন্দ্রিয়াসক্তি হতে মুক্ত করে তাকে পরিপূর্ণ মনুষত্বের সাধনায় সার্থক করে তোলে। এ সাধনায় তাসাওউফের মূলনীতি সমূহ সাহায্য করে থাকে।

তাওবাহ্ (অনুতাপ)ঃ তাওবাহ্‌র শাব্দিক অর্থ অনুতাপ, অনুশোচনা। মুলতঃ এর অর্থ প্রত্যাবর্তন। মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে বা ঝুঝে।[১] "সেই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তরফ হতে তাওবা বা অনুতপ্ত চিতে প্রত্যাবর্তন কবূল করে থাকেন।"[২]

পাপ পরিবর্জন করা এবং আর পাপপথে অগ্রসর না হওয়ার প্রতিজ্ঞাই তাওবাহ্।ঔদাসিন্যের মোহনিদ্রা হতে আত্মার জাগড়নই তাওবাহ্। তাওবার কার্যকারিতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।[৩]

(১) অন্তরে পাপের পুর্ণ প্রতীতি ঃ

(২) অনুতাপ জ্বালার অনুভূতি (নাদাম)

(৩) ভবিষ্যতে পাপ কাজ হতে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প।

এই শর্ত তিনটি পুর্ণ হলে আল্লাহ্ সর্বদাই তাওবা কবুল করে থাকেন। সূফীগণ শরীআত সূলভ ধারণার উর্ধ্বে উঠে তাওবার প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাদের বিবেচনায় তাওবার পরিভাষাগত বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ, যাঁরা তরীকা গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য তাওবা হবে উহাতে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ এবং উহা ঐশী অনুগ্রহের একটি প্রতীক নিদর্শন। গভীর তাত্ত্বিক তাওবা পাপের স্বীকৃতি এবং পাপ কার্য বর্জন ততটা নয়, যতটা তাওবাকারীর সমগ্র সত্তাকে আল্লাহ্‌র দিকে উম্মুখ করা। কারণ, একমাত্র এ অবস্থাতেই অনুতপ্ত তাওবাকারীর পক্ষে আল্লাহ্‌র দিকে একাগ্রভাবে নিবিষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন সম্ভব। তাদের মতে, সর্বক্ষণ পাপের স্মৃতি অথবা অনুশোচনার অনুভূতি ক্ষতিকর। স্মরণ অর্থই আল্লাহ্‌র বিস্মরণ আর আত্মচিন্তা নিকৃষ্টতম পাপ।[৪]

তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা)ঃ জীবনের সর্ব অবস্থায়, সর্বকাজে, সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করাকে তাওয়াক্কুল বলা হয়। তাওয়াক্কুল একমাত্র, তাওহীদ বা একত্ববাদের ধারণা হতেই আসে। আল্লাহ্‌র সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৫]

আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরতা ইসলাম বিরোধী। আল্লাহ্‌র সঙ্গে

---

১. আব্দুর রাহীম হাযারী,প্রাগুক্ত, পৃ,২৩০
২. আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত , পৃ. ১৬৩
৩. ডঃ মহাম্মদ রুহল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৪. উক্তিগুলো উদ্ধৃত ঃ আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
৫. আল-কুরআন, সূরা- ৪২, আয়াত - ২৫

Dhaka University Institutional Repository

সম্মিলন প্রাপ্তির পথে চিত্তাবেগ সমূহ বড় রকমের অন্তরায় স্বরূপ। তাই এগুলোকে দমন করা প্রয়োজন। এসব চিত্তাবেগের সাথে পাল্লা দিতে হলে ব্যক্তিকে নিজের কথা ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌তে বসবাস করতে হয়। এ অবস্থার নামই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা। তাওয়াককুল সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন- "একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই প্রত্যেক মুমিনের আত্মনির্ভর হওয়া কর্তব্য।"[১] নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-"তুমি যখন কিছু কামনা করবে, তখন তা একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই কামনা করবে। আর তুমি যখন কোন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখনও তুমি তা আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে।"[২]

এ অবস্থায় উপনীত হয়ে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ধ্যান ছাড়া অন্য কিছুই করেন না; ব্যক্তিগত জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন ও মেটাতে চান না। এমনকি খাদ্য গ্রহণ ও অসুস্থ্যতায় ঔষধ পর্যন্ত সেবন করেন না। তাঁরা নিজেদের সম্পুর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দয়া ও তত্ত্বাবধানে সমর্পন করেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ নিজেই তাদের সব অভাব পূরণ করবেন।

পরিবর্জন

সূফীদের পরিবর্জন দু'প্রকার । বাহ্য ও অন্তর পরিবর্জন। বাহ্য পরির্জনের মাধ্যমে সূফীগণ তাদের দৈহিক প্রয়োজন হ্রাস করেন। আন্তর পরিবর্জনের মাধ্যমে সূফীগণ ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তুর আবেদন হতে আত্মাকে মুক্ত করেন। সূফীগণ উভয়বিধ পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা পরিহার করে আল্লাহ্‌র প্রেমে নিজেদেরকে সমাহিত করেন।

পরিবর্জনের নীতির ব্যাপারে দেখা যায় কোন কোন সূফী সাধক পার্থিব সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণ ভীতস্পৃহ ছিলেন, আবার কেহ কেহ জীবনে সামান্য প্রয়োজন ব্যতিত অন্য সবই পরিবর্জন করতেন। তাপসী রাবিয়া (রহ.) বলতেন - "The best thing that laeds man on to God is that he must not care for anything of this world or of the next other than God."[৩]

সবর (ধৈর্য)

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের পথে বহুরকম দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এ সব দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে ধৈর্যের পরিচয় দেয়াকেই সবর বলা হয়। ধৈর্য ধারণের পেছনে অপরিসীম কল্যাণ রয়েছে। তাই জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতে ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়া মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। তাই সূফীগণ জীবনের মুলনীতি হিসেবে সবরের অনুশীলন করে থাকেন। বিপদে তাঁরা ধৈর্য্য ধারণ করে থাকেন। কোন অবস্থায় তাদের অসুবিধার কথা বলেন না। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন - "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ------- আর আমি পরীক্ষা করব তোমাদেরকে কিঞ্চিত ভয় দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা, ধন-প্রাণ ও শস্যের স্বল্পতা দ্বারা। আর

১. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত-৫৪
২. ইমাম গাযালী, ইয়াহ্‌ইয়াও উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খন্ড দ্রষ্টব্য
৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড) পৃ. ৪৪৬

Dhaka University Institutional Repository

সুসংবাদ জানিয়ে দিন এমন ধৈর্য্যশীলদেরকে যখন তাদের উপর মুছিবত আসে তখন বলে আমরা তো আল্লাহ্‌রই আয়ত্বে, আর আমরা সকলে আল্লাহ্‌র সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।" [১]

আত্ম সমর্পন

সালিক যখন আত্মঅস্বীকৃতি পালন করবেন তখন সে নিজেকে একজন শায়খের অধীনস্ত করেন। শায়খের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য ব্যতিত যেমন কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হতে পারে না, তেমনিভাবে সূফী সাধকের পক্ষেও শায়খের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অনুগত না হলে ইলম-ই-মাআরিফাত অর্জন সম্ভব নয়। কাজেই শিষ্যকে শায়খের প্রতি অনুগত ও আত্ম সমর্পনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এভাবে শিষ্য সর্ব প্রকার পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। সঠিক পথ নির্দেশনার আগে পীর তাকে কিছু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। প্রথম বছরটি তিনি অতিবাহিত করেন জনগণের কল্যাণে, দ্বিতীয় বছর আল্লাহ্‌র কাজে এবং তৃতীয় বছর তিনি অতিবাহিত করেন তার নিজের হৃদয় নিরীক্ষায়।

ইখলাস (পবিত্র ও বিশুদ্ধতা)

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ মনে নিষ্ঠার সাথে কোন কিছু করাকেই ইখলাস বা হৃদয়ের পবিত্রতা বলে। সূফীগণ হৃদয়ের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করে চলেন। কেননা একমাত্র পুতঃ পবিত্র অন্তঃকরণে ঐশী জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। আল্লাহ্ বলেছেন- "নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি সাফল্য অর্জন করেছে, যে তার আত্মার পবিত্রতা লাভ করতে পেরেছে। আর যে ব্যক্তিই তাঁর প্রতিপালকের নাম সদা স্মরণ করেছে, বাস্তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত নামায সমাধা করেছে।" [২]

"যে ব্যক্তি তার আত্মাকে বিশুদ্ধ রেখেছে, সেই তার জীবনকে সার্থক করে তুলেছে, আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করে ফেলেছে সে তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।"[৩]

ইশক (আল্লাহ্ প্রেম)

আল্লাহ্ প্রেমই সূফীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূফীদের আত্মা সর্বদা আল্লাহর ভয় ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। জাগতিক কোন বিষয় বা লোভই তাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে গাফেল রাখতে পারে না। এ জন্য তাসাওউফ দর্শন প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত। একজন মরমী কবির ভাষায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এভাবে-[৪]

---

১. আল কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-

২. আল কুরআন, সূরা-১৪, আয়াত-১২

৩. উদ্ধৃতঃ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৪. S.M. Nadvi. Muslim Thought and its Source. P. 92.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382757

Dhaka University Institutional Repository

"ভাল যদি বাসতে হয় তাকে ভালবাস
সেজন প্রেমময়,
তাঁর সাথে তোর কি না চলে
কোন টা বা না হয়।"

যিক্‌র

সূফীদের আত্মিক অনুশীলনের এক মুল উপায় হল যিক্‌র। কুরআনের কোন আয়াত বা আল্লাহর কোন নাম বিশেষ কায়দায় ও ভঙ্গিমায় বারংবার আবৃত্তি করাকে যিক্‌র বলা হয়। আল্লাহতে লীন হয়ে যাবার উদগ্র বাসনায় সূফীগণ যিক্‌রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেননা আল্লাহ্‌ বলেছেন - "হে ইমানদারগণ! যতবেশী পার আল্লাহর যিক্‌র কর, আর সকাল ও সন্ধ্যায় তার মহিমা বর্ণনা কর।"[১]

যিক্‌র দু'রকমের হতে পারে- যিক্‌রে জলি ও যিক্‌রে খফী। প্রথমটি চিশতিয়া তরীকার অনুশীলন এবং তা অনুশলীন করা হয় সরবে। দ্বিতীয় প্রকারের যিক্‌র করা হয় নীরবে। এটা কাদিরিয়া তরীকার অনুশীলন।

নিজের ব্যক্তি সত্তার কথা সম্পুর্ণ ভুলে গিয়ে পরিণামে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হওয়াই যিক্‌রের লক্ষ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সূফীর আত্ম চেতনা সম্পুর্ণরূপে আল্লাহ্‌তে বিলুপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সূফী তার যিক্‌র অব্যাহত রাখেন। যিক্‌রের সময় সূফী এমন এক ধ্যানের পর্যায়ে প্রবেশ করেন যেখানে মনের সকল মনোযোগ একটি মাত্র ধারণায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রেমে কেন্দ্রীভূত হয় এবং তখন মন আর অন্যকোন ধারণা দ্বারা বিঘ্নিত বা আলোড়িত হয় না।

শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা)

সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সূফী সাধনার অন্যতম মূলনীতি। মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের অসংখ্য নিয়ামত উপভোগ করছে। এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামই শুকরিয়া। আল্লাহ্‌ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-"তোমরা আমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহলে আমি তোমাদের নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দিব।"[২]

আধ্যাত্মিক জ্ঞান

পরমসত্তা আল্লাহ্‌র জ্ঞানই তাসাওউফের লক্ষ্য। এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা স্বজ্ঞার মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে। এ জ্ঞান লাভ করতে ধ্যান, প্রেম, পবিত্রতার সাহায্যে বুদ্ধি ও আত্মাকে সম্পুর্ণভাবে প্রস্তুত করতে পারলে ঐশীজ্ঞান লাভ করা যায়। আল

১. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত - ১৫৩-৫৬
২. আল-কুরআন, সূরা-৮৭, আয়াত - ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনে সত্য জ্ঞান লাভের তিনটি পথ প্রদর্শিত হয়েছেঃ ইলমুল ইয়াকিন (অনুমানলব্ধ জ্ঞান), আয়নুল ইয়াকিন (প্রতক্ষণজাত জ্ঞান) এবং হাক্কুল ইয়াকিন (উপলব্ধিজাত জ্ঞান)।[১]

কাশ্‌ফ (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি)

কাশফ এমন এক ধরণের অন্তর্দৃষ্টি যার মাধ্যমে সূফী ভূত ভবিষ্যত, জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য, আত্মা, আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতকে জানতে পারেন। প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও এ ব্যাপারে সূফীকে আল্লাহ্‌র বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। এই কাশ্‌ফ বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আসে সূফীর অমরতা বা ফানাফীল্লাহ্‌র অবস্থায়। সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে এসে সূফী কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর অসীমতার মধ্যে হারিয়ে যান এবং অনুভূতির এক নিবিড় মুর্হুতে তিনি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।

সামা বা সংগীত

ভাবোচ্ছ্বাস বা তন্ময়তা লাভের উপায় হিসেবে কোন কোন সূফী সংগীত চর্চা করে থাকেন। সংগীতের মুর্ছনা দ্বারা তারা আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন এবং মনকে আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিবিষ্ট করেন চিশতিয়া তরীকার সমর্থক সূফীগণ সংগীতের সমর্থক।

উপরোক্ত মহাসত্য লাভের জন্য একজন সূফীকে আরও কিছু পর্ব অতিক্রম করতে হয়। যেমন -

তাকওয়া ঃ আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকা

তাওয়াজ্জ ঃ বিনয়াবনত থাকা

জিহাদ ঃ সূফীদের জিহাদ কোন বহিঃ শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, বরং তাদের নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে আবার কখনও কখনও প্রয়োজনবোধে সূফী বিধর্মী শত্রুর বিরুদ্ধেও জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

জোহদ ঃ আইনানুগ সুখ -ভোগ থেকে বিরত থাকা

ওয়ারা ঃ অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা

সমত ঃ নিরবতা পালন

খউফ ঃ ইন্দ্রিয় পাছে কোন খারাপ কাজ করতে পারে তার জন্য ভয় করা

একিন ঃ দৃঢ় বিশ্বাস

রিজা ঃ পরিতৃপ্ত

খালওয়া ও উজলা ঃ নির্জন বাস ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তাসাওউফ ঃ পবিত্রতা

ফুতোয়া ঃ নিজ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অপরের মঙ্গল করা

---

১. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. 120.

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্‌ক ঃ চিন্তা ও কাজে সততা

ইসতিকামা ঃ কেবল আল্লাহ্‌র ধ্যান করার জন্য তৈরি থাকা

ইরাদা ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং নিজের বলে কোন ইচ্ছা না রাখা

হুরিয়া ঃ নিজের নয়, পরের কল্যাণ কামনা করা

দোয়া ঃ নিরন্তর আল্লাহ্‌র ইবাদাত বন্দেগীতে থাকা

মহব্বা ঃ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র ভালবাসা

শওক ঃ আল্লাহ্‌র তায়ালার সাহায্যের জন্য ব্যাকুলতা।

একজন প্রকৃত সূফীকে যথার্থ লক্ষ্যে উত্তরণের জন্য এ স্তরসমূহ অতিক্রম করতে হয়।

ফানা ও বাকা

'ফানা' ও 'বাকা' সূফীর আধ্যাত্মিক সর্বোচ্চ স্তর। ফানা বলতে সূফীর আত্মবিলয় বা বৈষয়িক মানসের বিলুপ্তি সাধনকে বুঝায়। এ পর্যায়ে ব্যক্তি চেতনা আল্লাহ্‌র প্রেম ও ধ্যানে বিলুপ্ত হয়। ফানার শেষ প্রান্তে বাকা শুরু হয়। হৃদয়ের সত্য বা জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। সকল হৃদয়ে এ সত্য সমভাবে প্রতিফলিত হয় না। এ জন্য প্রত্যেকের উচিত সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য হৃদয়ের আবরণ উন্মোচনের চেষ্টা করা। কেননা, আল্লাহ্‌কে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ তিনি অপার্থিব এবং ইন্দ্রিয়াতীত। আবার বুদ্ধি দ্বারাও তাকে জানা যায়না, কারণ তিনি অচিন্তনীয়। মানব বুদ্ধি তার সীমিত শক্তিতে সসীম বস্তুর পরিধি অতিক্রম করতে পারে না। তাই নূর, প্রত্যাদেশ ও আত্মিক উৎকর্ষতা দ্বারাই কেবল আল্লাহ্‌কে জানা যায়। আল্লাহ্‌কে জানতে হলে ব্যক্তিকে প্রথমেই জানতে হবে তার নিজেকে। সূফীগণ বলেন-"নিজের মনকে দেখ, তোমার মধ্যেই আল্লাহ্‌ বিরাজমান।" [১] "যে নিজেকে জানে যে আল্লাহকে ও জানে।" (দিউয়ান-ই-আলী)।

হৃদয় একটি আয়নার মতই যেখানে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রতিফলিত হয়। সূফীগণ মত পোষণ করেন যে, আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলতার জন্য সকল নিচতা হতে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হলে অন্তর্দৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হবে। আল্লাহ্‌কে জানা যায় শুধু প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও তন্ময়বস্থায়। তন্ময়বস্থায় সূফীর হৃদয় সব জিনিসের মধ্যে ঐশী সত্তার রূপ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। সূফীগণ বিশ্বাস করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী, তবে সত্যের প্রত্যাদেশ নাযিল তাঁর পরে বন্ধ হয়ে যায়নি। কারণ আত্মিক অনুশীলন ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তিই গৌণ প্রত্যাদেশ লাভ করতে পারে। কারণ অশুভ চিন্তা ও বাসনামুক্ত হৃদয় সত্য সম্পর্কে ধ্যান করতে পারে। শয়তানের কারসাজিতে তারা আর পথ ভ্রষ্ট হয় না। কাজেই বলা হয়-"আমি যদি মনকে অবজ্ঞা করি তবে আমি আল্লাহ্‌কেও অবজ্ঞা করি। মন বিবেকের মতই যা সত্য পথ দেখায়।"

---

১. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. 121.

Dhaka University Institutional Repository

তাই সূফীগণ সব সময় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন। তন্ময়বস্থায় তিনি তাঁর চার পাশের সব কিছুতেই আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করেন। আল্লাহ্‌কে তিনি দেখেন অপরোক্ষভাবে কোন বস্তুর মাধ্যমে নয়। তিনি ব্যক্তি চেতনা ও বস্তুচেতনা হারাতে চান শুধু সার্বিক চেতনা ও আল্লাহ্‌র প্রেমে নিমগ্ন হওয়ার জন্য। তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে হৃদয় আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করতে ও সম্যক পরিচিত হতে পারে। তন্ময়তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এভাবে আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুকে ভুলে যাওয়া, বিশেষতঃ আত্ম চেতনা হারিয়ে ফেলার অবস্থাকেই বলা হয় 'ফানা ফীল্লাহ্'।

সবরকম চিত্তাবেগ ও বাসনা পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে এভাবে যে 'ফানা' অবস্থা অর্জিত হয় তা ব্যক্তি জীবনে এক অনিবার্য নৈতিক পরিবর্তন সূচিত করে। এ পর্যায়ে ব্যক্তি সব কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রেম ও ধ্যানে সমাহিত হন। ফলে তার মন থেকে আল্লাহ্‌র চেতনা ছাড়া সব চেতনার অবসান ঘটে। ফানার যেখানে শেষ সেখানেই আবার সূচিত হয় বাকা। এ পর্যায়ে সূফী আল্লাহ্‌র চেতনায় স্থায়িত্ব লাভ করেন। সুতরাং ফানা ও হল বিশোধন মূলক জীবনের সর্বশেষ পর্যায়, আর বাকা হল স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত জীবনের শুরু।[১]

বাকার পর্যায়ে সূফী আত্মিক পর্যায়ে স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে। এ পর্যায়ে সূফী ইন্দ্রিয় সত্তাকে অতিক্রম করে মূল সত্তায় অনুপ্রবেশ করে এবং সে যখন ঐশ্বরিক সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করে তখন তিনি নিজের সত্তার সাথে একে অভিন্ন বলে মনে করেন। আল্লাহ্ ছাড়া তিনি অন্য কিছুই দেখতে পান না। তিনি আল্লাহ্‌র সাথে অভিন্ন হয়ে যান। এ পর্যায়ে তিনি আর ধর্মের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান পালনের প্রয়োজনবোধ করেন না। কারণ, এ পর্যায়ে তাঁর ও আল্লাহ্‌র মধ্যে আর দূরত্ব থাকে না, বরং তার কথা আল্লাহ্‌র কথায় এবং তাঁর জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানে পরিণত হয়। সমীমের সাথে অসীমের এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনুধাবন করা খুবই কঠিন।

আবূ নাসির আল সাররাজ মনে করতেন যে - "Baqa does not mean infusion of the Divine Essence into human nature or identification of the human nature with the Divine Essence. Rather it means the transition from human qualities to the Divine Qualities, by which the individual loses his own will and enters into the will of God. The will of the individual is also given by God, and by this he understands that he Should be entirely devoted to God. Moreover, the qualities of humanity is not the humanity itself, as such the sufi cannot lose his humanity and be invested with the Attributes of God. Rather the human attributes can only be changed by the redience of Divine light Shed upon man. The attributes of humanity, not being its essence, can not one with God, but the essence alone can be united with God."২.

---

১. এখানে মনে রাখা উচিত যে, ফানা বৌদ্ধ নির্বাণের মত কোন নঞর্থক অবস্থা নয়। কারণ নির্বাণে যেখানে ব্যক্তি সত্তার সম্পূর্ণ বিনাশের কথা বলা হয়, সেখানে ফানা বলতে ব্যক্তি সত্তার বিলুপ্তিকে বুঝায় না, বরং বুঝায় এমন অবস্থাকে যা পরিণতি লাভ করে বাকা বা আল্লাহ্‌র চেতনায় অবস্থিত এক অব্যাহত স্থায়ী জীবনে।

২. Saiyed Abdul Hai. op. cit. p. 148.

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য সূফীগণ বলেন- "ফানা বলতে সারধর্মের বিলুপ্তি ও দেহধারী দ্রব্যের বিনাশকে বুঝায় না। আবার বিনাশ বলতেও মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র অধিষ্ঠানকে বুঝা যায় না। আসলে 'ফানা' বলতে ব্যক্তির নিজস্ব অপূর্ণতা সম্পর্কে চেতনা এবং বাসনার অনুপস্থিতিকে বুঝায়। ব্যক্তি স্বতন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে স্থায়ী অস্তিত্ব লাভ করেন ঠিক, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানবীয় গুণাবলী ঐশীগুণে কিংবা ঐশীগুণ মানবীয়গুণে রূপান্তরিত হয়। এখানে সম্মিলন কথাটির দ্বারা আল্লাহ্‌র চিন্তায় সূফীর এমনভাবে তন্ময় হওয়াকে বুঝায় যার ফলে তিনি তার চারদিকের সব কিছুতে আল্লাহ্‌ দেখতে পান।[১]

আল্লাহ্‌র সত্তায় অধিষ্টিত এই 'বাকা' অবস্থায় মনসুর হাল্লাজ ঘোষণা করেছিলেন-'আনাল হক' (আমি পরমসত্তা) তাঁর মতে, মানুষ মাত্রই ঐশ্বরিক। আল্লাহ তাঁর নূর হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহ্‌র চিরন্তন প্রেমের প্রতিচ্ছবি যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র নিজেকে দর্শন করে থাকেন। মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্‌র অভিব্যক্তি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, কারণ মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা। এই জন্যই আল্লাহ্‌ ফেরেস্তাগণকে আদেশ করেছিলেন আদমকে সিজদাহ্‌ করার জন্য।[২]

মনসুর হাল্লাজের এই চিন্তাধারা ছিল মানুষের মাঝে আল্লাহ্‌ত্ব আরোপের নামান্তর। আর এজন্যই হাল্লাজকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাঁর ধর্ম বিরুদ্ধ মতের জন্য। দন্ডের প্রাক্কালে তিনি দোয়া করে বলেছিলেন- "আল্লাহ্‌ তোমার ধর্মের উৎসাহে, তোমার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল বান্দা আমাকে হত্যা করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের তুমি দয়া করে, করুণা কর। কারণ, আমার কাছে যা প্রকাশ করেছ তা যদি তুমি তাদের কাছে ব্যক্ত করতে, তবে তারা যা করছে তা করতে পারতনা। যা তুমি তাদের কাছে অব্যক্ত রেখেছ তা যদি আমার কাছে গোপন রাখেতে তবে আমাকে আজ এই দুঃখ ভোগ করতে হত না। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হোক।"[৩]

বাকা পর্যায়ের অর্জিত অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের কিনট প্রকাশ করা উচিত নয়। মনুসর হাল্লাজ স্থুলভাবে এ রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, তাই সাধারণ মানুষ তার অর্থ বুঝতে পারেনি এবং ফলে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।[৪]

---

১. Saiyed Adbul Hai. op. cit. p. 148.

২. Saiyed Adbul Hai. op. cit. p. 149.

৩. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আমাদের সূফী সাধক, ই.ফা.বা. ঢাকা - ১৯৭৭, পৃ. ১৪১.

৪. পরবর্তী সূফীগণ মনুসর হাল্লাজের চিন্তাধারাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মধ্যে একদল মনে করেন, তাঁর (হাল্লাজের) উক্তিটি ছিল যথাযথ। তবে তিনি নিয়মের বিরোধীতা করেছেন। মানুষ মাত্রই সত্য এ ঘোষণা করে তিনি আল্লাহ্‌র গোপনীয়তার প্রতি অন্যায় করেছিলেন। কারণ, এ ধরণের গুঢ় সত্যের পরিবেশণ শুধু কতিপয় নির্ধারিত ব্যক্তির বেলায়ই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আরেক দলের মতে, প্রকৃত পক্ষে তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে একাত্ব হননি, একাত্ম হয়েছিলেন আল্লাহ্‌র একটি গুণের সাথে। তৃতীয় আরেক দল মনে করেন, তন্ময়তার চরম মুর্হুতে হাল্লাজ স্রষ্টা, ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেননি। যিনি 'আনাল হক' বলেছিলেন, তিনি আসলে হাল্লাজ নন, বরং অবচেতন হাল্লাজের মধ্য দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌ একথা বলেছিলেন। এমতটিই অধিকাংশ সূফীর কাছে গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে তাসাওউফ চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ

ইসলামের মরমী ও অতীন্দ্রিয় ভাবধারার নাম আত তাসাওউফ। এর অনুসারীগণকে বলা হয় সূফী। এজন্য এ চিন্তাধারা সর্বসাধারণে সূফীবাদ নামেও পরিচিত। দার্শনিক ও মরমী চিন্তাজগতে এটা একটা ব্যাপক আলোচিত বিষয় চিন্তাজগেতের সর্বত্র সূফী মুখিনতার একটি অপ্রতিরোধ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ডঃ তারা চাঁদ তাঁর 'Influence of Islam on Indian culture' গ্রন্থে যুক্তিদিয়ে বলেছেন- "দার্শনিকরা মুসলিম চিন্তাজগতে নিউ প্লেটনিক ভাবধারা প্রবাহিত করেন এবং যে বীজ তারা বপন করেন সূফীরা সংগ্রহ করেন তার ফসল। গাজ্জালী যদি যাত্রা শুরু করেন গোঁড়ামীবাদ থেকে তবে তার উত্তরণ ঘটে মরমীবাদে (Mysticism)."[১] "চিন্তার সকল পথই সূফীবাদের দিকে ধাবিত হয়, তা মুতাজিলাদের দ্বন্দ্ববাদ হোক বা গোড়া চিন্তাপদ্ধতি হোক কিংবা হোক তা বিশুদ্ধ অধিবিদ্যা। দৃশ্যত এই সমমুখিনতার করা শুধু যৌক্তিকতার প্রয়োজনে নয় এর কারণ নিহিত ছিল সমাজের অনেক গভীরে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজের প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি ক্ষয় ও বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের দরুন আব্বাসীয় খিলাফতের পতন সহ আরও অনেক কারণ এর সঙ্গে যুক্ত। চিন্তার রাজ্যে এর ফল খুবই পরিস্কার। দ্বাদশ শতকের পর থেকে সূফীবদের প্রভাব অপ্রতিহত হয়ে দাঁড়ায়।"[২]

ইসলামে সূফী প্রবণতার প্রথম শুরু এবং এর ক্রমবিকাশ কিভাবে হয় দেখা দরকার। মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় সূফী শব্দটি প্রচলিত ছিল না। তবে সূফীসূলভ আচরণ তার জীবনে পালিত হয়েছে। তার ইন্তিকালের দুইশত বৎসরের মধ্যে সূফীবাদ প্রচলিত হয়। তাই অনুমিত হয় যে, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সূফীবাদ (আর তাসাওউফ) এর উদ্ভব ঘটে। এজন্য কেহ কেহ[৩] সূফীবাদকে গ্রীক দর্শনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। এ ধারণা ভ্রান্তি প্রসুত; এর কোন ঐতিহাসিক ভিক্তি নেই। আত্তাসাওউক বা সূফীবাদ ইসলামেরই অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ইসলামের মত পুরাতন।[৪] ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সূফীবাদের আগমন ঘটেছে। মহানবী (সঃ) এর জীবনধারা হতেই এর উৎপত্তি ও সূচনা হয়েছে। মহানবী (সঃ) এর হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন আরাধনা, ভোগ-বিলাসহীন সহজ-সরল জীবন-যাপন, আল্লাহ উপর নির্ভরশীলতা ও তার নিকট হতে মাহাষ্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সূফীবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মানবাত্মা ও পরমাত্মা, বিশ্বজগত পরমসত্তার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মহানবী (সঃ) এর উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী সূফীবাদের মুলভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। আল-কুরআনের বাণীতে ও মরমী সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়। প্রধানত: মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সূরা ও মাঝে মাঝে মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া সূরার মধ্যে প্রগাঢ় ধর্মীয় ভক্তি ও তাপস সূলভ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।[৫] যে সব সূরায় পূর্ণ আত্মনিবেদন ও বৈরাগ্যের সুর ধবনিত হয়েছে।

---

১. ড. তারা চাঁদ (অনূ এস, মুজিব উল্লাহ্) ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ ইং পৃ. ৬০.

২. ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৩. R.A.Nichclson, Studies in Islamic Mysticism, Combridge-1221. p. 1- 3.

৪. S.M. Nadvi, MUOim thought and its Sources, p.79.

৫. আল-কুরআন, সুরা-৩৪, আয়াত ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

যেমন-"তিনি (আল্লাহ) আদি ও অন্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা।"[১] "এ পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া কৌতুক ব্যতিত কিছুই নয়, পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।"[২] "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তার পথে সংগ্রাম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৩] "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে থাকেন।"[৪] "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসর্ম্পনকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো না।"[৫]

"আল্লাহ্ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচ পাত্রটি উজ্জল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পূত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়, যা পূর্ব মুখী নয় এবং পশ্চিম মুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি । আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।"[৬] "আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত, আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা দোয়া করে, তাদের দোয়া করে তাদের দোয়া কবুল করে নেই যখন আমার কাছে দোয়া করে।"[৭] "আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কু-চিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"[৮] "আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র প্রতিই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল।"[৯] "আল্লাহ্র ক্ষমতা তাদের ক্ষমতার উর্ধ্বে।"[১০] "আল্লাহ্ পুর্ব ও পশ্চিমে আছেন, কাজেই যেখানেই তোমাদের মুখমন্ডল ফিরাওনা কেন, সেখানেই আল্লাহ্ আছেন।"[১১]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিশ্বজগত ঐশী শক্তির মূর্ত প্রকাশ, সৃষ্টি আল্লাহ্র শক্তির অভিব্যক্তিমাত্র। আল্লাহ্ মানুষের ধমনীতে বিরাজিত। আল্লাহ্র আত্মপ্রকাশের উচ্ছার ফলই বিশ্বজগত সৃষ্টির মূল কারণ। যেমন হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে-"আমি ছিলাম একটি গুপ্তধন এবং আমি চাইলাম জ্ঞাত হতে। সুতরাং আমি নিজেকে ব্যক্ত করার জন্যই এই জগত এবং জগতের সবকিছু সৃষ্টি করলাম।"[১২]

---

১. আল-কুরআন, সূরা-৫৭, আয়াত -৩
২. আল-কুরআন, সূরা-আন কাবুত, আয়াত - ৬৪
৩. আল-কুরআন, সূরা-মায়িদাহ্, আয়াত-৩৫
৪. আল-কুরআন, সূরা - ২, আয়াত - ১৯৪
৫. আল-কুরআন, সূরা-৩, আয়াত - ১০২
৬. আল-কুরআন, সূরা- নূর, আয়াত - ৩৫
৭. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত - ১৮৬
৮. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ, আয়াত - ১৬
৯. আল-কুরআন, সূরা-সূরা -৩, আয়াত -১০৯
১০. আল-কুরআন, সূরা-৪৮, আয়াত-১০
১১. আল-কুরআন, সূরা -২, আয়াত -১১৫
১২. হাদীস-ই-কুদসী

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাসাওউফের বীজ ইসলামের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই রোপিত হয়েছে। মহানবী (সাঃ) নিজেও সূফীসুলভ ভাব ব্যক্ত করেছেন এবং হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাঁটিয়েছে। তাকে মাঝে মাঝে আত্মসমাহিত অবস্থায় দেখা গেছে।[১] তাঁর বহু সংখ্যক সাহাবা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁর একদল সাহাবা ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই সূফীর তন্ময়তা ও ভাববিহবলতার অনুশীলন করতে থাকেন। তারা সর্বদাই মসজিদ-ই-নববীর একপার্শ্বে ইবাদত প্রার্থনা ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং জাগতিক কাজ-কর্মে তারা তেমন একটা ব্যাপৃত থাকতেন না। হযরতের (সঃ) এ সকল সাহাবা 'আহল-ই-সূফফা' বা 'আসহাব-ই-সূফফা' নামে পরিচিত। সূফী শব্দটি এখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে অধিক যুক্তি যুক্ত মনে হয়।

ইসলামের খলিফাগণ কর্মব্যস্ত শাসক হওয়া সত্বেও তাঁরা জাগতিক চাকচিক্য পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে তাঁরা আল্লাহ্‌র চিন্তায় সমাহিত থাকতেন। ফলে, তাঁদের বাহ্য জ্ঞান আছে কিনা বাইরে থেকে বুঝা যেত না। এ প্রবণতা প্রথমে সীমিত সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে দেখা যেত। অতঃপর ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এর হত্যাকান্ডের পর মুসলিম জগতে নেমে আসে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। ফলে মুসলিম সমাজে সন্ন্যাস ভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সৈয়দ আমির আলী তাঁর 'The Spirit of Islam' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন - "হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাত বরণ করার পর মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক আকাশে নেমে আসে কালমেঘের ঘনঘটা। এর পরিণতিতে দুঃখজনকভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয় হযরত আলী (রাঃ) কে। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে বিধ্বস্ত হয় আদি ও সত্য খিলাফত। তার ফলে যে প্রবল আলোড়ণ সৃষ্টি হয়, মদীনায় হত্যা ও লুণ্ঠনের পর যে ভীতির সঞ্চার হয় আর দামেস্কের অধিকতর অসচ্চরিত্র শাসন কর্তাদের আমলে যে বর্বরতা সমাজ জীবনে নেমে আসে, তা বহু নিষ্ঠাবান মুসলমানকে একান্তে ইবাদাত বন্দিগীতে মশগুল হতে বাধ্য করে এবং তাকওয়া হতে মাত্র এক হাত দূরে অতীন্দ্রিয়রাদের দিকে ঠেলে দেয়। এখান থেকেই ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদ স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে থাকে।"[২]

আল্লামা ইকবার তাঁর 'The Development of Metaphysics in Parsia'.গ্রন্থে সূফীবাদের উৎপত্তির আলোচনা করতে গিয়ে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা সমূহ বিশ্লেষণ করেছেন, যা সূফীবাদের উদ্ভবের পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তিনি এর পেছনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। "(i) The continued political unrest and secularism of the Umayyads drove men to seek Shelter under devotional spirit.

---

১. হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "হযরত যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁকে আমরা হঠাৎ করে চিনতে পারতাম না। তাঁর মুখাবয়বের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত যে মনে হত তিনি অন্য জগতের মানুষ এবং পাশ্ববর্তী লোকদেরকে চিনেন না। এ ছাড়া তিনি যখন নামায আদায় করতেন, তখন নিকটবর্তী তার শরীরের মধ্যে একটি বিস্ময়কর শব্দ শুনতেন। ডেক্সিতে গোশ্‌ত রান্না করার সময় ডগবগ করে যে শব্দ হয় , অনেকটা তদ্রূপ।" (ড.মুহাম্মদ রুহুল আমীন উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪)

২. সৈয়দ আমির আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫

Dhaka University Institutional Repository

(ii) The Sceptical tendencies of Islamic Rationalism necessitated an appeal to a super intellectual source of Knowledge.

(iii) The unemotional piety of the various schools of Islam the Hanafites, The shafites, the Malikites and the Hanbalites.

(iv) The Theological controversy between the Asharites and the Rationalists tended to stir up the spirit to rise above all petty sectarian wranglings.

(v) The growth of wealth tending to produce moral laxity and religious indifference and the growth of rationalistic tendncy softening religious fervency.

(vi) The personal influence of the christian hermits leading to the growht of unworldliness"[১]

খুলাফা-ই- রাশিদার পর এরূপ রাজনৈতিক টানা পোড়নে ধর্মতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ ও বির্তকের কোন্দল থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এ সকল নিঃস্বার্থ সরল প্রাণ মুসলমান জাগতিক সুখ-শান্তি, আরাম-জৌলুস ত্যাগ করে পরমসত্তা আল্লাহ্‌র আরাধনা ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং সর্বকাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করতেন। ক্রমবর্দ্ধমান এ দল সমাজে অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন দখল করেন। " আত্মিক উন্নতিকামী এ সব মুসলমান বিদেশী কোন ভাষা জানতেন না এবং গ্রীক কিংবা আর্যদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পাননি কিংবা দার্শনিকদের শিক্ষার সংস্পর্শে আসেননি। তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র ধ্যানে সময় ব্যয় করতেন। আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কিছু চিন্তা করার সময় তাঁদের ছিল না। এ সকল ধ্যানী ও পূণ্যবান মুসলমান যে সর্ব বিষয়ে মূলতঃ সূফী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের সূফী বলা হত কিনা তাব কথা নয়।"[২]

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের তৎপরতা, আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছু বিসর্জন, জাগতিক চাকচিক্য ও অহংকারে প্রতি অনীহা, সুখ-সম্পদ ও শক্তিসহ সব প্রচলিত মানবীয় উচ্চাশন পরিত্যাগ এবং আল্লাহ্‌র প্রেমে নিবেদিত নিঃসঙ্গ জীবন নির্বাচন এসবই ছিল মুসলিম যুগের প্রথম তিনশতকের সূফীগণের মূল বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাস ও অনুশীলনের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল মুসলমান। তাঁদের আচরণের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মত্যাগ, আত্মংযম, আল্লাহ্ ভক্তি ও ইহজগতের প্রতি বিতৃষ্ণা।[৩] কুফা ও বসরা ছিল তাদের প্রধান কেন্দ্র। দার্শনিক আরবেরীর মতে, সূফী শব্দটি প্রথম কুফাবাসী আবু হাশিম উসমান বিন শরীফ থেকে শুরু হয়।[৪] তাঁর মৃত্যু হয় ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কিন্তু সূফী লেখকদের তালিকায় প্রথম অন্তর্ভূক্ত হন ইমাম জাফর সাদিক (মৃ. ৭৬৫ খৃ); হাসান আল বসরী (মৃ.ঃ ৭২৮ খৃ); যাবির বিন হাইয়ান (মৃ. ৭৮০

১. Dr. Mohammad Iqbal, The development of Metaphysics in parsia. p. 98. 101.

২. S.M. Nadvi, op. cit. p. 80

৩. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. p. 103.

৪. A.J. Arberry, The Doctrine of Sufis , London, Cambridge University Press. 1950. p. 35.

Dhaka University Institutional Repository

খৃ); ওয়াইশ আল কারণী (রহ.); দাউদ আল তাঈ (মৃ.৭৮২ খৃ); ইবরাহীম ইবন আদহাম (মৃ.৭৭৭ খৃ); শফিক বলখী (মৃ.৮১০ খৃ); রাবিয়া আল আদাবিয়া (মৃ.৭৫৩ খৃ); ফাদিল বিন ইয়াজ (মৃ.৭৯৪ খৃ); মারুফ আল কারখী (মৃ. ৮১৫খৃ); হাবিব আযমী (মৃ. ৮৯৯ খৃ); হারিস আল মুসাহিবি (মৃ. ৮৫৭খৃ) প্রমুখ।

তাঁদের বিশ্বাসের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের সমুদয় ইচ্ছা আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করা। তাঁরা আল্লাহ্‌র দয়া ও বৈষয়িক সম্পদ কামনার চেয়ে বেশী চাইতেন ঐশীজ্ঞান। পাপ সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন ও ঐশী শাস্তির ভয়ে ভীত। তবু আবেগ জড়িত ও ধ্যানমগ্ন হবার একটা প্রবণতা তাঁদের ছিল, যদিও ধর্মের বাহ্যাড়ম্বরে তাঁদের আগ্রহ ছিল অনেক।[১]

হযরত রাবিয়া আল বসরী (রহ.) এর বক্তব্যের অনেক জায়গায় আবেগ প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-"হে প্রভূ! যে (ধৃষ্ট) হৃদয় তোমাকে প্রেম করে তাকে আগুন দিয়ে পোড়াও।"[২] "পুণরুত্থানের দিনের আহবানে জেগে না উঠে হে আমার হৃদয়, আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে।"[৩] "আল্লাহ্‌র প্রেম এতবেশী আমাকে নিমগ্ন করেছে যে, আর কারো প্রেম বা ঘৃণাই আমার অন্তরে নেই।[৪] (Love of God has so absorbed me that neither love nor hate of any other thing remains in my heart).

ওয়াইশ আর কারণী (রহ.) হারুন ইবনে হাইয়ানকে বলেছেন- "আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে, আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) এর মৃত্যু হয়েছে, নূহ (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ) এর মৃত্যু হয়েছে, আমরানের পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ইহজগত ত্যাগ করেছেন, তাঁর খলিফা আবূ বকর (রাঃ) এর মৃত্যু হয়েছে, আমার ভাই উমর (রাঃ) মারা গেছেন, আমার বন্ধুরা মারা গেছেন, --------- এবং এটাই আমার শেষ উপদেশ, আল্লাহর গ্রন্থকে সামনে রাখ, ন্যায়বানদের পথ ধরে চল, মৃত্যুর কথা কখনও বিস্তৃত হয়ো না।"[৫]

সূফীবাদের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় নবম শতাব্দীতে। প্রথম দিকের সূফীবাদ ছিল একেশ্বর ভিত্তিক, পরে শিয়া ও বৈদেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিশে দ্বিতীয় পর্বে পরিপূর্ণ সর্বেশ্বরবাদীরূপে উদ্ভব হয়। এ সময়কার সূফীগণ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। সমমনা সূফীগণ কয়েকজন আধ্যাত্মিক গুরুকে কেন্দ্র করে মিলিত হযেছিলেন। দর্শন চিন্তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, কোন বিশেষ মত পদ্ধতির প্রতি অধিক গুরুত্ব দান, সংগঠনের বিস্তার প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি মতধারা ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। হুজউইরী এটাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুসাভী ছিলেন খৃষ্টান প্রবণতার লেখক। এদের বিরোধিতা করতেন আল কুশাইরী বা মালামুতরা । এরা জাগতিক ব্যাপারে ছিলেন চরম অনাসক্ত এবং এবং মনুষ্যসঙ্গ বর্জন করে চলা বলে বিশ্বাস করতেন। বাগদাদের জুনায়েদ (রহ.) এর অনুসারীরা ছিলেন দূরদর্শী ও মিতব্যয়ী। তারা

---

১. ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪.

২. De slane, Ibn Khallikan, vol - 1. p-299.

৩. R.A. Nicholson, Kashful Mahijub, p.91.

৪. H.A. Gibb, Mohamedanism, Nweyork-1949. p. 103.

৫. R. A. Nichalson, Tadhkirat-al- Aulya, pp. 20.21.

Dhaka University Institutional Repository

আনুষ্ঠানিকতার নিন্দা করতেন এবং ধর্মীয় নিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। সহলীরা আত্মনিগ্রহের প্রতি বেশী জোর দিতেন। আবূ সাঈদ খাররাজ প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রলয় (ফানা) ও বিদ্যমানতার (বাকা) তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। সর্বশেষে চরমপন্থী সূফীরা মূর্ত আবির্ভাব (হুলুল) একীভূত হওয়া (ইমাতিয়াদ)ও আত্মার দেহান্তর গমন (নসখ-ই-আরওয়াহ) প্রভৃতি তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। ১

মিসরের অধিবাসী হযরত যুন্নুন (রহ.) (মৃ. ৮৬০ খৃ) নব সূফীবাদকে প্রথমে বিধিবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট্য সূফী ও দার্শনিক পন্ডিত। সূফীগণ তাঁকে তাঁদের সম্প্রদায়ের আদিগুরু বলে থাকেন। মোল্লা জামী বলেছেন - "তিনিই (যুন্নুন) আমাদের সম্প্রদায়ের আদি প্রর্বতক। অন্যান্য সূফী তাঁরই বংশধর, তাঁরই আত্মীয় মাত্র।" ২ যুননুন মিসরীর (র.) মতে, বিরহীর সম্মুখে ভয়ের আগুন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত এক ফোটা পানিরই মত। প্রেমিকের সাথে বিচ্ছেদ অপেক্ষা হৃদয় বিদারক কোন বস্তু নাই। প্রকৃত সূফী ঐ ব্যক্তি যিনি অবস্থানুসারে কথা বলেন। এমন কথা তিনি বলেন না, যার তার মধ্যে নাই। যখন তিনি চুপ করে থাকেন, তখন তার কাজসমূহ তাঁরই অবস্থা প্রকাশ করে। সৃষ্টি হতে বিচ্ছেদই তাঁর আসল অবস্থার প্রকাশ। তত্ত্বজ্ঞানী সব সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত। তিনি সব সময়ই আল্লাহ্‌র নিকট হাজির। আরিফা বা তত্ত্বজ্ঞানী সেই ব্যক্তি যিনি সৃষ্টির মধ্যে বাস করেও সৃষ্টি হতে পৃথক থাকেন অর্থাৎ তিনি জনসমাজে বাস করেও তাঁর অন্তঃকরণ সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত থাকে। তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ---------- আল্লাহ্‌র সত্তার পুর্ণজ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃত খোদা প্রেমিক ওলীগণ বা সাধুগণের লভ্য। তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌কে সন্দর্শন করেন, আল্লাহ্ তাদের অন্তরের এমন মারিফাতের তত্ত্বসমূহ ও পূর্ণসত্তা প্রকাশ করেন যা তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও প্রকাশ করেন না। মাআরিফাতের আসল বস্তু আল্লাহ্‌র গোপন তত্ত্বের সন্ধান দেয়া, যার কারণে নূরের সুক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় ও সূর্যের আলো দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়। প্রকৃত আরিফ বা তত্ত্বজ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যিনি জ্ঞান চক্ষু এবং দৃষ্টিশক্তি বা অন্তর্চক্ষু দ্বারা গোপন তত্ত্বের গুণ সন্দর্শন করেন। আরিফ আল্লাহ্‌র নিকটে এমনকি তাঁর তার সাথে মিলিথ থাকেন। তার পরিবর্তনই আল্লাহ্‌রই পরিবর্তন। আল্লাহ্‌র কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়; তাঁর চক্ষু আল্লাহ্‌র চক্ষু, যা তার বাইরের দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে।৩ তিনি বলেন-"অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আলোকের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র আমাদের অন্তরের অন্তরালে তাঁর বাণী প্রেরণ করেন।"৪

হুজউইরীর 'কাশফ-উল-মাহযুব' এবং ফরিদ উদ্দীন আত্তারের 'তাযকেরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে যুন্নুনকে উপলক্ষে করে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

অতঃপর যুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) (মৃ.৯১০ খৃ) যুনযুন মিসরীর মতবাদ লিপিবদ্ধ ও সুসংহত করেন এবং তাঁর শিষ্য আশ্‌শিবলী (মৃ. ৯৪৬ খৃ) উহার আরও পরিবর্ধন সাধন করেন। এ সকল সূফী আল্লাহ্‌র সাথে আল্লাহর মিলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও তারা সর্বখোদাবাদী (Pantheism) ছিলেন না।

---

১. ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
২. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬.
৩. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৪. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত বায়িজীদ বিস্তামী (মৃ. ৮৭৪-৭৫ খৃ) যুন্‌নুন মিসরীর মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি তাঁর চিন্তাধারায় সর্বখোদাবাদীর দিকে ইঙ্গিত করেন এবং তিনিই প্রথম 'ফানা' মতবাদ প্রবর্তন করেন। কিন্তু নিজের মতবাদ প্রবলভাবে ধারণ করার জন্য ইসলাম জগতে যিনি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি হলেন হুসাইন বিন মনসুর আল-হাল্লাজ (৮৫৪ - ৯২২ খৃ) পরবর্তীকালে ইবনুল আরাবী ও আব্দুল করিম জিলীর মতবাদের মধ্যে এবং আবু সাইদ ইবনে আবুল খায়েরের কাব্যে মনসুর হাল্লাজের মতবাদের প্রভাব পড়ে এবং এ প্রভাব ভারতসহ দূরবর্তী দেশসমূহে বিস্তৃত হয়। ইমাম গাযযালী. হুজউইরী ও ফরিদ উদ্দীন আত্মার প্রথাগত দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে এই মতের সমন্বয় সাধন করেন।[১]

মনসুর আল হাল্লাজ (রহ.) আল্লাহ্ ও মানবের একাত্মতার প্রথম প্রবক্তা ও প্রচারক। তাঁর মতে মানব সত্তা ঐশীসত্তার সঙ্গে মিশে গেলে সাধক আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত দ্রষ্টায় পরিণত হয় এবং বলে উঠে 'আনাল হক' আমিই পরম সত্য। হাল্লাজ নিজেই এই উক্তি করেছিলেন। তাঁর উক্তি ইসলাম বিরোধী মনে হওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন এবং সাত বৎসর বাগদাদে কারাবাস ভোগ করেন। তারপর সাত মাস ধরে বিচারের পর তাঁর মৃত্যু দন্ড হয় এবং বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতার সাথে তাঁকে হত্যা করা হয়।

মনসুর হাল্লাজের মতে, "সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তাঁর নিজের মধ্যে একা ছিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলতেন, নিজের মহিমা ধ্যান করতেন, সেই অনির্বচনীয় অনুভূতিই হল প্রেম। প্রেমই হচ্ছে সবকিছুর সার। সার বস্তার সারবত্তা। মূর্তরূপে প্রকাশের যা অতীত। তিনি তাঁর একাধিত্বের মধ্যে ছিলেন প্রেমে উদ্ভাসিত এবং সেই দ্যুতিময়তা থেকে বেরিয়ে আসে তাঁর বহুবিধ গুণ ও নাম। তার পর পরমানন্দের মহিমা উপলব্ধির জন্য প্রকাশিত হলেন তাঁর গুণাবলী ও নামের মধ্যে। এই হলেন আদম। আল্লাহ্‌র পরমসত্তা (লাহুত) মানবীয় সত্তায় (নুসুত) পরিবর্তিত হল। -----ঐশী আত্মা যেখানে উদ্ভাসিত হয় আমি যাকে ভালবাসি আমি তাই হয়ে যাই , সেও হয়ে যায় আমি, দু'টি আত্মা একসত্তায় লীন হয়ে যায়। আমাকে দেখা তাই হয়ে যায় তাঁকে দেখা, তাঁকে দেখা হয়ে যায় আমাদের সবাইকে দেখা। বাহ্যত মনসুরকে পুরোপুরি একত্ববাদি মনে হয় না। যদিও তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আমিই আল্লাহ্' (আনাল হক), কেননা তাঁর ধারণায় পরমসত্তা ও তাঁর ভাবমূর্তির মধ্যে স্তরগত ও গুণগত পার্থক্য আছে।"[২]

আবু নসর সাররাজী (মৃ. ৯৮৮ খৃ) 'কিতাব আল লুমা'তে এবং আল কুশাইরী (মৃ. ১০৭২ খৃ) 'রিসালায়েত'এ সূফী চিন্তাধারা সমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা সূফী চিন্তাজগতে সৃষ্টিতে মধ্যবর্তী কর্তত্বের নব প্লেটোবাদী ধারণা আমদানী করেন।[৩] একারণেই হয়ত তাদের লেখা হতে জানা যায় যে, সূফীবাদকে সাধারণ মুসলমানগণ সব সময় সুনজরে দেখতে পারেনি।

---

১. ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, ৬৫।

২. Dr. Mohummad Iqbal, op. cit.

৩. ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজগতের দর্পনে প্রতিবিম্বিত শাশ্বত সৌন্দর্যকে আবু সীনা পরমসত্তা বলে মনে করতেন। এভাবে আল্লাহ্ অজ্ঞেয় ও অন্তর্বাসী এই উভয় ধারণা পরিপুষ্ট হয় এবং সর্বখোদাবাদী ধারণা থেকে সমুদয় ভিন্নতা হয়ে দাঁড়ায়, মায়া এবং পার্থক্যবোধের জন্ম হয়, ভ্রান্তি থেকে কেবল জ্ঞানের সাহায্যে যা দূর করা সম্ভব। এ মতবাদের মধ্যে মৌলিক ধারণা তিনটি-প্রথমত ঃ পরমসত্তা, দ্বিতীয়তঃ চেতনার অতীন্দ্রিয় অবস্থার মধ্যে লভ্য জ্ঞান, তৃতীয়তঃ পরমসত্তা নৈর্ব্যক্তিক এবং পরমসত্তা এক।

অতঃপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রচলিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি অনুযায়ী পরম বাস্তব হল নূর বা আলো, অন্যদের মতে জ্ঞান। প্রথম মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন শায়খ শিহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (মৃ.১২০৯খৃ) এবং দ্বিতীয়টির প্রবক্তা ইবনুল আরাবী (মৃ. ১২৪১ খৃ) ও তার ভাষ্যকার আব্দুল করিম জিলী (মৃ. ১৪০৫ খৃ) শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী মারঘে লেখা-পাড়া করার পর আলোপ্পোতে চলে যান। তাঁর স্বাধীন চিন্তা পদ্ধতির জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে কাজীর বিচারে দোষী-সাব্যস্ত করেন এবং সালাহ্ উদ্দীনের নির্দেশে তাঁর প্রাণদন্ড হয়। তিনি হিকম আল ইশরাকের উপর কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সমচিন্তার প্রেক্ষিতে তিনি প্লাটিনাস, মানিও যোরাষ্টারের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর দর্শনে সর্ব অস্তিত্বের চরম উৎস হল আলো (নূর-ই-কাহির), অনন্ত দ্যুতি হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। এই আলো স্বতঃঅস্তিত্বশীল, স্বয়মপ্রকাশ ও সংখ্যাতীত। আলোহীনতা এর নেতি এবং এর প্রকাশের জন্য তা দরকার। তার মতে, অস্তিত্বের উৎস হচ্ছে আলো। দুই প্রকারের তা উদ্ভাসিত হয়। প্রথমত বিমূর্ত অবয়ব ও সীমাহীন এবং তা কোন বস্তুর গুণ ও নয়। এর সার হচ্ছে চেতনা বা জ্ঞান । এটা জাগতিক বুদ্ধির উৎস, ব্যক্তিগত বুদ্ধি এর দূরবর্তী প্রকাশ্য। দ্বিতীয়ত এটা আপতিক, সাকার ও গুণযুক্ত এবং বিমূর্ত আলোর প্রতিবিম্ব ও তার উপর নির্ভরশীল। --------- অদৃশ্য আলো থেকে বস্তু পদার্থ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববস্তুর নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তের সমষ্টি। সব কিছুই মূল আলোর উপর নির্ভরশীল। উৎসের যারা কাছে তারা দূরবর্তীদের চেয়ে বেশী আলো পায়। সবাই অন্তস্থ আবেগ ও চিরন্তন প্রেমের আকর্ষণে আলোর সেই মূল উৎসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই বিশ্বজগত প্রেমের দ্বারা বেঁচে থাকে ও চালিত হয়। মানবাত্মা হচ্ছে বিমূর্ত আলোর উদ্ভাসনের সর্বোচ্চ আবাস স্থল।[১]

ইবনুল আরাবী (মৃ. ১২৪১ খৃ) সূফী দর্শনে সর্বখোদাবাদ (Pantheism) সুশৃংখল ধারায় প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের কাছ থেকে তাঁর দর্শনের উপকরণ সংগ্রহ করে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে 'ওয়াহদাতুল অজূদ' মতবাদ গড়ে তোলেন। যার সার কথা হল মানুষ প্রকৃতির আয়নায় আল্লাহ্ প্রতিবিম্বিত হন। "আল্লাহ্ তার সৃষ্টির প্রতিটি অণুর মধ্যে প্রকাশিত হন। প্রতিটি দৃর্জ্ঞেয় বস্তুতে তাঁর প্রকাশ, সমুদয় বুদ্ধির তিনি অগোচর, কেবল তাদের বুদ্ধিতেই তিনি পরিজ্ঞাত হন, যারা বলেন যে, এই বিশ্ব তার প্রকাশ, চৈতন্যের সঙ্গে দেহের যে সম্পর্ক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তেমনই।"[২] আল্লাহ্ ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে তিনি বলেন, মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্র অবয়ব, আল্লাহ্ হচ্ছেন মানুষের আত্মা।[৩] মানুষের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করেন। মানুষ হচ্ছে সমুদয়

---

১. এমতবাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

২. R. A. Nicholson, Tarjuman- al- aswaq.

৩. R.A. Nicholson. op. cit.

Dhaka University Institutional Repository

গুণের সার, যা সে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করে, আল্লাহ্‌কে মানুষ যখন ধ্যান করে, সেই ধ্যানের মধ্য দিয়ে সে নিজেকেও অনুভব করে। আল্লাহ্ নিজেও মানুষের মাধ্যমে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করেন।

আল্লাহ্‌কে সম্যকরূপে জানতে পারাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। দেহের সীমায় আবদ্ধ থাকা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে পরম মিলন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাস ও ধ্যানের মাধ্যমে এ জ্ঞান লাভ করা যায়। কেননা, এর মধ্যে মানুষের যুক্তিবোধ সকল অবান্তর বিষয় থেকে মুক্ত হয়। মানুষের জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে অতিপ্রাকৃত সম্পর্কে চেতনা লাভ, যেখানে শাশ্বতের সান্নিধানে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগত লুপ্ত হয়ে যায়।

আব্দুল করিম জিলী (মৃ. ১৪০৬খৃ) ইবনুল আরাবীর 'ফুতুহাত আল মুকাই'এর টিকা রচনা করেন এবং সূফীদের উপর ইনসানুল কামিল, নামে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁর গবেষণা নিবন্ধ রহস্যপূর্ণ নানা বিষয়ের অবান্তর আলোচনায় ভর্তি। তাঁর দর্শন ধৈর্য্য ও কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে পাঠ করলেই তার সার নির্যাস গ্রহণ করা যায়। আল্লামা ইকবাল [১] ও নিকলসন [২] তাই করেছেন তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে।

ইসলামের সূফীদের সুসম্বদ্ধ, নিয়মকার্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন ইমাম গাযালী (১০৫৮-১১১১ খৃ)। তাঁরই প্রচেষ্টায় সূফী মতবাদ ও রক্ষণশীল মতবাদের সমন্বয় ঘটে এবং সূফীবাদ সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করে।[৩] এ সময়ে সূফী মতবাদ বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। পরবর্তীকালের লেখকগণ ছাত্রদের জন্য পাঠ্য পুস্তক, সাধারণ লোকের পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি রচনা করেন। তন্মধ্যে জামির ফার্সীতে লেখা 'লওয়াইয়াহ্' সূফী মতবাদের সার সংকলন হিসেবে বিস্তৃত খ্যাতি লাভ করে। আরবী ও ফার্সী ভাষার কবিগণ সূফী দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে সূফী মতবাদকে সর্বশ্রেণীর লোকের মতাদর্শে পরিণত করেন, দার্শনিকগণ সেটা পারেননি। এদের মধ্যে আবু সাদ ইবন্ আবুল খায়ের (মৃ. ১০৪৮ খৃ); উমর ইবন্ আল ফরিদী; আব্দুল কাদির জিলানী (মৃ. ১১৬৬খৃ); হাকিম সানাঈ (মৃ.১১৫০ খৃ); ফরিদ উদ্দীন আত্তার (মৃ.১২২২-১২২৩ খৃ); জালাল উদ্দীন রুমী (মৃ. ১২৭৩ খৃ) শাবিস্তারী (মৃ. ১৩১৭-২০ খৃ) উল্লেখ যোগ্য। সূফীবাদকে এঁরাই সর্বাদিক জনপ্রিয় করে তোলেন। [৪] এঁদের মধ্যে শায়খ ফখরুদ্দীন ইরাকী; শাবিস্তারী, আল কাশানী, আব্দুল করিম জিলী, মোল্লা জামী; শায়খ সাদী; শায়খ সদরুদ্দীন কোনাবী; ইবনুল ফরীদ প্রমুখ সূফীদের উপর ইবনুল আরাবীর প্রভাব কমবেশী আছে।[৫]

এ যুগে পাক-ভারতের সূফীদের মধ্যে খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (মৃ. ১২৩৪ খৃ); বখতিয়ার কাকী (মৃ. ১২০৬ খৃ); ফরিদ উদ্দীন শাকারগঞ্জ (মৃ. ১২৫৬ খৃ) ও নিযাম উদ্দীন আউলিয়া (মৃ. ১২৩৪খৃ)

---

১. Dr. Mohumad Iqbal, op.cit.

২.R.A.Nicholson, Studies in Islamic myslicism.

৩. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯.

৪. ড. রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮.

৫. Sayed Abdul Hai, op. cit. p.113.

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন অগ্রগণ্য।ইবনুল আরাবীর অজুদিয়া দৃষ্টিকোণকে চ্যালেঞ্জ করেন প্রথম রুকন উদ্দীন আলাউদৌলা। তাঁর মতে, বহির্জগত ঐশী সত্তা হতে নিঃসৃত হয়নি, এটা তাঁর প্রতিবিম্ব মাত্র।[১] এ সম্প্রদায় 'শুহুদিয়া দৃষ্টিকোণ' নামে খ্যাত। শায়খ বাহাউদ্দীন (মৃ. ১৩৮৮ খৃ) এ সম্প্রদায়ের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখেন। সপ্তদশ শতক হতে শুহুদীয়া দৃষ্টিকোণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। উপমহাদেশের বিখ্যাত সূফী সাধক শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (মৃ. ১৬২৪ খৃ) এ মতবাদকে পুণরুজ্জীবিত করেন। তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী বা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক নামে খ্যাত।

সূফী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বৈপ্লবিক। তিনি আল্লাহ্ ও জগতের একত্ব বিষয়ক সর্বেশ্বরবাদী ধারণা (ওয়াহ্দাতুল অজূদ) কে খন্ডন করেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির অতি বর্তন প্রমাণ করে।[২] কেননা, ওয়াহ্ দাতুল অজূদ এমন একটি জটিল চিন্তাধারা যার ব্যাখ্যা অনৈসলামী পন্থায়ও প্রদান করা যায়। এই সর্বেশ্বরবাদী ধারণা থেকে যে বাস্তব অনুমানটি গ্রহণ করা চলে তাহল, আল্লাহ্কে বহুভাবে আরাধনা করা যায় এবং সর্বধর্মের মধ্যে সত্য আছে। আল্লাহ্ যদি সব কিছুতে প্রকাশিত হন তাহলে একটা নক্ষত্র, একটা গোবৎস বা যে কোন কিছুকে উপাসনা করা যেতে পারে। কাজেই সমুদয় মতের প্রতি সহনশীলতা থাকা উচিত।[৩] বিপরীতে তিনি 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ' বা আল্লাহ্ হতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি এ চিন্তাধারাকে তুলে ধরেন। তিনি বলেছেন - "সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহ্ মনে করা এবং উক্ত সৃষ্টবস্তুর কার্যাবলী ও গুণাবলীকে আল্লাহ্র কার্যাবলী ও গুণাবলী হিসেবে মনে করা সম্পূর্ণ ভাবে অবাঞ্ছিত। বরং এটা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী অস্বীকারের শামিল।[৪] তিনি স্বীয় শিষ্যবর্গকে এমন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করেন- যা তাসাওউফ সাধনার একটি নতুন পন্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর চিন্তাধারা দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করে। এজন্যই তিনি গৃহীত হন ইসলামে নবপ্রাণের সঞ্চারক হিসেবে। শাহওয়ালী উল্লাহ্ হতে শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী পর্যন্ত অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ-ই-ছোট খাট পরিবর্তন সহ তাঁর শিক্ষাবলী গ্রহণ করেন। যার প্রবাহমান ধারা আজও বিদ্যামান। প্রফেসর সাইদুর রহমানের ভাষায় - "Sufism, Which deeply permeated the life of Muslims all over the world, specially in the sub-continent of Indo-Pakistan, had been responsible for so many un-Islamic idias, creeping into Islam. Infact, Islam had deviated for from its foundamental teachings and it was the Mujaddid who brought it nearer into its original purity. His writings casused a revolution, his idias spread far and wide and he was therefore accepted as the renewer of Islam. Many distinguished sufis such as Shah Waliullah, Khaja Mir Nasir, Khaja Mir Dard, Ghulam Yahya, Shah Rafiuddin and Shah Syed Ahmed Brelwi Who flourished after the Mujaddid accepted his teachirgs with minar mobfications and tried to inspire Muslims Muslims with the motto Away from Platinus and his host and back to Mohammad."[৫]

---

১. ড. রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

২. শায়খ আহমদ সিরহিন্দী, মাকতুবাত শরীফ (১ম খন্ড) মাকতুব নং-২৭২ ও ২৯১

৩. ড. তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৪. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী, মাকতুবাত শরীফ (২য় খন্ড), মাকতুব নং-১

৫. Prof. Sayedur Rahman, op. cit. op. 237-38.

Dhaka University Institutional Repository

তাসাওউফ বা সূফীতত্ত্বের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ

ইসলামে তাসাওউফ বা সূফীতত্ত্বের উৎপত্তি নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে পন্ডিতদের মধ্যে। মুসলিম চিন্তাবিদগণ আল-কুরআনকেই সূফীতত্ত্বের মূল উৎস হিসেবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পন্ডিত যেমন এইচ. মার্টেন, ভেজী, ভনক্রেমার, ই.জে.ব্রাউন, আর.এ. নিকসলসন প্রমুখ তা স্বীকার করেন না। তাদের মতে, এ চিন্তাধারা বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শন, খৃষ্টীয় ও নব্য প্লেটোবাদী দর্শন এবং পারসিক দর্শনের প্রভাবজাত। এখন এই চারটি মত আলোচনা করা থাক।

বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব মতবাদ

এইচ, মার্টেন ও গোল্ডজিহারের মতে, মুসলিম চিন্তায় সূফীবাদের উৎপত্তি ঘটে বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে এসে। [১] যেহেতু বেদান্তের মত বৌদ্ধ মতবাদ ও সূফীতত্ত্বের চেয়ে প্রাচীনতর। সেজন্য সূফীগণ বৌদ্ধ চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। বিশ্বজগত মায়া, মোহ্, মিথ্যা, ক্ষণস্থায়ী ও দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র- ভারতীয় দর্শনে এরূপ যে নৈরাশ্যবাদী মনোভাব ও বৈরাগ্যবাদী জীবনাচরণ লক্ষণীয় তা সেমেটিক মনে আবেদন সৃষ্টি করে এবং এর ফলে বৈরাগ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়। সূফীগণের উন্নত পর্যায়ের 'ফানা' ও বৌদ্ধদের 'নির্বাণ'এই দু'টি বিশ্বাসের সাদৃশ্য হতেই উক্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় যোগী ও ঋষিদের কঠোর সংযম ও কৃচ্ছ্রতা সাধন ও দুঃখবাদী মনোভাব মুসলমানদের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং তাদেরকে সেরূপ জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে।

আরবীয় মুসলমানগণ সাহিত্য সূত্রে ভারতীয় ধারণাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে। এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, পরবর্তী এক পর্যায়ে ভারতীয় চিন্তা অনেক নেতৃস্থানীয় মুসলিম চিন্তাবিদকেও প্রভাবিত করে। [২]

খৃষ্টীয় নয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সন্ন্যাসীগণ মেসোপটেমিয়ায় তাদের কিছু অনুসারী সৃষ্টি করে। হার্টম্যানের মতে, সূফীবাদের উদ্ভব ঘটে সেদিনের বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল খোরাসানে এবং সেই সূত্রেই ভারতীয় ধারণাবলী ইসলামে প্রবেশ করে। সূফীগণের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ম-কানূনের সঙ্গে ভারতীয় অনুশাসন ও আচরণাদির সাদৃশ্য বিদ্যমান।[৩]

এমতটি ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। এ মতের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকার প্রধান ঐতিহাসিক কারণ হল ভারতীয় ভাবধারা যখন মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে তার বহু পূর্বেই সূফীবাদ প্রচলিত ছিল। এটা ইসলামের শুরু হতেই বিদ্যমান। এটা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ইসলামের মতই প্রাচীন। যে কয়জন মুসলমান সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ছিলেন আল বেরুণী। [৪]

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ Goldziher, Mohammad and Islam, New Haven, 1917.

২. Dr. Tara Chand, The Influence of Islam on Indian culture, (Tran. Karunamaya Goswami). Bangala Academy, Dhaka- 1988. p. 55.

৩. Prof. Sayedur Rahman. op. cit. p. 108.

৪. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭- ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

তার বহু পূর্বে হতেই সূফী সাধনা পদ্ধতি কার্যত: পূর্ণাঙ্গভাবে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে মুসলমানগণ ভারতীয় ভাবধারার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ছিল না। ইমাম হাসান বসরী (মৃ.৭২৮ খৃ.); আবূ হাশিম (মৃ.৭৭৭-৭৭৮ খৃ.); যাবির বিন হাসান (মৃ.৭৮০ খৃ.); ইবরাহীম বিন আদহাম (মৃ.৭৭৭খৃ.); রাবিয়া আলবসরী (মৃ.৭৯৪ খৃঃ) প্রমুখ সূফীগণের আবির্ভাব ও সাধনা প্রমাণ করে যে, সূফীবাদ ভারতীয় আমদানী নয়, ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষারই অনিবার্য পরিণতি।

ভারতীয় অনুশাসন ও আচরণাদির সাথে মুসলিম সূফীদের জীবন পদ্ধতির কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে বলেই এটা প্রমাণ করে না যে, ইসলামী তাসাওউফের উদ্ভব ঘটেছে বৈদান্তিক চিন্তাধারা থেকে। কেননা, সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কার্যকারণ নির্ধারণ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা মূলক। এ সাদৃশ্যের প্রকৃতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ড. রশীদুল আলম বলেছেন-"বেদান্ত দর্শনের 'মায়াবাদ' ও সূফীদের জগত সম্পর্কীত ধারণা এক নয়। বেদান্তিকগণ এ জগতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন, কিন্তু সূফীগণ এ জগতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না। তাঁরা এ জগত পরম সুন্দরের প্রকাশ বলে মনে করেন। বেদান্তিকগণের নিকট এ জগত অর্থহীন হলেও সূফীগণের নিকট এ জগত মূল্যবান। কেননা, এ জীবনের সাধনাই মহাজীবনের ভিত্তি রচনা করে। বেদান্তিকগণ তাত্ত্বিক দিক থেকে জগতের অলীকতা স্বীকার করেন কিন্তু সূফীগণ নৈতিক দিক থেকে জগতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ----------সূফীসাধক জীবন জগতের মুরাকিবার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করেন। এছাড়া যাঁরা সাধনা করেন, তারা যে কোন বিভাগেরই হোন না কেন, তাঁরা যে বিলাস-ব্যসনে, আরাম-আয়েশের মধ্যে দিন কাটাতে পারেন না, তাঁরা যে মহান ব্রত উদযাপনের জন্য সংযম ও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করেন, তা শুধু সূফীগণের মধ্যে দেখা যায় না, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক,এমনকি দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কের মধ্যেও দেখা যায়। কাজেই দেখা যায় যে, বেদান্ত দর্শনের মায়ার পেলব কিংবা ভারতীয় যোগীদের কৃতচ্ছ্রতা ও সংযম মুসলিম মরমীবাদের প্রেরণা নয়। উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা বাহ্যিক।"[১]

অধিকন্তু সূফীগণের 'ফানা' মতবাদ বৌদ্ধ 'নির্বাণ' মতবাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফানা নির্বাণের মত কোন নঞর্থক অবস্থা নয়। ফানার পরে রয়েছে, ইতিবাচক অবস্থা বাকা। নির্বাণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রবোধকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তাই পরবর্তী আর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ব্যক্তিত্বের এ ধরনের বিনাশ সূফী জীবনের কাম্য নয়। ফানা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চায় সন্দেহ নেই, তবে এ বিসর্জন শুধু ঐশী চেতনায় স্থায়ী অস্তিত্ব অর্জনের লক্ষ্যেই নিবেদিত।[২] অধ্যাপক নিকলসন ও এ কথা স্বীকার করে বলেছেন-"আমরা বিনাশর্তে ফানা ও নির্বাণের অভেদাত্মক মনে করতে পারি না।-----নির্বাণ নিছক নেতিকবাচক, ফানা পরবর্তী স্তর বাকার (আল্লাহ্‌র চিরন্তন সত্তায় অবস্থান) সাথে সম্পৃক্ত। অবশ্য একথা সত্য যে, পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাবধারা সূফীবাদের বিকাশ লাভে সহায়ক হয়েছে। তাই বলা যায় ইসলামে সূফীবাদের আবির্ভাব ঘটে মুসলমানদের ভারতীয় ধারণাবলীর সঙ্গে যোগাযোগের বহু আগে। আর ভারতীয় ধারণাবলীর মূলস্রোতসমূহ ইসলামের প্রবেশ করে সূফীবাদের উদ্ভবের বহু পরে।"[৩]

---

১ Prof : Sayedur Rahman, op. cit. p. 109.

২. R.A. Nicholson, The Mystics of Islam. p. 9.

৩. R.A. Nicholson, op. cit. p. 9

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্টীয় ও নব্য প্লেটোবাদী মতবাদ

অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিতের মতে, মুসলমানগণ নব্য প্লেটোবাদী খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে ইসলামে তাসাওউফ চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। এই নব্য প্লেটোবাদী দার্শনিকগণ গ্রীক দর্শনের আলোকে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। এসব দার্শনিকগণ জাস্টিনিয়ানের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্বদেশ ত্যাগ করেন। বাদশাহ্ নওশেরোয়ানের আমলে পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁরা তাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে থাকেন। নবম শতাব্দীতে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে খৃষ্টানী মরমীবাদ ও গ্রীক দর্শক মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট বেশ সুপরিচিত হয়েছিল। হিজরী প্রথম কয়েক শতাব্দীতে খৃষ্টানগণ আরব, সিরিয়া, ও তাঁর পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের জনগণের মধ্যে ধর্মমত প্রচার করছিল এবং এঁদের সংস্পর্শে আসার ফলেই মুসলিম সমাজে সূফীবাদ জন্ম লাভ করে। জীবনাচরণের দিক থেকে এসব ধর্ম প্রচারক সদস্য আবর ও সিরিয়ার সর্বত্র কর্মরত ছিল। এজন্যই নিকলসন মনে করেন, ইসলামে মরমীবাদের উৎপত্তি ঘটে এমন এক পরিবেশে যা ছিল গ্রীক দর্শন সম্পৃক্ত।[১]

এমতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। সূফীবাদের সূচনা ঘটেছে ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই। মহানবী (সঃ) ও তঠার সাহাবীগণ ছিলেন এর কর্ণধার। জাগতিক কার্যাবলী সমাধা করেও তারা আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। তারা বাইরের চিন্তাধারার সাথে মিশবার সুযোগ পাননি। তাছাড়া দেখা যায় যে, নবম শতাব্দীর পূর্বেই সূফীবাদ জনসাধারণের মধ্যে একটি বিশেষরূপ পরিগ্রহ করেছে।

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এমত গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ মাত্রই নিজস্ব স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে চায় তার চিন্তা, কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। এ ঝোঁক প্রবণতাই স্বাতন্ত্রের চরম উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যায়। নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা দ্বারা গঠিত না হলে কোন বিদেশী প্রভাব জনগণের মন ও মানসিকতাকে নতুন কোন ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনা। তাই আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "কোন ধারণাই কোন জাতির মনকে অধিকদিন ধরে রাখতে পারে না, যদি সে ধারণা তাদের নিজস্ব না হয়।"[২]সুতরাং বলা যায় যে, ইসলামের সূফীবাদ বাইরের কোন ভাবধারা হতে উৎপত্তি হয়নি। এটা ইসলামের ক্রুনেই তৈরি এবং মুসলিমজাতিরই চিন্তাধারার ফসল।

পারসিক প্রভাব

ই.জে.ব্রাউন ও তাঁর অনুসারীদের মতে, পারসিকগণ ইসলামের সূফীবাদের প্রবর্তক।[৩] তাঁদের মতে, আরবদের পারস্য বিজয় ছিল একটি নিকৃষ্ট জাতির অপর একটি উৎকৃষ্ট জাতির উপর আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস। পারসিকগণ ছিল প্রধানত অগ্নি উপাসক এবং তারা যখন আরবগণের শাসনে আসে, তখনও তাদের মনে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা উপস্থিত ছিল। রাজনৈতিক হতাশা তাদের মধ্যে এমন এক

১. R.A.Nicholson, op. cit. p. 15
২. Sir Md. Iqbal. The development of Metaphysics in Persia.p.76.
৩. দ্রষ্টব্য, E.J. Brown; The Prospects of Islam, London, 1944.
১. Roice, The Persian Sufism, London, 1964. p. 39-54.

Dhaka University Institutional Repository

নৈরাশ্যবাদ ও বৈরাগ্যবাদের বিস্তার ঘটায়, যা পরিণতি লাভ করে মরমীবাদে।[১] বস্তুত, পরবর্তী সূফীগণের অধিকাংশেরই আবির্ভাব ঘটে পারস্য দেশে।

পারস্যবাসীদের মনের উপর রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও সহজাত মানসিক পবিত্রতার প্রভাব মরমী চিন্তাধারার বিকাশে সহায়ক হয়। সূফীতত্ত্বের বিস্তার ও উন্নতিতে পারস্যবাসীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তবে তারাই সূফীতত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন-এটা সত্যের অপলাপ মাত্র। অধ্যাপক নিকলসন তাই প্রশ্ন তুলেছেন-"If sufism was nothing but a revelt of Aryan spirit , how are we to explain the undoubted fact that some of the leading pioneers of Mohummadan Mysticism were natives of Syria and Egypt and Arabs by race."[২]

সুতরাং পারস্য হতে সূফীবাদের উৎপত্তি হয়েছে এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়না। এমনকি পরবর্তীকালের কয়েকজন প্রভাবশালী সূফী যেমন- ইবনুল আরাবী, ইবনুল ফরিদ, আরবী ভাষা-ভাষী লোক ছিলেন কিন্তু তাঁদের দেহে পারসিক রক্ত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পারসিকদের সংস্পর্শে আসার পূর্বেই সূফীবাদের উৎপত্তি হয়।

কুরআনীয় মতবাদ

বাইরের কোন চিন্তাধারার প্রভাবেই ইসলামে সূফীতত্ত্বের উদ্ভব হয়নি, উপর্যুক্ত আলোচনায় তাই প্রমাণ পাওয়া গেল। পবিত্র কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলমানদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে সূফীতত্ত্বের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আল্লাহ্‌র প্রেম ও আল্লাহ্‌র নিঃস্বার্থ ঐকান্তিক অনুরাগ সূফীতত্ত্বের মূলকথা। এটা ইসলামের বাতিনী দিকের বিকাশ। ইবনে খালদূন তাই বলেছেন- "এটা (সূফীতত্ত্ব) হল ইসলামের উদ্ভূত ধর্মীয় বিজ্ঞানের অন্যতম। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমান ও তাদের মধ্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেমন রসূল করীমের (সঃ) সাহাবা, তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ (তাবিঈন) এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের লোকেরা সূফীদের অনুসৃত পথকে মনে করতেন সত্য ও নাজাতের পথ। ধর্ম-কর্মে কঠোর হওয়া, আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছু বর্জন করা, পার্থিব চাক-চিক্য ও অনাবশ্যক আড়ম্বর হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, মানবীয় আকাংখার সাধারণ লক্ষ্যবস্তু আনন্দ, সম্পদ, ও ক্ষমতা বর্জন করা, সমাজ ত্যাগ করে সম্পুর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মসমাহিত নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন প্রভৃতি ছিল প্রচলিত সূফীতত্ত্বের বুনিয়াদী নীতি।"[৩]

পবিত্র কুরআনে একশ্রেণীর আয়াত রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক ও মরমীবাদী ভাব বহন করে। এ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূফীতত্ত্বের সুত্রপাত ঘটে। যেমন-

১."নিশ্চিতে বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?"[৪]

---

২. R.A. Nicholson, op. cit. p.9.

৩. ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, বৈরুত, পৃ. ১৪৬৭

৪. আল কুরআন, সূরা-আয-যারিয়াত, আয়াত ২০- ২১

১. আল-কুরআন, সুরা-২, আয়াত - ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

(২)" আর আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত, আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা দোয়া করে, তাদের দোয়া কবুল করে নেই যখন আমার কাছে দোয়া করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পরে।"[১]

(৩) " আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিটবর্তী।"[২]

(৪) "আল্লাহ্ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের জ্যোতি।" [৩]

(৫)"দ্যূলোক-ভুলোক ব্যাপিয়া তাঁর সিংহাসন বিরাজমান।"[৪]

(৬) "তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন।" [৫]

(৭) " তিনি (আল্লাহ্) আদি ও অন্ত, প্রকাশ্য ও গুপ্ত, তিনি সর্বজ্ঞাতা।"[৬]

(৮)"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই, সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকেই আল্লাহ্র প্রসন্ন দৃষ্টি দিপ্যমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞানী।"[৭]

(৯)"আমি (আল্লাহ্) তাদের মধ্যে আমার রুহ প্রবিষ্ট করেছি।"[৮]

(১০)"তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসে।"[৯]

(১১)"অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"[১০]

পবিত্র কুরআনের ন্যায় হাদীসেও সূফীতত্ত্বের ভিত্তি অনুসৃত হয়। নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী ও কর্মের মধ্য দিয়েও তাসাওউফের জন্ম হয়। যেমন-

১. "নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষকে তার নিজ সুরত অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন।" (হাদীস)

২. " মুমিনের হৃদয় আল্লাহর সিংহাসন।" (হাদীস)

৩. "আমি যা বলেছি তা শরীআত, যা করেছি তা তরীকত, যা দেখেছি তা হাকীকাত এবং যা চিনেছি ও জেনেছি তা মা'আরিফাত।" (হাদীস)

৪. "আসমান ও যমিন আমাকে ধারন করতে পারেনা কিন্তু মুমিনের হৃদয়ে আমার স্থান হয়।" (হাদীস-ই-কুদসী)

৫. "মানুষ আমার রহস্য আমি মানুষের রহস্য।"(হাদীস-ই-কুদসী)

৬. "আমি গুপ্ত ভান্ডারে নিহিত ছিলাম এবং আমি প্রকাশ হতে ইচ্ছা করলাম। সেজন্যই আমি এসব সৃষ্টি করলাম ও প্রকাশ করলাম। (হাদীস-ই-কুদসী)

---

২. আল-কুরআন, সুরা-৫০,আয়াত -১৬
৩. আল-কুরআন, সুরা-২৪, আয়াত - ৩৫
৪. আল-কুরআন, সুরা-২, আয়াত - ২৫৫
৫. আল-কুরআন, সুরা-৫৭, আয়াত - ৪
৬. আল-কুরআন, সুরা-৫৭, আয়াত - ৩
৭. আল-কুরআন, সুরা-২, আয়াত - ১১
৮. আল-কুরআন, সুরা-১৫, আয়াত - ২৯
৯. আল-কুরআন, সুরা-৫, আয়াত - ৫৪
১০. আল-কুরআন, সুরা-২, আয়াত -১৫২

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে এমনি আরও বহুবিধ আয়াত রয়েছে, যার মধ্যে তাওহীদের মৌলিকরূপসহ মরমীবাদী আয়াত ব্যক্ত হয়েছে। নবী করীম (স.)-এর বাণী, কার্যাবলী এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও এভাব ব্যক্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সে সব তাত্ত্বিক ও মরমীবাদী ভাবপূর্ণ বাণীসমূহ মুসলিম মন-মানসিকতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল এবং সেজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইসলামে সূফীতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে।

এটি স্পষ্ট যে, সূফীবাদ হল মরমী সাধকের প্রদত্ত বিশুদ্ধ মতবাদ এবং কুরআন ও হাদীস হল এর কেন্দ্র বিন্দু। এখান থেকে জ্ঞানের উপাত্ত সংগৃহীত হয়। সিডনী স্পেন্সার বলেছেন-" নবীগণের শিক্ষায় সূফীবাদের অনেক কিছুই পাওয়া যায়। একই সঙ্গে নবীগণের আচরণ ও শিক্ষায় মরমীবাদের অনেক বীজ নিহিত রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১] অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মরমীবাদে বাইরের কোন প্রভাব নেই, বরং এ ধরনের সম্ভাবনাকে নাকচ করার অর্থ হল সূফীবাদকে সমসাময়িক সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে সূফীবাদের আন্তঃক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না। সূফীবাদে যে বাইরের প্রভাব রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সূফীবাদ নির্দিষ্ট কোন গন্ডিতে আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত মত ও পথের সমন্বয়ে তা বিকাশ লাভ করেছে।।"[২]

আবার অনেক দার্শনিক মনে করেন যে, সূফীবাদ প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ মতবাদ হিসেবে এককভাবে কুরআনের বিভিন্ন শিক্ষা ও উপাত্ত থেকে জন্ম লাভ করেছে। এজন সূফী মনে করেন যে, সত্য এক ও সর্বজনীন। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশের ফলে এর বহিঃ প্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে পূর্ব বা পশ্চিম যাই বলা হোক না কেন, সত্য নির্দিষ্ট একটি গন্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। এর বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে, রাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এর সমর্থন রয়েছে।"[৩]

সূফী সাধক ও রক্ষণশীল মুসলমান

সূফীতত্ত্ব ইসলামের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা ইসলামের বাতিনী দিক। প্রাথমিক পর্যায়ে সূফী দর্শন রক্ষণশীল ইসলাম থেকে পৃথক ছিল না। পরবর্তীকালে সূফীগণ কুরআনের কিছু কিছু আয়াতের উপর বেশ জোর দেন এবং এগুলোর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এমন কিছু আয়াতকে তারা উপেক্ষা করেছেন, যেগুলোকে সাধারণ মুসলমান সমাজ সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

সূফীগণের আত্ম অস্বীকৃতি ও নিষ্ক্রিয় মনোভাব ইসলামের মূল মর্মবাণী বিরোধী ছিল। কারণ ইসলাম এ জগতকে বাস্তব বলে মনে করে এবং মানুষকে কর্মতৎপর হতে শিখায়। স্বয়ং মহানবী (সঃ) অলস ও নিষ্ক্রিয় মনোভাবে কঠোর নিন্দা করেন। পরবর্তী কালে বহু বিদেশী প্রভাবে তাসাওউফ দর্শন একটি অনুধ্যানিক ও দার্শনিক মতবাদে বিকাশ লাভ করে। ফলে তা রক্ষণশীল ইসলাম থেকে বহু দূরে বিচ্যুৎ হয়ে যায়।[৪]

---

১. Sydney spencer, Mysticism in World Religion, Battimore, 1963. p. 299.

২. ড. এ.কে.এম. শামসুর রহমান, 'আল কুরআন ও সূফীবাদ', ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৭ ইং, পৃ. ২৬-২৭

৩. James Leuba, The Psycology of Religious Mysticism. Baston, 1966. Chapter-one.

৪. Prof. Sayedur Rahman,op. cit. 104.

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ইসলামের এক একটা দিকের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপের ফলে তাসাওউফ ও রক্ষণশালী ইসলামের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন -

(১) রক্ষণশীল মুসলমানগণ কালিমা তায়্যিবাহ্ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' বলতে বুঝেন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রাসূল। রক্ষণশীলগণ মনে করেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র তাৎপর্য হল আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। অন্য দিকে সূফীগণ এর গুঢ় তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেন-আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তা নেই।

(২) সাধারণ মুসলমান সমাজ পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অর্থকেই গ্রহণ করেন। গুঢ় অর্থকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। অন্য দিকে সূফীগণ কুরআনের আয়াতসমূহের উভয়বিধ অর্থই গ্রহণ করেন। তবে তারা গুঢ় অর্থকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

(৩) সাধারণ মুসলমান সমাজ বাহ্যিক আচরণ ও ধর্মের যাহিরী দিকের প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। আর সূফী সাধকগণ আত্মিক বিশুদ্ধির দিকে বেশী নজর দিয়ে যাকেন।

(৪) ইসলামের নবী (সঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে কোন কোন ঘটনাকে বুদ্ধির (আকল) সাহায্যে, কোন কোন ঘটনাকে ঐতিহ্যগত দৃষ্টান্তের (নাকল) সাহায্যে এবং কোন কোন ঘটনাকে স্বজ্ঞার (কাশফ) সাহায্যে ব্যাখ্যা করার পরামর্শ দেন। মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে এই তিনটি উৎস হতে। জীবনের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টির জন্য জ্ঞানের এই তিনটি উৎস হবে প্রয়োজনীয়।[১] এক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান নাকলের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আকলকে কম গুরুত্ব দেয় এবং কাশফের প্রয়োজনীয়তা মোটেই স্বীকার করেনা। অন্য দিকে আকল ও নাকলের তুলনায় সূফীগণ কাশফের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

(৫) আল্লাহ্ মহাক্রমশালী-তিনি পাপীকে শাস্তি দেন, পূণ্যবানকে পুরস্কৃত করেন-রক্ষণশীল মুসলমানগণ এ ভয়ে আল্লাহ্র ইবাদাত করে থাকেন। অন্যদিকে সূফীগণ জান্নাতের লোভ কিংবা জাহান্নামের ভয়ে বিচলিত হন না। তিনি ইবাদাত করেন আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য। কেননা, তাদের মতে, আল্লাহ্ প্রেমময়। রক্ষণশীল মুসলমান মনে করেন, আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রভূ-ভৃত্যের সম্পর্ক। আর সূফীদের মতে, আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রেমাস্পদ প্রেমিকের মাশুক-আশেকের সম্পর্ক।[২]

(৬) রক্ষণশীল মুসলমান শরীআতের বিধি-বিধান অবশ্য পালনীয় বলে মনে করে কঠোরভাবে তা অনুসরণ করেন। এ সব বিধি-বিধান বর্জন করাকে কঠিন পাপ বলে মনে করেন। কিন্তু কোন কোন সূফী শরীআতের বিধান পালনের ব্যাপারের তেমন গুরুত্ব দেন না।[৩]

---

১. Prof . Sayedur Rahman,, op. cit. p. 31.

২. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

৩. Saiyed Abdul Hai. op. cit. p. 174.

Dhaka University Institutional Repository

(৭) রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ ধর্মীয় নির্দেশ ও আচারণ অনুষ্ঠান অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন এবং সেগুলি পালন করেন। আর সূফীগণ ইশ্‌ক বা প্রেমকেই আল্লাহ্‌র দীদার লাভের একমাত্র পথ বলে মনেকরেন।

(৮) সাধারণ মুসলমানের মতে, সৎকার্যাবলী আন্তরিক সততার নিদর্শন, কিন্তু সূফীদের মতে, আন্তরিক সততা ব্যতিত সৎকর্মের কোন মুল্য নেই।

(৯) সূফী আল্লাহ্‌ ও তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন, কিন্তু সাধারণ মুসলমান আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখেন সত্য, তবে তাঁর সৃষ্টির উপর তেমন ভালবাসা রাখেন না।

(১০) সূফীগণ দার্শনিক মনের অধিকারী, কিন্তু একজন সাধারণ মুসলমান তেমন দার্শনিকমনা হতে পারেন না।

(১১) সূফীদের বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার জন্য আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত শায়খ বা পীরের তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজন। রক্ষণশীল মুসলমানদের মতে, ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমেই মুসলমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে শায়খের প্রয়োজন নেই।[১]

(১২) সূফীগণ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্য কতকগুলো মনজিল পার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। রক্ষণশীল মুসলমানগণ এই স্তর সমূহ সম্পর্কে অবহিত নন।[২]

(১৩) রক্ষণশীল মুসলমানদের মতে, মানুষ সাধনায় যতই পূর্ণতা লাভ করুক না কেন, সে আল্লাহ্‌র সাথে মিশে যেতে পারে না। কেননা, মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সূফীদের মতে, আল্লাহ্‌র সাথে মিলন সম্ভব। এ মিলনই মানব জীবনের পরম স্বার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। কেননা, মানুষের আত্মা আল্লাহ্‌ হতে নিঃসৃত হয়েছে।[৩]

(১৪) সাধারণ মুসলমানদের মতে, মৃত্যুর পর আত্মা পরিপুর্ণ স্বকীয়তা নিয়ে বজায় রাখবে এবং পাপ-পুণ্য অনুসারে শাস্তি বা মুক্তি পাবে। কিন্তু সূফীদের মতে, মানুষের আত্মা সম্পূর্ণভাবে বিশ্ব আত্মা আল্লাহ্‌র মধ্যে সমাহিত হয়ে যাবে।[৪]

(১৫) রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ ঈমানের স্তর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং এ জন্য তারা ঈমানের স্তর স্বীকার করেন না। কিন্তু সূফীগণ ঈমানের স্তর মানেন। এর সর্ব শেষ স্তর লাভ করলেই মুমিন, সিদ্দিক বা ইনসান-ই-কামিল হওয়া যায়।[৫]

(১৬) রক্ষণশীল মুসলিমগণ সর্ব প্রকার সংগীতকে হারাম ও নাযায়েজ বলে মনে করেন কিন্তু অধিকাংশ সূফী ধর্ম সংগীতকে যায়েজ মনে করেন।

---

১. Sayed Abdul Hai. op. cit. p. 173 - 74.
২. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫
৩. Sayed Abdul Hai. op. cit. p. 174.
৪. Sayed Abdul Hai. op. cit. p. 174.
৫. ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

(১৭) সাধারণ মুসলিম সমাজ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে দু'টি বিপরীতমূখী জগত বলে মনে করেন। আর সূফীগণ উভয় জগতকে এক ও অভিন্ন একই সূত্রে দেখতে পান।

(১৮) আল্লাহ্ প্রেমের আবেশে সূফীগণ অসাধারণ ও অপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন কিন্তু সাধারণ মুসলমান এ ধরনের কোন অভিজ্ঞতা লাভ করার মত আত্মিক ক্ষমতার অধিকারী নন।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সূফী সমাজ ও রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা কেবল ইসলামের বাতিনী দিকের বিষয় নিয়ে। সূফীগণ যেখানে যাহিরী-বাতিনী উভয় দিকের সমন্বয়পন্থী কিন্তু রক্ষাশীল মুসলমানগণমাত্র যাহিরী দিকের প্রবক্তা।

সূফী মতবাদ ও অন্যান্য মরমীবাদ

ইসলামী মরমীবাদ সূফীবাদ বা তাসাওউফ নামে পরিচিত। মরমীবাদ ইসলামের গন্ডিসীমারই একটি অর্ন্তনিহিত দিক। এটা ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ও মিষ্টিক উপাদানের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। ইসলাম যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান সম্পন্ন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামে এই উভয় দিকই পরস্পরের উপর নির্ভর শীল। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির বিকাশ সাধন অসম্ভব।[১]

মরমীবাদ কোন বিশেষ দেশ বা জাতির একচেটিয়া সম্পদ নয়। এটা সকল জাতির মধ্যেই বিদ্যমান। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইহা বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ইউরোপের খৃষ্টান, পারস্যের অগ্নি উপাসক, ভারতের বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ মরমীবাদের অনুশীলন করেন।[২] কিন্তু ইসলামের মরমীবাদ অন্যান্য মরমীবাদ হতে নানা বিষয়ে ভিন্ন ও পৃথক ধরনের। যেমন তার কয়েকটি নমূনা।

(১) অন্যান্য মরমীবাদে মানুষের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে দৈহিক আবেদনের গুরুত্বকে তেমন পাত্তা দেন না। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান মরমীবাদীগণ আত্মনিগ্রহকে মোক্ষলাভের উপায় বলে মনে করেন। অন্য দিকে তাসাওউফ আত্মা পবিত্র করণের ব্যাপারে দেহের প্রতি উদাসীন থাকে না। সূফীগণ জীবনের ইহজাগতিক তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে আত্মিক সাধনায় মুক্তির পথ সন্ধান করেন না। কেননা, ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিব, দৈহিক ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোন বিভাজন নেই। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উভয়েরই সম্মিলিত ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, সূফীতত্ত্ব জীবনের পূর্ণাঙ্গ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অন্যান্য মরমীবাদ জীবনের একটা খন্ডিত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) অন্যান্য মরমী সাধকগণ সাধারণত সন্ন্যাস জীবন যাপনের পক্ষপাতী। তাঁরা ধ্যান-সাধনায় এতবেশী মশগুল থাকেন যে, দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্রষ্টার ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু সূফীবাদ এরূপ সন্ন্যাসী জীবন যাত্রার পক্ষপাতী নন। কেননা, ইসলামে সন্ন্যাসব্রত পালন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেছেন - "এ বৈরাগ্যবাদ, ও সব ধর্মে তা মনগড়াভাবে শামিল করা হয়েছে। আমরা তা

১. S.M. Nadvi, op. cit. p. 103.
২. Dr. Tara Chand. op. cit. p. 55.

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দেয়নি।"[১]তাই সূফীগণ তাঁদের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সংসার সবকিছুতেই সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের প্রতি তার কর্তব্য পালন করে থাকেন। এত সব করার পরও তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত থাকেন; দুনিয়ার শান-শওকত ও বিলাসিতা ত্যাগ করে আত্মিক পবিত্রতা লাভের জন্য ধ্যান করেন। ইনসান-ই-কামিল বা পরিপূর্ণ মানব হওয়াই তার কাম্য। সূফী সাধনায় অনেক কষ্টকর বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করতে হয়। অনেক কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে একজন সূফী এ পর্যায়গুলি অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করেন।

(৩) ইসলামে আল্লাহ্‌র ও মানুষের মধ্যে তৃতীয় কোন পক্ষকে স্বীকার করে না। কিন্তু অন্যান্য মরমীবাদে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য গুরুর মধ্যস্থতা স্বীকার করা হয়। কুরআনে উক্তি-"হে রাসূল, আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, আমি নিশ্চয়ই তাদের অতি সন্নিকটে আছি। কোন আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সারা দিয়ে থাকি।"[২] এভাবে অন্যান্য মরমীবাদে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য যেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তি অনিবার্য প্রয়োজন, ইসলামে সেখানে মধ্যস্থ ব্যক্তির কোন প্রয়োজন নেই। ইসলাম বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উদারমুখী ও সহানুভূতিশীল ধর্ম। এখানে সকলেই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পেতে পারে। সকলের জন্যই আল্লাহ্‌র প্রেমের দ্বার উন্মুক্ত। ইসলাম পুরোহিত তন্ত্রকে স্বীকার করেনা; যেমন বৌদ্ধ ধর্মে রয়েছে 'ফুঙ্গি' হিন্দুদের রয়েছে 'ব্রাহ্মণ' ইহুদীর রয়েছে 'রাবী' এবং খৃষ্টানদের রয়েছে 'পাদ্রী'। ইসলামে ধর্মের ব্যাপারে সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার ও সুবিধা ভোগী কোন ধর্মীয় শ্রেণীর স্থান ইসলামে নেই।[৩]

৪। মরমীবাদ জীবনকে নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ ও সর্ব দুঃখবাদী করে তোলে। মরমীবাদী সাধক জীবন ও জগত-সংসারকে অস্বীকার করে এবং আত্মপীড়নের দ্বারা সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু সূফীগণ ধর্মীয় সাধনা ও আল্লাহ প্রেমের মাধ্যমে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা করে। এখানে কর্ম ও ধর্ম, সুখ ও দুঃখ, শান্তি ও সংগ্রাম সব কিছুর সমন্বয় সাধিত হয়।[৪]

৫। মরমীবাদী শুধু নিজের মুক্তি কামনা করে থাকেন, অন্যান্যের চিন্তা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু সূফী তার নিজের মুক্তির চেষ্টা ছাড়াও অন্য সকলকে সৎপথ প্রদর্শনের চেষ্টা করেন।

৬।খৃষ্টান ও বৌদ্ধ মরমীবাদীগণ বৈবাহিক জীবন ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতে চেয়েছেন। কিন্তু ইসলামে বিবাহিত জীবনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণে মুসলিম সাধকগণ সাধারণ বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন। সূফীগন সাধারণভাবে মানুষকে অতবেশী জীবন বিমুখ হতে বলেননি, যেমন বলেছেন খৃষ্টান ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুর দল।[৫]

---

১. আল-কুরআন, সূরা-৫৭, আয়াত - ২৭
২. আল-কুরআন, সূরা-২, আয়াত - ১৮৬
৩. এম.এ. হাশেম, মুসলিম দর্শনের মূলকথা, চুয়াডাঙ্গা, ১৯৭৫ইং, পৃ, ১০৮
৪. এম.এ.হাশেম, প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৮
৫. P.K Hitti, Islam and the West, p-44.

Dhaka University Institutional Repository

৭। হিন্দু ও বৌদ্ধ নরনীবাদে আল্লাহ ও বিশ্বব্রহ্মান্ডকে এক মনে করা হয়। কিন্তু সূফীগণ আল্লাহ ও বিশ্বজগতকে এক ও অভিন্ন মনে করেন না। তারা বিশ্বাস করেন যে, বিশ্ব জগতের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর হুকুমেই এর সৃষ্টি হয়েছে এবং আল্লাহর হুকুমেই বা ধবংস প্রাপ্ত হবে।

৮। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে সর্বেশ্বরবাদ, পূণর্জন্ম, আত্মার দেহান্তর এবং অবতারের ধারণা রয়েছে। কিন্তু সূফীবাদে এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন, অলীক ও ভ্রান্ত।

বিভিন্ন সূফী তরীকা

সূফীগণ তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিভিন্ন তরীকার প্রতিষ্ঠা করেন। এসব তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন সূফী ও পীরগণ। ইসলামী বিশ্বকোষে একশতেরও বেশী সূফী তরীকার উল্লেখ রয়েছে।[১] প্রত্যেক তরীকা আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। এসব তরীকা বিভিন্ন পীর পরম্পরায় হযরত আলী (রাঃ) কিংবা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এব মাধ্যমে নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত তরীকার সম্পর্ক অনুসৃত হয়। সূফী তরীকাসমূহ নবী করীম (সঃ) কে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পীর বলে অভিহিত করে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বলে মনে করে।[২] বহু সংখ্যক সূফী তরীকার মধ্যে কতকগুলো পুরাতন আবার কতকগুলো নতুন। পুরাতন তরীকার মধ্যে কতক গুলো নতুন তরীকার সঙ্গে মিশে গেছে। আবার কতকগুলো তরীকা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। নিম্নোক্ত তরীকাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা-

কাদিরীয়া তরীকা

হযরত মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১০৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্যের জিলান প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। তিনি বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সূফী আবুল খায়ের মুহাম্মদ বিন মুসলিমের নিকট তাসাওউফের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বাগদাদের হাম্বলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কাজী আবু সাব মোবারকের নিকট হতে 'খিরকা' লাভ করেন। শিক্ষা লাভের পর তিনি বাগদাদের হাম্বলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদেই বহাল ছিলেন। তিনি বহু ইহুদী ও খৃষ্টানকে ইসলামের দীক্ষিত করেন।[৩] তিনি একজন বিখ্যাত বাগ্মী পন্ডিত, পবিত্রচেতা ও শক্তিশালী সূফী সাধক ছিলেন। তার বক্তৃতা, উপদেশ. প্রার্থনা এবং রচনা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আলগুনিয়া লিতালিবি তরীক আলহাক' এ সংরক্ষিত হয়েছে।

এ গ্রন্থে এমন কিছু নাই যা চরম গোঁড়াপন্থীরও শ্রদ্ধালাভ করেনা। এ গ্রন্থ সংকলণের বিষয়বস্ত কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে ধর্মীয় অনুশীলনের বিষয়

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড), পৃ. ৬২

২. Saiyed Abdul Hai op. cit.p. 165

৩. Saiyed Abdul Hai op, cit. p.166

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদিত হয়েছে তা যে কোনরূপ আপত্তির উর্ধ্বে।[১] তিনি বাগদাদে একটি খানকাহও প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে খানকাহ্ ও মাদ্রাসা উভয়ই মোঙ্গলনেতা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় নষ্ট হয়ে যায়।

আব্দুল কাদির জিলানীর জীবিতকালেই কাদিরিয়া তরীকা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তাঁর ইন্তিকালের পর তার শিষ্যদের প্রচেষ্টায় এ তরীকা সমগ্র মুসলিম জগতে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে তুরস্ক, আরব, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশসমূহ ও ভারতীয় উপমহাদেশ এ তরীকা বেশ জনপ্রিয়।

কাদিরীয়া তরীকার শিক্ষা

এ তরীকার বিশেষ শিক্ষা হল কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র ১২ হরফ । এ বিশ্ব জগতের মূল কারণ ও উৎস হল এ বার হরফ। তাওহীদের প্রকৃত রূপত্ত হল এ কালিমা। এ বার হরফে কোন নোক্তা নেই। নোক্তা শূণ্য হরফের সাহায্যে কালিমা কেন সৃষ্টি হল তা গভীর রহস্যময়। এ কালিমাকে চিনলে, জানলে ও সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে পড়লে তার কাছে সকল রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়।[২]

এ তরীকাপন্থী সূফীগণ একক কিংবা সম্মিলিতভাবে উচ্চ অথবা নিম্ন স্বরে যিক্র করে থাকেন। পাচ ওয়াক্ত নামায শেষে কিছু নিধারিত অযিফা, বিশেষ সময়ে বিশেষ নিয়মে দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং মুরাকাবা, মুশাহাদায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকার পদ্ধতি বাতলে থাকেন। এ তরীকার চিল্লাকুশীর রেওয়ায়েজ আছে এবং উপতরীকা জুলায়েদীয়ার মতে সামার প্রচলন ও দেখা যায়।

কোন লোক এ তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে তাকে সিয়াম পালনে এবং রাতে আল্লাহ্র উপাসনায় থাকতে আদেশ দেয়া হয়। এ সময় যদি কেউ এসে তাকে বলে- 'আমি আল্লাহ'। তার উত্তর দিতে হবে 'না' তুমি আল্লাহর মধ্যে। যদি শিক্ষা নবীশের প্রামাণের জন্যই এই মূর্তি এসে থাকে তাহলে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর যদি অদৃশ্য না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার শিক্ষা নবীশ কাল শেষ হয়েছে এবং তিনি কাদিরীয়া তরীকাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন।[৩]

চিশতীয়া তরীকা

চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারও কারও মতে, হযরত আলী (রাঃ) এর নবম অধঃস্তন পুরুষ আবু ইসহাক এ তরীকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এশিয়া মাইনর থেকে হিযরত করে খোরাসানের চিশত নামক একটি গ্রামে বসবাস করেন। অন্য পন্ডিতদের মতে, বন্দা নওয়াজ কর্তৃক এ তরীকা প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কারও কারও মতে চিশতের খাজা আহম্মদ আবদাল (মৃ ৮৬৫-৬৬খৃ.) এ তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪]

---

১. A.J. Arberry, Sufism, London,1950, p. 57.
২. ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
৩. আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ১৯১-৯২
৪. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) চিশতীয়া তরীকাকে ভারত উপমহাদেশে আনয়ন করেন। তিনি ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সিস্তানে জন্ম গ্রহণ করেন। পনর বছর বয়সে তাঁর পিতা গিয়াসুদ্দীন হাসান ইহজগত ত্যাগ করেন। এরপর তিনি বাগদাদে চলে যান এবং কয়েকজন বিখ্যাত সূফী যেমন নাযমুদ্দীন কুবরা, শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী এবং আউহাদুদ্দীন কিরমানির সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক তরাইনের যুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজের স্থায়ী ভিক্তি স্থাপিত হলে তিনি ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারত আগমন করেন। তিনি আজমীরে গমন করে সেখানে খানকা নির্মাণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। এখানেই তিনি ১২৩৬খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পর তার দরগাহ তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর চিশতিয়াপন্থী সূফী-দরবেশগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মোগল যুগে দিল্লী চিশতিয়াপন্থীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১] ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বার্মা, চীন, ও মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটি দেশে এ তরীকা বিস্তার লাভ করে।

চিশতীয়া তরীকার শিক্ষা

এ তরীকার সূফীগণ 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ জপ করার উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁরা উপাসনার সময় সামা-গান করতেন এবং রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করতেন। কেউ মুরিদ হতে হলে তাকে প্রথমে দু' রাকাত নামায আদায় করতে হয়। অতঃপর তাকে 'ফকীর', 'ফকর' (দারিদ্র), 'ফানা' (সন্তোষ বা পরিতৃপ্তি), 'ইয়াদ আল্লাহ' (আল্লাহর নাম জপ করা), রিয়াযা(কৃচ্ছ্র সাধন) ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়। অতঃপর মুরীদকে কতগুলি ইসম বা আল্লাহর নাম শিক্ষা দেয়া হয় এবং কোন দরগাহতে গিয়ে চল্লিশ দিন সিয়াম পালনের আদেশ দেয়া হয়। আফিম, ভাঙ্গ, তামাক, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি চিশতিয়া সূফীদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[২]

সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকা

শায়খ নাযিবুদ্দীন আব্দুল কাদির সোহ্‌রাওয়ার্দী এ তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জিতালের অন্তগর্ত সোহ্‌রাওয়ার্দী নগরে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি নিযামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হাদীস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র শিহাবুদ্দীন উমর বিন আব্দুল্লাহ এ তরীকার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি মধ্যমপন্থী গোঁড়া মুসলমানদের প্রতিভূ ছিলেন। ফলে খলিফা, যুবরাজ এবং সাধারণ মুসলমান তাঁর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কার হজব্রত উদযাপনকালে মিসরের মরমী কবি উমর বিন আল ফরিদের সংস্পর্শে আসেন। বিখ্যাত ফার্সী কবি শায়খ সাদী তাঁর শিষ্য ছিলেন।[৩] তিনি 'আওয়ারিফুল মাআরিফ'

১. Sayed Athar Abbas Rezvi, A History of Sufism in India, vol-2, New Delh-1983.p. 279-80.

২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৯

৩. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। বাংলাদেশ,পাকিস্তান ও ভারতে এ তরীকার অনুসারী বিদ্যমান। সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকা মূলত কাদিরীয়া তরীকা হতে উদ্ভূত একটি শাখা তরীকা। এ তরীকার তালিম অনেকটা কাদিরীয়া তরীকার মতই।[১]

নকশাবন্দিয়া তরীকা

মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন বোখারী এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বোখারার নিকট ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গহণ করেন এবং ১৩৮৯খৃষ্টব্দে ইন্তিকাল করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি তাসাও উফ তত্ত্ব শিক্ষার জন্য গৃহ ত্যাগ করেন এবং বাবা শাম্মাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে গুরু তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করে যান। তিনি এ তরীকার এত উন্নতি সাধন করেন যে, তার সময় থেকে এ তরীকা নকশাবন্দী তরীকা নাম ধারন করে। নকশবন্দ শব্দের অর্থ চিত্রকর। এ তরীকার সূফীগণ আল্লাহর মহিমার চিত্র হৃদয়ে ধারন করতেন- একথা বুঝাবার জন্য তাদের নকশবন্দী বলা হয়।[২] আল শাম্মাসী ও তাঁর শিষ্যগণ যখন সরবে যিক্‌র করতেন তখন বাহাউদ্দীন নিরবে যিক্‌র করতেন। এ নিয়ে মত বিরোধ দেখা দিলে স্বয়ং শাম্মাসী বাহাউদ্দীনের নীতিকে সর্মথন করেন। নকশাবন্দিয়া তরীকার অনুসারীগণ পাকিস্তান,বাংলাদেশ, তুরস্ক, ভারত,চীন, জাভা প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে আছেন।

এ তরীকার প্রধান সাধন হল ছয় লতিফা, যেমন ক্বলব, রূহ, নফস, সীর, খফী ও আখফা এবং আরবা-এ-আনাসীর যেমন- আগুন, পানি, মাটি, ও বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন মুরাকাবা। এ ছাড়া হাযরাতুল খামসির মুরাকাবাও এ তরীকার সাধনা। যেমন- সায়ির ইলাল্লাহ, সায়ির ফিল্লাহ, সায়ির আনিল্লাহ, আলম-ই-মিসাল এবং আলম -ই-শাহাদাতকে হাযরাতুল খামস বলা হয়। এ তরীকায় সাতটি জিনিসের উপর বেশী গুরত্ব দেয়া হয়।[৩] যেমন

১। পীরের অনুসরণ করা

২। দেহরাজ্যে পরিভ্রমণ করা

৩। চুপি চুপি বাক্যলাপ

৪। সর্বক্ষণ যিক্‌রে মশগুল থাকা

৫। আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া

৬। আল্লাহ্‌তে অন্তর্দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা

৭। নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে আল্লাহকে চির জাগ্রত রাখা

১. আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৭
২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৩. দ্রষ্টব্য ঃ আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

মুজাদ্দিদিয়া তরীকা

শায়খ আহম্মদ সিরহিন্দী(১৫৬৩-১৬২৪খৃঃ) এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) নামে পরিচিত। তিনি সম্রাট আকবরের শাসন আমলে অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও তাঁর দীন-ই-ইলাহী-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতা আব্দুল আহাদের নিকট মাআরিফাতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি খাজা বাকাবিল্লাহ্ নকশব্দ (রহ.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং খিলাফাত লাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষে শির্ক, বিদ্আত, কুফ্র প্রভৃতির মূলোচ্ছেদ করেন এবং ইসলামী জীবনধারার পূণরুত্থান করেন। তিনি স্বীয় পীর ও মুর্শিদ কর্তৃক প্রদত্ত নক্শাবন্দিয়া তরীকার মধ্যে কিছু নতুন নিয়ম-প্রক্রিয়া মাকাম ও জযবার সংযোজন করেন।[১]

নক্শাবন্দিয়া তরীকার মত মুজাদ্দিদিয়া তরীকার মূল সাধনা হল লাতায়িফ-এ-সিত্তা, আনাসীর-এ-আরবাআ, হাযরাতুল আনাসীর ও হাযরাতুল খামসার মুরাকাবা। তবে তিনি হাযরাতুল খামসকে নতুন নিয়মে লিপিবদ্ধ করেন। যেমন- নকশাবন্দিয়া তরীকা মতে, সায়ির ইলাল্লাহ্কে বেলায়াত-এ-সুগরা এবং সায়ির ফীল্লাহ্কে বেলায়াত-এ-কুবরা নামকরণ করেন। আহাদিয়াতের স্তরকে তিনি পূর্বেকার স্তর থেকে ১৬/১৭টি স্তরের উর্ধ্বস্থিত স্তর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বেলায়াত-এ-উলিয়া বা উর্ধ্বস্থিত বেলায়াতকে নবুওয়াতের পর্যায়ভূক্ত মাকাম বলে মন্তব্য করেছেন।[২] এ তরীকাপন্থী সূফীগণ যিক্রে খফীর পক্ষপাতী। ঐশী প্রেমমূলক সামা এতে নিষিদ্ধ। তবে বাদ্যহীন হাম্দ-নাতকে সমর্থন করা হয়েছে।

মাদারিয়া তরীকা

এর তরীকার আদি গুরু হলেন বদী উদ্দীন শাহ মাদার। তাঁর পিতা আবূ ইসহাক শামী ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। তিনি ১৩১৫ খৃঃ সিরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং এবং ১৪৩৬ খৃঃ তিনি কানপুরের সকনপুরে ইন্তিকাল করেন। তিনি বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে গুজরাট, আজমীর, কণৌজ, কান্দি, জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ইত্যাদি অনেক জায়গা ভ্রমণ করেন। তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে বাংলাদেশে তার প্রভাব বিশেভাবে পরিলক্ষিত হয়। উত্তর বঙ্গে 'মাদারের বাঁশতোলা' নামক একটি অনুষ্ঠান ঘটা করে পালন করা হয়। বিভিন্ন দরদাহের পুকুরের মাছ বা কচ্ছপ মাদারীরূপে এখনও লোকের সম্মান পেয়ে থাকে।[৩]

---

১. ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

২. আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৩. দ্রষ্টব্য ঃড.এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা- ১৩৩৫, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

শাত্তারীয়া তরীকা

লোদী সুলতানদের আমলে শাহ্ আব্দুল্লাহ্ (মৃ. ১৪৮৫ খৃঃ) এ তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন। জৌনপুর এবং বিহারে শাত্তারীয়া তরীকার সূফীগণের বেশ প্রভাব ছিল। এ তরীকার সূফীগণ তাওহীদের উপর বিশেষরূপে জোর দিতেন। এ জন্য তাঁরা ফানা, ফানা ফিল ফানা বিশ্বাস করতেন না। কারণ, ফানা বা ফানা ফিল ফানার জন্য একাধিকের অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়, যা ফানা হবে এবং যার মধ্যে ফানা হবে। সুতরাং ফানা তাওহীদের বিপরীত।[১]

কলন্দরিয়া তরীকা

ভ্রাম্যমান ফকিরদের কলন্দর বলা হয়। ইরানে এ তরীকার জন্ম হয়। বুআলী শাহ্ কলন্দর এ সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। তিনি প্রথমে চিশতিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। শেষে চিশতিয়া তরীকার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে এ মতবাদ গড়ে তোলেন। নানা অঞ্চল ভ্রমণের পর তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হন এবং দিল্লীর নিকট পানিপথ নামক স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[২] যা হোক কলন্দরের কোন বিশেষ বিধিবদ্ধ নীতি ছিল না, ধর্মীয় আইন বা সমাজের সঙ্গে তাদের বিশেষ সংশ্রব ছিল না। কলন্দরা মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্রই ছিল।[৩]

মৌলবিয়া তরীকা

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (১২০৭-১২৭৩ খৃঃ) এ তরীকার প্রতিষ্ঠা করেন। তুরস্কে এ তরীকার উৎপত্তি হয় এবং উসমানীয়া খলীফাদের আমলে এ তরীকা শক্তিশালী মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। এ তরীকায় নৃত্য-গীতকে বেশী জোর দেয়া হয়। যিক্‌র ও সামার সাথে নৃত্যের তালে তালে এ তরীকা পন্থীগণ জজবার হালত লাভ করেন।[৪]

রিফাইয়া তরীকা

আহমাদুর রিফাই (মৃঃ ১১৮৪ খৃঃ) এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। এ তরীকাপন্থগণ অনেক ধরনের অদ্ভুত ও অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করে থাকেন। যেমন - উত্তপ্ত লৌহ শলাকা, জীবন্ত স্বর্প ও কাঁচ গলধঃকরণ, দেহের মধ্যে সুঁচ ও সুরিকা প্রবিষ্টকরণ ইত্যাদি। বসরায় এ তরীকার উদ্ভব ঘটে। বসরা হতে দামেস্ক ও ইআম্বুল পর্যন্ত ইহা প্রসারিত হয়।[৫]

---

১. আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
২. দ্রষ্টব্য, M.T. Titus, Indian Islam, Oxford University press, 1930.
৩. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৪. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
৫. ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

Dhaka University Institutional Repository

সেনুসিয়া তরীকা

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আলী আসসানুসী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এ তরীকার প্রতিষ্ঠা করেন।[১] এটা কাদিরীয়া তরীকার একটি শাখা । এ তরীকাপন্থীগণ মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। নৈতিক চরিত্র গঠন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলই এর তরীকার অভিষ্ট লক্ষ্য।

আদহামিয়া তরীকা

এটা চিশতিয়া তরীকার একটি শাখা। এ শাখা তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী (মৃ. ৭৮৩ হিঃ) সিরিয়া, তুর্কিস্তান, সমরকন্দ ও বুখারায় এ তরীকার প্রভাব ছিল। ভারত, বাংলাদেশ পর্যন্ত এ তরীকা বিস্তার লাভ করেছিল।

ওয়াইসিয়া তরীকা

হযরত ওয়াইসকারনী (রাঃ) এ তরীকার প্রবর্তক। তিনি বাতিনী পন্থায় নবী (সঃ) থেকে তাওয়াজ্জুহ্ ও ইলম-ই-লাদুন্নী লাভ করেন। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর গায়ের জুব্বা লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকা শেষপর্যন্ত বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করেছিল।

---

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ৪৬০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে তাসাওউফ বা সূফীতত্ত্বের বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে তাসাওউফ বা সূফীবাদ

ইতোমধ্যে বিভিন্ন তথ্যসূত্র অবলম্বনে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে যে, খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানগণের যেমন বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তেমনি চট্টগ্রাম বন্দর ও আরব উপনীবেশে পরিণত হয় এবং আরাকান থেকে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী ভূ-ভাগে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। রোশাঙ্গ রাজ সুলতৈং চন্দয় বাঙ্গালা অভিমুখে অভিযান করে সুলতান উপাধিধারী জনৈক মুসলিম আমীরকে পরাজিত করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। যে কোন জনপদে ইসলামের বাণী প্রচার করা প্রতিটি জ্ঞানবান মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব, তাতে কেউ তাঁকে সাহায্য করুক বা না করুক। সে হিসেবে আরবীয় মুসলিমগণ প্রত্যেকেই ইসলামের প্রচারক ছিলেন। আল-কুরআনে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হউক যারা সবাইকে আহ্বান করিবে কল্যাণের দিকে এবং স ৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করিবে। ইহারাই সফলকাম।"[১] নবী করীম (সাঃ) এরও নির্দেশ "বাল্লিগু আননি ওয়ালাউ আয়াতান" (একটি আয়াত হলেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে তা প্রচার কর)। আল-কুরআন ও মহানবী (সাঃ) এর এই নির্দেশ আরবীয় মুসলিমগণ নিষ্ঠা পূর্ণভাবেই পালন করেছিলেন। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়েই সে যুগের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ইসলাম প্রচারার্থে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। ভারত বর্ষে বাংলায়ও এসেছিলেন । সুদূর সেই মহাচীনেও গিয়েছিলেন, যার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল সেই সপ্তম শতকে। আরবীয় বণিকগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনীবেশ স্থাপন করে বাণিজ্যের সঙ্গে ইসলাম প্রচারেও মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামে দীক্ষিত করে স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সব বণিকদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিম সাধকও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ এদেশের বিভিন্ন স্থানে আগমন করেন।

বাংলায় বিদেশাগত সূফী-দরবেশগণের আগমনের ধারাকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। (ক) মুসলিম বিজয়ের পূর্বকাল (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত।) (খ) মুসলিম বিজয় থেকে হালাকুগানের বাগদাদ ধ্বংস পর্যন্ত অর্থাৎ ১২০১ থেকে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (গ) ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকাল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে সে সব সর্বত্যাগী মহা পুরুষগণ সত্য প্রচারের অদম্য বাসনা নিয়ে বাংলায় আগমন করেন। তারা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন, কখনো বা গুরুত্বপুর্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে আল্লাহ্ ও রাসূলের সত্য বাণী জনসমাজে প্রচার করেন। নিজেদের চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে স্থানীয় লোকের হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করেন। ধীরে ধীরে দরবেশগণের আদর্শ জীবনধারার প্রতি জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা জাগে। কেউ কেউ ইসলামের সহজ-সরল উন্নততর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে কোন দরবেশের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। স্থল বিশেষে স্থানীয় রাজা উপাধিধারী কোন প্রতাপশালী ভূস্বামী নিজের ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে ইসলাম প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। দরবেশগণের উপর উৎপীড়ন চালান। দরবেশগণ অগত্যা আত্মরক্ষার্থে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শহীদ হন, কোন কোন ক্ষেত্রে জয়ী হন। সেখানে এরূপ প্রচারের ধারা স্বাভাবিক ছিল বলে মনে হয়। ধর্ম

১. আল-কুরআন, সূরা -৩, আয়াত -১০৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারকে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত ও পূণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। প্রয়োজন হলে এরূপ কাজে শহীদ হওয়াকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে বিশ্বাস করতেন এবং পরকালে অনন্ত সুখের জীবন লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করতেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকারের মহত্তম আদর্শে উদ্ধৃদ্ধ হয়েই তারা সর্বস্ব ত্যাগের এরূপ দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হতেন। তাঁদের সে ত্যাগ বৃথা যায়নি। পরোক্ষভাবে তারা পরবর্তীকালের ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী রাজশক্তি বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন।

মুসলিম বিজয়ের পূর্ব যুগে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার রামপাল ও হরিরাম নগর, বগুড়া জেলার মহাস্থান ও উত্তর বঙ্গের পান্ডুয়া দেবকোর্ট প্রভৃতি স্থানে যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মুসলিম বিজয়ের অব্যাবহিত পরে ৫০ / ৬০ বৎসরের ভিতরে বাংলাদেশে কোন বিদেশী সূফী দরবেশ এসে থাকলেও তাঁদের পরিচয় জানা যায় না। এমনকি বাগদাদ ধ্বংসের পূর্বে সমগ্র উপমহাদেশের সূফী প্রভাব অতি ক্ষীণ ছিল, যদিও খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীকে উপমহাদেশের সূফী প্রভাবের যুগ বলা হয়। বাগদাদ ধ্বংসের পর (১২৫৮ খৃঃ) অর্থাৎ তের শতকের শেষ পাদ থেকে উপমহাদেশে সূফী প্রভাবের স্রোত অবাধগতিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এ সময়েই আরব, পারস্য, ইরাক, ইয়ামেন ও মধ্য এশিয়ার সূফী-দরবেশগণ উপ-মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশেও এ সব ধারাই সম্প্রসারিত হয়। বস্তুতঃ বাংলার সূফীমতকে উত্তর ভারতীয় সূফী মতবাদের শাখা স্রোত বলা হয়।[১]

মানুষের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ্‌র অধিকতর নিকটবর্তী তাঁরাই 'সূফী' নামে পরিচিত। সূফীগণ নির্জনবাস এবং দারিদ্র পছন্দ করতেন এবং নিভৃত সাধনা ও কুরআন মাজীদের মর্ম উদঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতেন। সুতরাং সূফীগণ তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করেন আল-কুরআন থেকেই এবং তারা কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেন মাআরিফাত বা গুপ্তজ্ঞানের আলোকে। কেননা আল-কুআনে ঘোষণা করা হয়েছে-" তিনিই তোমাদের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্বর্থহীন (মুহকাম); এইগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক (মুতাশাবিহা)।"[২] সূফীমতে, ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য হল আত্মার সংযম, কেবল মাত্র কতকগুলো বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। আত্তাসাওউফ বা সূফীবাদ হচ্ছে স্রষ্টার জন্য গভীর ও তীব্র ভালবাসার মাধ্যমে আত্মার উন্নয়ন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাতের সাধনা। মানব সেবাকেই তাঁরা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেম রুপে বিবেচনা করে থাকেন। মানবতাবোধে উদ্ধুদ্ধ হয়ে মানবতার কল্যাণে তারা সেই পরম সত্তার সান্নিধ্যে যেতে চান যেখান থেকে তারা এসেছেন এ ধরাধামে। মানব সেবাকেই তাঁরা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেমরূপে বিবেচনা করে থাকেন। বাস্তবিকই কবি শায়খ সাদী বলেছেন-"সৃষ্টিজীবের সেবা ছাড়া তরীকত নিষ্ফল, শুধু খিরকা, তাস্‌বীহও জায়নামাযে তরকীত হয়না।"[৩] মাওলানা জালাল

১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৬৯ইং, পৃ. ২০৯

২. আল-কুরআন, সূরা -৩, আয়াতাংশ - ৭

৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীন রুমী বলেছেন - "মানুষের চিত্ত জয় করাই মহত্তম তীর্থযাত্রা এবং ইট হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও শ্রেয়ঃ। কাবাতো কেবল ইবরাহীমের গৃহ, কিন্তু হৃদয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌র একমাত্র আবাস।"[১]

ধর্ম প্রচার ও মানব কল্যাণকর কার্যাবলীর এই সমুদয় আদর্শ নিয়েই ইসলামের প্রথম যুগের সূফীগণ বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন। সূফীগণ শুধু সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না, বরং নিজের আত্মার দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতেন। সুতরাং তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল আত্মার পরিশুদ্ধি মারফত আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা। সূফীগণ জীবন সাধনার পথকে প্রধানত ঃ দুই ভাগে ভাগ করতেন। (ক) শরীআত বা প্রকাশ্য ইবাদত; (খ) তরীকাত বা গুপ্ত ইবাদত। ইসলামের প্রকাশ্য বিধি-নিষেধ সম্বলিত আইন-কানূন মেনে চলাই শরীআত। তরীকাতের পথে উপযুক্ত শিক্ষক বা মুর্শীদের নিকট দীক্ষা নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা সাধনা করতে হয়। তরীকাতের যাত্রাপথ যিনি গ্রহণ করেন তিনি সালিক বা পথিক। যাত্রা পথে পথিককে উন্নতির বিভিন্ন স্তর (মকাম) ও অবস্থা (হাল) পারি দিতে হয়। এই স্তর বা মকামসমূহ হল মাআরিফাত বা আল্লাহ্‌র পুর্ণজ্ঞান ও হাকীকাত বা আল্লাহ্‌র প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি। তরীকাতের বিশেষ শিক্ষালাভ করেই আল্লাহ্‌র মাআরিফাত অর্জন করতে হয়। মাআরিফাত দ্বারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলন হয়। সূফীগণ মনে করেন যে, মানুষ জীবিতাবস্থায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে পারে। আবার পরলোকেও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। বস্তুত মানবাত্মা পরমাত্মা থেকে উদ্ভত হয়েছে; সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে মিলন অবশ্যম্ভাবী। পরমাত্মার অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব মিশে যাওয়ারকে কোন কোন সূফী বলেছেন 'বাকাবিল্লাহ'। তাঁরা মনে করেন বাকাবিল্লাহ হলো অহংলোপ; কিন্তু 'বাকাবিল্লাহ' অর্থে বুঝায় পরমাত্মার সাথে সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিলীন হওয়া। ফানাফিল্লাহর শেষ পরিণতিই হলো বাকাবিল্লাহ (আল্লাহর স্থায়ীত্ব প্রাপ্তি)।[২]

সূফী সম্প্রদায়ের ইসনাদ বা কুরছিনামা অথাৎ হাদীস বর্ণনা কারীদের মত সূফীদের আধ্যাত্মিক গুরুর নাম সম্বলিত কুরছি নামা রয়েছে। এই কুরছি নামা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময় পর্যন্ত নিরূপিত। এই রূপ ইসনাদ পাওয়া যায় । সূফীদের রয়েছে একটি অদৃশ্য ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ, মনে করা হয় যে, এই সকল উচ্চ শ্রেণীর সূফীদের সাধনা এবং সুপারিশের কলেই পৃথিবী দীর্ঘকাল ব্যাপী টিকে আছে। এদের কোন একজনের মৃত্যু হলে অবিলম্বে অন্য একজন তার স্থলাবিষিক্ত হন। তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। তারা হলেন তিনশতজন নুকাবা, চল্লিশজন আবাদাল, সাতজন উমান্দ, চারিজনর আমুদ এবং সর্বোপরি কুতুব বা গাউস। সূফীদের সাম্প্রদায়িক বা সমষ্টিগত জীবনে তারা কয়েকটি সুবিধা বা অধিকার ভোগ করতেন। যেমন তাদের শিক্ষা সমাবেশে বিশিষ্ট্য কবিতা আবৃত্তি করা হত বা রচনা আলোচনা করা হত, যেমন ইবন ফরিদ, ফরিদ উদ্দীন আত্তার, মৌলানা জামী, মৌলানা রুমীর কবিতা বা আধ্যাধিক রচনা ইত্যাদি। এই সব শুনে শিষ্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ হত এবং ভাবাবেশ ও উচ্ছ্বাসে তারা অনেক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন ।[৩]

---

১. উদ্ধৃত ঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

২. ড. এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা-১৩৩৫বাং, পৃ. ১৮-৩১

৩. আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলার একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪ইং, পৃ. ১৮৫-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

এতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, আত্তাসাওউফ বা সূফী মতবাদের উদ্ভব বাংলাদেশ বা উপমহাদেশ বরং বাইরে। এই মতবাদ মহানবী (সাঃ) এর পরে প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যে বেশ জোরালো হয়ে উঠে এবং আরব-পারস্য ইত্যাদি মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে এমতবাদ পাক-ভারতে এবং বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের মুসলিম আমলের প্রাথমিক যুগের সূফীগণ সকলেই বহিরাগত, পরে অবশ্য বাংলাদেশে ও অনেক সূফীদে জন্ম গ্রহণ করেন। সূফীগণের যাত্রা পথের চলবার প্রক্রিয়া অনুসরণের ভিন্নতা থেকে বিভিন্ন তরীকাহর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সকল তরীকার মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। "ইসলাম অধ্যুষিত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময়ে শত শত সূফী দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করেন। সূফীগণ অনেক তরীকাতে বিভক্ত ছিল। বিশেষ করে তারা চিশতিয়া ও সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাইরের দেশ থেকে আগমন ঘটলেও বাংলাদেশ সূফীবাদ বিস্তারে উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়। সূফীবাদ সমগ্র বাংলাদেশ এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, ফলে খানকাহ্‌ ও দরগাহ দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের মাটিতে সূফীবাদ এতবেশী প্রসার লাভ করে যে, কয়েকজন বিখ্যাত বাঙ্গালী সূফী শিক্ষার ভিত্তিতে এখানে কয়েকটি নতুন মরমী সম্প্রদায়ের বিকাশ হয়।"[১]

বাংলাদেশে যেসব তরীকার সূফীগণ আগমন করেন এবং ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন তাদের সংখ্যা খুববেশী নয়। পঞ্চদশ শতকের জৌন পুরের বিখ্যাত সূফী মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী কর্তৃক জৌনপুরের শার্কী সুলতান ইবরাহীম শার্কীর নিকট লিখিত একখানি চিঠিতে বাংলাদেশের কয়েকটি সূফী তরীকার নাম পাওয়া যায়। রাজাগনেশের অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে বাংলাদেশের সূফীদিগকে রক্ষার জন্য এই চিঠিখানি লিখিত হয়। তিনি বলেন-"God be praised! what a good land is that of Bengal where numerous saints and ascetics came from many dircetions and made it their habitation and home. For example, at Devgaon seventy leading disciples of Hazrat Shaikh Shahabuddin suhrawardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrawardi order are lying buried in Mahison and this is the case with the saints of Jalilia order in Deotola. In Narkoti some of the best companions of the shaikh of shaikh Ahmed Damisqui are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama one of the twelve of the Qadarkhani order whose cheif pupil was Hazrat Shaikh Sharuddin Maniri is lying buried at Sonargaon. And then there was hazrat Badr Alam and Badr Alam Zahidi. In short in the country of Bengal what to speak of the cities there is no town and no village where holy sainto did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrawardia order are dead and gone earth but those still alive are also infairly large numbers"[২]

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২. Prof. Hasan Askari, Bengal, past and Present, Vol. LXVII, Serial No. 130, 1948, pp. 35-36

Dhaka University Institutional Repository

(সব প্রশংসা আল্লাহর! কি চমৎকার দেশ এই বাংলা- যেখানে অসংখ্য সাধু-দরবেশ ও তাপসগণ বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেন এবং বাংলাকেই তাদের দেশ ও বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নেন। উদাহরণস্বরূপ, পীরানা পীর হযরত শিহাব উদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীর সত্তরজন নেতৃস্থানীয় শিষ্য দেবগায়ে চিরশান্তির ক্রোড়ে শায়িত আছেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী তরীকার কয়েকজন সূফী পুরুষ মাহীসুনে এবং জালালীয়া সম্প্রদায়ের সূফীরা দেওতলায় সমাহিত আছেন। শায়খ আহমদ দামিস্কীর কয়েকজন প্রধান শিষ্য আছেন নারকোটিতে। 'কদরখানী' দ্বাদশ সূফীদের অন্যতম হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনার গাঁয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এরই প্রধান শিষ্য ছিলেন হযরত শায়খ শরফুদ্দীন মানেরী। এছাড়া হযরত বদর আলম এবং বদর আলম যাহিদী ছিলেন। মোট কথা, বাংলাদেশে শুধু বড় বড় শহরের কথা বলি কেন, এমন কোন গ্রাম কিংবা শহর নেই যেখানে পূন্যাত্মা সূফী পুরুষগণ গমন করেননি ও বসতি স্থাপন করেননি। সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া সম্প্রদায়ের সিদ্ধ পুরুষদের অনেকেই বিগত কিন্তু যারা জীবিত আছেন তাদের সংখ্যাও অনেক।)

হযরত মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্র থেকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি সূফী তরীকার নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন পান্ডুয়ার শায়খ আলউল হকের শিষ্য। পান্ডুয়ার শিক্ষকের খানকাতে তিনি কয়েক বছর অতিবাহিত করেছিলেন। সুতারাং তার সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য। তিনি বাংলায় বহু সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূফী সাধাকগণ অতীন্দ্রিয় সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং সেখানে তারা সমাহিত রয়েছেন। এ কেন্দ্রগুলো হচ্ছে-দেবগাঁও, মাহিসুন, দেওতলা, নারকোটি এবং সোনারগাঁও। দেবগাঁও, মাহিসুন এবং নারকোটি ছিল বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক বাসস্থল। দেবগাঁও হচ্ছে দেবকোট যেখানে বখতিয়ার খিলজী তিব্বত অভিযান থেকে ফিরে এসে তার শেষদিনগুলো কাটিয়েছিলেন। এটা দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পরগণার অন্তর্ভূক্ত।[১] কুতুবউদ্দীন আইবেকের গভর্ণর কেমাজ রুমীর হাতে পরাজিত হয়ে মুহাম্মদ শিরান খিলজি মাহিসুনে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি মাহিসুনে কাটিয়েছিলেন। নারকোটি ছিল বখতিয়ার খিলজীর একজন সেনাপতি আলী মর্দীন খিলজীর ইকতা।[২] পান্ডুয়া থেকে ১৫মাইল উত্তরে দেবকোটিগামী বাদশাহী সড়কের পাশে দেওতলা অবস্থিত। দেওতলার শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর একটি চিল্লাখানা আছে। দেওতলার তিনি এতবেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তার সমানার্থে দেওতলার নাম হয় তাবরিজাবাদ।[৩]

স্বাধীন সুলতানী আমলে সোনারগাঁও একটি বিখ্যাত মুসলমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। এটা ছিল সুলতান ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ্ এবং ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহের রাজধানী। এটা ঢাকা থেকে প্রায় ২০ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্রে সোহ্‌রাওয়ার্দীরা, জালালীয়া এবং কদরখানি তরীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর কয়েকজন সূফীর নাম ও উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের তরীকার পরিচয় নেই। অন্য এক জায়গায় তিনি আলাই নূরী হুসাইনী এবং রুহানীয়া তরীকারও উল্লেখ করেছেন।

---

১. Kunning Hum, Report of the Archaeological Survey of India. Vol. 15. P. 95

২. ঐ সময় বিভিন্ন শাসন তান্ত্রিক বিভাগকে 'ইকতা' এবং ইকতার শাসনকর্তাকে 'মুকতা' বলা হতে

৩. Abid Ali Khan, op. cit. p. 170

Dhaka University Institutional Repository

জালালীয়া সূফীমতবাদের সূচনা হয় বিখ্যাত সূফী শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী থেকে। তিনি প্রথমে শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীর শিষ্য ছিলেন অর্থাৎ সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকাভুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চিশতিয়া তরীকা অবলম্বন করেন। সম্ভবত তিনি দেবতলায় সমাহিত আছেন। সুতরাং জালিলীয়া তরীকাহ হয় সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকা বা চিশতিয়া তরীকার শাখা বিশেষ।

'আলাই' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় পান্ডুয়ার খ্যাতনামা সূফী শায়খ আলাউল হক থেকে। শায়খ আলাউল হক ছিলেন বিখ্যাত কুরাইশ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর। এ কারণে তাঁর সম্প্রদায় খালিদীয়া নামেও পরিচিত। তদীয় খ্যাতনামা সন্তান হযরত নূর কুতবুল আলম থেকে যে সূফী সম্প্রদায়ের সূচনা হয়েছিল তার নাম হয় নূরী। আলাউল হকের একজন শিষ্য শায়খ হেসাইন যুক্কারপোশ হুসাইনী সূফী মতের প্রতর্বন করেন। এরা সকলেই চিশতিয়া তরীকা অনুসরণ করতেন। সুতরাং এগুলিকে চিশতিয়া তরকার শাখারূপে গণ্য করা যায়।

'রুহানিয়া' নামে পরিচিত আরও একটি সূফী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় বাংলায়। এ তরীকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়।

কদর খানি তরীকার আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কদরখানি যদি কাদেরিয়া তরীকার বিকৃত লিপি হয়, তাহলে বাংলাদেশে কাদেরিয়া সূফীদের আগমনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।[১] কাদেরিয়া তরীকা ভারত উপমহাদেশে এবং বাংলাদেশের বেশ জনপ্রিয়; এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ) কে এখানে বড়পীর বলা হয় এবং আজও তার প্রভাব এদেশের মুসলিম সমাজে ব্যাপক। সিলেটের হযরত শাহজালাল (রাঃ) তুর্কীস্তানের শায়খ সৈয়দ আহমদ ইয়সভীর শিষ্য ছিলেন অর্থাৎ তিনি ইয়সভী তরীকা অবলম্বন করেন। ইয়সভী তরীকা পরে নক্‌শাবন্দীয়া তরীকারূপ লাভ করে।[২] শাহ্ জালাল নকশাবন্দীয়া তরীকাভূক্ত ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে নকশাবন্দীয়া তরীকাও বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো ছাড়া 'কলন্দরিয়া' এবং 'শাত্তারিয়া' তরীকাও বাংলার মাটিতে প্রসার লাভ করে। মাদারিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা বদীউদ্দীন শাহমাদার বাংলাদেশে আগমন করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। রামাই পন্ডিতের প্রতি আরোপিত শূণ্য পুরাণেও মাদারীয়া তরীকার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, বাংলাদেশে চিশতিয়া, সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া, মাদারীয়া, নকশাবন্দীয়া, কলন্দরীয়া, শাত্তারিয়া ও মাদারীয়া তরীকার[৩] সূফীদের প্রভাব ছিল। এসকল সূফীবাদের শাখা-প্রশাখা এবং অসংখ্য খানকাহ্ ও দরগার অস্তিত্ব বাংলায় সূফীবাদের জনপ্রিয়তার স্মৃতি বহন করে। সিমনানীর পত্রানুসারে, দেবকোট ও মাহিসুনের মত প্রাথমিক বসতিগুলোতে সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া সাধকগণ এসে বসবাস করেছিলেন, যার একমাত্র দেবকোটেই সত্তরজন সাধক চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এসব সূফীর নাম আজও অজ্ঞাত। প্রাথমিক যুগের সাধকদের মধ্যে কেবল শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীর শিষ্য হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর নাম পাওয়া যায়। সিমনানীর পত্রানুসারে, তাঁর বহু শিষ্য দেওতলায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন নারকোটি ও কয়েকজন বিখ্যাত সাধকের বাসস্থান ছিল। তাঁরা সবাই ছিলেন শায়খ আহমদ

১. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
৩. বিস্তারিত বিবরণ ঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দামিস্কির সহচর, যার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সোনারগাঁও ছিল শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামার আবাস স্থল। সিমনানী এখানে প্রাথমিক যুগের সূফীদের সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন পান্ডুয়ার শায়খ আলাউল হকের শিষ্য। এ সময় থেকে চিশতিয়া সূফীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকাভূক্ত সূফীগণ সর্ব প্রথম বাংলাদেশে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের কর্মতৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ বাহাউদ্দিন যিক্‌রীয়া মুলতানী। তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকার আদি পুরুষ শিহাবুদ্দীন আবু আমর সোহ্‌রাওয়ার্দীর খলিফা ছিলেন। তিনি মুলতানে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানে ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর শিষ্যগণ পাক-ভারত ও বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে চিশতিয়া সম্প্রদায়ের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া সম্প্রদায়ের পর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যাদের আগমন ঘটে এবং অসামান্য অবদান রাখেন তাঁরা হলেন চিশতিয়াপন্থী সূফীগণ। পাক-ভারত, বাংলাদেশের চিশতিয়া সম্প্রদায়ের অগ্রদূত ছিলেন ভারতের বিখ্যাত সাধক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) (১১৪২ - ১২৩৬ খৃ.)। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দ স্বাধীনতা অবসানের এবং নবীন রাজশক্তি সঙ্গে নতুন এক ভাবধারা প্রবর্তনের অগ্রদূত। তাঁর ইন্তিকালের পর ভারতের নানাস্থানে চিশতিয়াপন্থী সূফী-দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মোগল যুগে দিল্লী এই চিশতিয়া পন্থীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আতহার আব্বাসের ভাষায় "The rise of Fathpur Sikri on the ridge of the Sikri hills as a great Sufie centre in northern India and its eshtablishment as the new Myghal capital was a dircet result of the spiritual eminence of Shaikh Salem bin Bahauddin Chishti, Shaikh Salim's ancestors were descendents of Baba Farid .[১]

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশে আর কোন নুতন সূফী সম্প্রদায়ের আগমনের সংবাদ পাওয়া যায় না। অতঃপর নুতন এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে কাদিরীয়া সম্প্রদায়। বাগদাদের জিলান নগরের অধিবাসী শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ) (১০৭৮ -১১৫৬খৃ.) এর তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জীবনে কোনদিন ভারতে আসেন। কিন্তু তদ্বংশজাত সৈয়দ মুহাম্মদ গাউস জিলানী ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতে এসে এমতবাদ প্রচার করেন। তিনি ভারতের রাজ পুতনায় 'উচ' নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[২]

কলন্দরিয়া তরীকাপন্থীগণ সম্ভবত ঃ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের পর বাংলাদেশে আগমন করেন। কেউ কেউ কলন্দরিয়া সম্প্রদায়কে চিশতিয়া সম্প্রদায়ের শাখা হিসেবে গণ্য করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তা ঠিক নয়। এটা একটা নতুন তরীকা। বুআলী শাহ্ কলন্দর এ সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ। তিনি ছিলেন স্পেনদেশীয় অধিবাসী। তিনি প্রথম চিশতিয়াপন্থী হলেও পরে এ সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি অনীহা প্রকাশ করেন এবং

---

১. Sayed Athar Abbass Resvi. op.cit. p.279

২. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে নিজস্ব একটি মতবাদ গড়ে তোলেন এবং তাকে সংগঠিত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমনের তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হন এবং দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথ নামক স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। ১

"বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় কলন্দর আখ্যাধারী দরবেশগণ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশেষভাবে আসতে থাকেন বলে প্রকাশ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে তারা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ 'কলন্দর' শব্দ দ্বারা সর্বশ্রেণীর সূফী-দরবেশকে অভিহিত করতেন। তার প্রমাণ চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত ও আরবী হরফে 'যোগ কলন্দর' নামক কতকগুলি বাংলা পুঁথি।২

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে উপমহাদেশে নকশাবন্দীয়াপন্থীগণ প্রবেশ করেন। এ তরীকার আদি পুরুষ তুর্কীস্তানের অধিবাসী খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দীয়া। ভারতে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা খাজা মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ্। তিনি তুর্কীস্তান থেকে এ মতবাদ ভারতে আনয়ন করেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন।

হযরত শিহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রবর্তিত সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকা ও হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) প্রবর্তিত চিশতিয়া তরীকার অনুসারী সূফী-দরবেশগণ অদ্বৈতবাদে (ওয়াহদাতুল অজুদ) বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাথমিক যুগের সূফী দরবেশগণের প্রায় সবাই এ দুই তরীকাপন্থী, কাজেই তারা অদ্বৈতবাদের অনুসারী ছিলেন। পাক-ভারত-বাংলার হিন্দু মানসক্ষেত্রে এ মতবাদের অনুকূল ছিল বলে এই দুই সম্প্রদায়ের মতবাদ এ দেশে সহজেই স্থায়ী আসন লাভে সমর্থ হয়। শরীআতী (শাস্ত্রীয়) ইসলামে এ মতবাদ কখনও স্থান পায়নি। ৩

হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ) প্রবর্তিত কাদিরীয়া তরীকায় ও হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ প্রবর্তিত নকশাবন্দীয়া তরীকায় দ্বৈতবাদ অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য স্বীকার করা হয়। এই দুই সম্প্রদায়ের মতবাদ অতি ধীরে এ দেশের মাটিতে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তায় সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া ও চিশতিয়া মতবাদকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি, বরং তাদের প্রভাবে পাক-ভারতে ইসলামী শরীআতের মূল পর্যন্ত নড়ে উঠে। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে অসাধারণ প্রতিভা ও প্রতিপত্তির অধিকারী বিজ্ঞ আলিম নকশাবন্দীয়া তরীকাপন্থী হযরত শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ -ই-আলফ-ই-সানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) ষোলশতকে বিরাট সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। এই সংস্কারের ফলে কাদিরীয়া ও নকশাবন্দীয়া সম্প্রদায় পাক ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশে ইহার শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ সময় থেকে সংস্কৃত নকশাবন্দীয়া সম্প্রদায় মুজাদ্দিদিয়া নামে পরিচিত হয়।৪

---

১. Dr. T.S. Titus এর গ্রন্থ 'Indian Islam' এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত ঃ গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২. ড. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, ৪৫, ৫৯

৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৪. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের সূফী সমাজ (১২০০-১৪০০ খৃঃ)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত জালালুদ্দীন তাবরিজী (রহ.)
(মৃ.১৩৩৭ খৃ.)

বাংলাদেশে আগত প্রথম পর্যায়ের সূফী-সাধকদের মধ্যে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান। উত্তর বঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর। বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের পর সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউজ খিলজীর রাজত্বকালের কোন এক সময় তিনি লাখনৌতি নগরে উপনীত হন এবং এখান থেকে সতর মাইল দূরে অবস্থিত পন্ডুয়ায় আস্তানা স্থাপন করেন। ফলে তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাব সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে বাংলায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এই দরবেশের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আব্দুর রহমান চিশতী তাঁকে আবুল কাসিম মাখদূম শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীরূপে উল্লেখ করেছেন।[১] তিনি পারস্যের তাররিজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমে শায়খ আবূ সাঈদ তাবরিজীর এবং তাঁর মৃত্যুর পর শায়খ শিহাবুদ্দীনর সোহরাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সাত বছর পর্যন্ত তিনি পীরের দেখমত করতে থাকেন। শায়খ আব্দুল হকের মতে, হজ্জ সম্পাদনের জন্য তাঁর গুরু শায়খ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রতি বছর মক্কা-মদীনায় গমন করতেন এবং জালালুদ্দীন তাবরিজীও তাঁর সঙ্গে যেতেন। পীর অসুস্থ হওয়ায় ঠান্ডা খাবার খেতে পারতেন না। তাই প্রয়োজনের সময় পীরকে গরম খাবার দেয়ার জন্য মুরিদ জালালুদ্দীন তাঁর মাথায় একটি উনূন বহন করতেন। ক্ষুধার সময় সঙ্গে সঙ্গে উনূন হতে গরম খাবার পরিবেশন করতেন। তার ধৈর্য্য, একনিষ্ঠতা ও দীর্ঘ সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে হযরত শিহাবুদ্দীন তাঁকে 'খিরকা-এ-খিলাফত' দান করেন।[২]

হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) তৎকালে শায়খ শিহাবুদ্দীন (রহ.) এর সাহায্য লাভের জন্য বাগদাদে আগমন করেছিরেন। সেখানে মঈনুদ্দীন চিশতীর সাথে তাঁর পরিচয় হয়। বাগদাদ থেকে শায়খ জালালুদ্দীন বহুদেশ ভ্রমণ করে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। এখানে মুলতানে অবস্থানকালে তাঁর সতীর্থ শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীন কুবাচা তখন ছিলেন মুলতানের শাসনকর্তা। তাঁর শাসনামলেই জালালুদ্দিন তাবরিজী মুলতান ত্যাগ করে দিল্লীতে আসেন। এই দরবেশ দিল্লী পৌছলে শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ শায়খুল ইসলাম নাযিমুদ্দীন সুগরাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন। সুলতান তাঁকে প্রাসাদের কাছে থাকার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন। এতে শায়খুল ইসলাম ঈর্ষান্বিত হয়ে শায়খ জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মকটি ছিল কলঙ্কিণী এক মহিলার সঙ্গে তার ব্যভিচারের অভিযোগ। কতিপয় আলিম ও দরবেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির উপর বাদশাহ্ এ সম্পর্কিত তদন্তের ভার দেন। শায়খ বখতিয়ার কাকী ও শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়াও ঐ কমিটিতে ছিলেন। যথার্থ তদন্তের পর দরবেশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ভিত্তিহীন, অলীক বলে প্রমাণিত হয়। ফলে সুলতান শায়খুল ইসলামকে পদচ্যুৎ করেন।[৩]

---

১. আব্দুর রহমান চিশতী, মিরাত-উল-আসরার, পৃ. ১৯

২. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, আখবারুল আখিয়ার, (উর্দু অনুবাদ), করাচী-১৯৬৩ইং, পৃ. ৪৪

৩. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে জালালুদ্দীন দিল্লী ত্যাগ করে বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। লাখনৌতি পৌঁছে দরবেশ তাঁর শিষ্যদের বললেন-"এসো আমরা শায়খুল ইসলাম নাযিমুদ্দীন সুগরার জানাজা পড়ি। তিনি আমাদেরকে দিল্লী থেকে বহিস্কার করেছেন, আল্লাহ্ তাকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় করেছেন।"[১]

লক্ষণসেনের সভাপন্ডিত হলায়ূধমিশ্র রচিত 'শেক শুভোদয়া' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দাবী করা হয়েছে যে বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের আগেই দরবেশ বাংলায় এসেছিলেন এবং লক্ষণসেনের রাজ্যে তুর্কীদের আক্রমণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি উত্তর প্রদেশের 'ইটাওয়া' জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কাফুর। তিনি রমজান খান নামক একজন বণিকের সহায়তায় শিক্ষা লাভ করেন এবং ঐ বণিকের দুস্কর্মের ভাগীদার হয়ে গৃহ ত্যাগ করেন। তিনি শুধু একটি কালো পোশাক পরে বাংলায় এসেছিলেন; তাঁর হাতে ছিল একটি পাত্র এবং একটি ছড়ি। বাংলায় পৌঁছে তিনি একটি খানকাহ্ নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি দরিদ্র, নিঃস্বব্যক্তি ও পথিকদের খাওয়াতেন।[২]

অন্য বর্ণনার অভাবে শেক শুভোদয়ার বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ড. এনামুল হক শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীকে উত্তর ভারতের সূফী সাধকদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং তাঁর তাবরিজী উপাধিকে নিছক ঐতিহ্যগত ও বংশানুক্রমিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩]

শেক শুভোদয়ার বর্ণনা সঠিক নয়, বরং কাল্পনিক। হলায়ূধ মিশ্রকে যার রচয়িতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তিনি ছিলেন লক্ষণসেনের সভাকবি। পণ্ডিতগণ গ্রন্থটিকে নকল বলেছেন। এটা আকবরের শাসনকালে টোডর মলের রাজস্ব তালিকা তৈরির সময় বাইস হাজারী জমিদারির উপর অধীকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।[৪] তাঁর প্রমাণ- প্রথমত, জালালুদ্দীন ইটাওয়াতে জন্ম গ্রহণ করেননি। তাঁর জন্ম হয়েছিল পারস্যের তাবরিজে।

দ্বিতীয়, বখতিয়ারের বিজয়ের আগে তাঁর বাংলায় আসা সম্ভবপর ছিলনা; তিনি শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের সময় দিল্লীতে আসেন।

তৃতীয়, তিনি শায়খ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকি এবং শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়ার মত বিখ্যাত দরবেশের সমসাময়িকও ছিলেন।

চতুর্থত, লক্ষণসেন মারা যান ১২০৬ খৃষ্টাব্দে।

সুতরাং ১২১০ খৃষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি দিল্লি আসতে পারেননা।এর আগে তাঁর বাংলায় আসার প্রশ্নই উঠেনা। সুতরাং শেক শুভোদয়ার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

১.শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

২. ড. আব্দুল করিম, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ১৩৬.

৩. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. p. 160 -61.

৪. R.C. Majumder. op. cit. p. 225.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত জালালুদ্দীন তাবরিজির মৃত্যুর তারিখও একটি বিতর্কিত বিষয় । শায়খ আব্দুল হক দেহলভীর আখবারুল আখিয়ারে বলেছেন-তিনি ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে খাজিনাতুল আসফিয়ার বর্ণনা মতে, তিনি ইন্তিকাল করেন ১২৪৪খৃষ্টাব্দে। তাজকিরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়খ জালালুদ্দীন হিজরী ৬২২/১২২৫ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন । আবার শেক শুভোদয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ দরবেশ ৬২০হিজরী/১২২০ খৃষ্টাব্দে বাংলা ত্যাগ করেন। এখন প্রশ্ন হল-কোনটি সঠিক ?

এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল করিম প্রথমোক্ত দু'টি মতকে সম্ভাব্য বলে ধরে নিয়ে বলেছেন-"দরবেশ শুধু কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী এবং বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমসাময়িকই ছিলেন না, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ছিল-একথা বিবেচনা করলে এ দু'টো তারিখই সম্ভাব্য হতে পারে। কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী মৃত্যু বরণ করেন ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে এবং বাহাউদ্দিন জাকারিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন ১২৬২ খৃষ্টাব্দে। শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজী সম্ভবত বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কারণ কথিত আছে যে, অন্তত এক বার শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির জুতা বহন করেছিলেন।"[১] আমার মতেও এ যুক্তিটি যথার্থ বলে মনে হয়। কিন্তু আব্দুল মান্নান তালিব তাযকিরার বর্ণনাকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন-তাযকিরার তারিখটি (১২২৫খৃঃ) শেক শুভোদয়ায় উল্লেখিত শায়খ জালালুদ্দীনের বাংলা ত্যাগের কাছাকাছি বলে এ তারিখটিকেই আমরা সঠিক বলে গ্রহণ করতে পারি। কাজেই আমাদের মতে, ১২২৫ খৃষ্টাব্দে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ইন্তিকাল করেন ।"[২]

শায়খ জালালুদ্দীনের একটি সমাধি সৌধ উত্তর বাংলার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত। আর এটা বড় দরগাহ ও বাইশ হাজারী দরগাহ নামাতে পরিচিত। তবে দরগাহ মুতাওয়াল্লীদের মতে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী প্রকৃত পক্ষে ঐ স্থানে সমাধিস্থ হননি, তিনি আওরঙ্গাবাদে সমাধিস্থ হয়েছেন। পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত মাযারটি ছিল কেবলমাত্র একটি অনুকরণ সমাধি। ব্লকম্যান, স্ট্যাপল্টন মনে করেন-তিনি পাণ্ডুয়াতে সমাধিস্থ হননি । এ মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। অতএব এ দরবেশ যে আওরঙ্গাবাদে সমাধিস্থ হয়েছেন এমত গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারেনা।

আবুল ফজলের মতে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মাযার বন্দর দেওমহলে অবস্থিত।[৩] ব্লকম্যান ও অন্যান্যরা মনে করেন যে, বন্দর দেওমহল হয় গুজরাটের দিউবন্দর অথবা মালদ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত । কিন্তু শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর জীবনের কোন ঘটনার সাথে দিউ বা গুজরাটের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না তাই এ মত ও গ্রহণযোগ্য নয় ।

সূফীদের জীবনীমূলক সাহিত্যে তাঁর বাংলায় আগমনের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁর বাংলা ত্যাগের কোন উল্লেখ নেই। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি বাংলায়ই কোথাও, পাণ্ডুয়া বা

১. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৩. আইন, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

দেওতলায় সমাধিস্থ আছেন । আর এ দু'টি নামের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। আবুল ফজল বলেন-"দিল্লী থেকে শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলাদেশে গমন করেন। বন্দর দেওমহল তার চির নিদ্রার স্থান।" সিয়ারুল আরিফীনের লেখক বলেন-"শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী যখন বঙ্গদেশে এসে পৌছান , তখন সে দেশের অধিবাসীগণ তাঁর নিকট ভীড় জমায় এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এখানে পূণ্যাত্মা শায়খ একটি খানকাহ নির্মাণ করেন ও একটি লঙ্গর খানা স্থাপন করেন। তিনি কিছু জমি ও বাগান ক্রয় করেন এবং তা লঙ্গর খানার খরচ নির্বাহের জন্য দান করেন। সেখানে একটি কুপ আছে। জনৈক মূর্তি পূজক প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন । পূণ্যাত্মা শায়খ সেই মন্দির ধ্বংস করেন এবং এর ঘরগুলোকে তাঁর বিশ্রামের স্থানে পরিণত করেন। বহু অবিশ্বাসীকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁর একমাত্র সমাধি সৌধ এখন সেই মন্দিরের স্থানে অবস্থিত আছে এবং সেই বন্দরের অর্ধেক আয় উল্লিখিত লঙ্গর খানার জন্য বরাদ্দ করা হয়।[১] সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বাংলাদেশেই সমাহিত হয়েছেন ।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী শতাধিক বৎসর পরে সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ (১৩৪১-৪২খৃঃ) তার মাযার নির্মাণ করেন । রিয়াজুল সালাতীনে এ সম্পর্ক যে ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, সুলতান স্বপ্নযোগে পান্ডুয়ায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে এ দরবেশের মাযার নির্মাণে আদিষ্ট হন।[২] 'সীয়ার' ও 'আইন' এ দেওতলাকেই দেওমহল বা দেবমহল বলা হয়েছে। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর নামের সাথে জড়িত দেওতলা এবং দেবমহলের অর্থ অভিন্ন। সুতরাং মনে হয় আইনের দেবমহল এবং বাংলার দেওতলা অভিন্ন এবং দরবেশ দেওতলায়ই সমাধিস্থ আছেন । দেওতলার নতুন নামকরণ করা হয়েছিল তাবরিজাবাদ[৩] এবং আশরাফ সিমনানীর মতে, জালিলিয়া দরবেশগণ দেওতলায় সমাধিস্থ রয়েছেন-এ তথ্য এ মতকে সুদৃঢ় করে ।

শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী এ পান্ডুয়া থেকে ৫ মাইল উত্তরে দেওতলাতেই তার খানকার স্থাপন করেছিলেন। ৮০৬৮ হিজরীতে উৎসকীর্ণ একটি মসজিদের শিলালিপিতে এ অঞ্চলকে 'কসবা তাবরিজাবাদ' নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। সুলায়মান কররানীর (১৫৬৫-৭২) আসলে উৎকীর্ণ একটি শিলা লিপিতে এ অঞ্চলকে সুস্পষ্টভাবে তাবরিজাবাদ ওরফে দেওতলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী এ স্থানকেই নিজের কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন একজন বিখ্যাত সাধুপুরুষ। তিনি তাঁর ত্যাগ, সাধনা, নিষ্ঠা ও গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। বিরাট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও মানব হিতৈষামূলক কার্যাবলীর দ্বারা তিনি বাংলাদেশের অলৌকিক কার্যাবলী সম্পন্ন করেছেন। অধঃপতিত,

১. মাওলানা জামালী, সিয়ারুল আরিফীন, দিল্লী, ১৩১১ হি. পৃ. ১৭১
২. গোলাম হুসায়ন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬
৩. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮ - ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎপীড়িত বৌদ্ধ ও হিন্দুরা মুক্তির জন্য তাঁর নিকট ভীড় জমিয়েছিল এবং ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। এভাবে তিনি উত্তরবঙ্গে একটি শক্তিশালী মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বঙ্গদেশে নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শাসন সংহত ও মজবুত করার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল যথেষ্ট। ধর্মান্তরকারী ও শিষ্য সংগ্রহ করে তিনি একটি অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে মুসলিম শাসনতার জন্য একটি শক্তির উৎস সৃষ্টি করেন। তাঁর খানকাহ্ এবং লঙ্গর খানাগুলো আধ্যাত্মিক, বুদ্ধি-বৃত্তির ও মানব সেবামূলক কার্যের কেন্দ্র হিসেবে বাঙালী সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত করে তোলেন এবং দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর এ দরবেশের প্রভাব ছিল অসামান্য। হিন্দুরা তাঁকে এতবেশী শ্রদ্ধা করত যে, তাঁর মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরেও তারা তাঁর আর্শিবাদ কামনা করত। সমাজ জীবনে শায়খ তাবরিজীর (রহ.) অপরিসীম ও স্থায়ী প্রভাবের ফলে তাঁর স্মৃতি আজও বাংলার জনগণের মনে সমভাবে বিরাজ করছে।[১]

হযরত শাহ জালাল (রহ.)

হযরত শাহ জালাল (রহ.) বাংলার একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তবে তিনি শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর মত অতটা ব্যাপক খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন না। সিলেট অধিকার এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গে ইসলাম বিস্তারের কৃতিত্ব তাঁকেই দেয়া যায়। ইবনে বতুতার মতে, তাঁর হাতে এদেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[২] সিলেটে তার মাযার অবস্থিত। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সিলেট আগমন করেন। এর কয়েক বছর আগে তিনি গৌড়ে আগমন করেন। হযরত শাহজালাল জীবনে বিয়ে করেননি। এ জন্য তাকে মুজাররাদ বলা হয়। তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে তিনি ইয়ামনে জন্মগ্রহণ। এ জন্য তাঁকে 'ইয়ামানী' বলা হয়।[৩] আবার কারো মতে তিনি কুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী তাঁর 'হযরত শাহ জালাল (রহঃ)' নামক গ্রন্থে বহু প্রমাণ উদ্বৃত করে দেখিছেন যে, হযরত শাহ্ জালালের জন্মস্থান ইয়ামন।[৫] তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে, যারা এশিয়া মাইনরের কুনিয়া মনে করেন, তাদের মত অভ্রান্ত নয় তার, তাদের মতে কর্নিয়া বা করননামক জনপদে তার জন্ম হতে পারে, তুরস্কের কুনিয়া নয়। আর তা ইয়ামনেই অবস্থিত।[৬] তার এ প্রমাণ যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

হযরত শাহজালাল (রহ) এর ৩৬০ জন সঙ্গীর বেশ কয়েক জন ইয়ামনের করনের অধীবাসী ছিলেন। কাজেই হযরত শাহজালালের (রহ.) জন্ম ইয়ামনের করনে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কোনক্রমেই

১. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
২. ইবনে বতুতা, আযায়েবুল আসফার (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৩৮৩
৩. নাসির উদ্দীন হায়দার, সুহাইল-ই-ইয়ামন, দ্রষ্টব্য
৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলাম, প্রসঙ্গে, ঢাকা-১৯৩৩, পৃ. ৯৭
৫. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ জালাল (রহ.), ই.ফা.বা. ১৯৮৭ইং, পৃ. ২-১৩
৬. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্কের এশিয়া মাইনরের 'কুনিয়া' নয়। ১৬১৩ সালে গাউসীর 'গুলজারে আবরার' গ্রন্থে বিধৃত কুনিয়াবী শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা করে অনেকে তাঁকে কুনিয়ার অধিবাসী বলে মেনে নিয়েছেন। কুনিয়া শব্দ থেকে 'কুনিয়াবী' হওয়া উচিত। কাজেই কুনিয়া শব্দে কুনিয়ার অধিবাসী বুঝবার কোন হেতু নেই।[১]

হযরত শাহজালাল (রহ) জন্ম সাল নিয়ে ও বেশ মতভেদ দেখা যায়। ইবনে বতুতার মতে, শাহ জালাল দেড়শতবছর জীবিত ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের সময় হিজরী ৭৪৬ বলে উল্লেখ করেছেন। তার হিসেব অনুযায়ী হযরত শাহজালাল জন্মগ্রহণ করেন ৫৯৬ হিজরীতে। ড. শহীদুল্লাহ মনে করেন তিনি ৫৯৮হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[২] ড. মেহেদী হাসানের মতে তার জন্ম সন ৫৯৭ হিজরী। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে তার জন্মসন বলা হয়েছে ৫৯৫ হিজরী।[৩]

মোটামুটি তার জন্ম ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষদশকে-এ ব্যাপারে সবাই একমত। এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, হযরত শাহ্জালাল (রহ.) দেড়শতবছর জীবিত ছিলেন। তার জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে ইবনে বতুতার বিবরণে কোন অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয় না ।

হযরত শাহ জালালের (রহ;) জীবনী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন প্রমাণিক বিবরণ নেই। ইবনে বতুতা ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৭) সময়কার দু'টো শিলালিপিতে ঘটনাক্রমে তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ গাউসী মান্দুবী কর্তৃক সংকলিত 'গুলজার-এ-আবরার' গ্রন্থে শাহজালাল সম্পর্কে কিছু কথা পাওয়া যায় । ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীন নামক জনৈক মুন্সেফ কর্তৃক রচিত 'সুহাইল-ই-ইয়ামন' গ্রন্থে শাহ্ জালালের জীবন সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য এর বেশীর ভাগই স্থানীয় প্রচলিত কল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত । তথাপিও এ গ্রন্থে বর্ণিত কিছু কিছু ঘটনার সমর্থন অন্যান্য সমসাময়িক উল্লেখের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং নিছক কল্পনা বলে এক সম্পূর্ণ অবহেলা করা যায় না।

সুহাইল-ই-ইয়ামনে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা হল-শাহ্ জালাল ছিলেন ইয়ামনের মুহাম্মদ নামক জনৈক সূফীরপুত্র। অল্প বয়সেই তিনি তাঁর মা-বাবাকে হারান এবং মাতুল সৈয়দ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দীর কাছে লালিত-পালিত হন । তাঁর মাতুল নিজেও একজন দরবেশ ছিলেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তাঁর মাতুল তাঁকে এক মুঠো মাটি দিয়ে একই রং ও গন্ধের মাটি যেখানে পাওয়া যায় সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মাতুল ও গুরুর আশির্বাদ নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে ইয়ামনের যুবরাজ তার সঙ্গী হন । পথ চলাকালে শায়খ নিযামুদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত ঘটে । তিনি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে শাহজালালকে একজোড়া কবুতর উপহার দিয়েছিলেন । কালক্রমে তিনি বাংলায় পৌছেন। এ সময় সিলেটের একজন বাসিন্দা শায়খ বুরহানুদ্দীন তার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে

১. Dr. Sagir Hasan Masumi, Jaurnal of the Assitic Society of pakiistan. vo.-10. 1965. p. 65-66.

২. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খন্ড), পৃ. ৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

গরু যবেহ করায় রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্তৃক ভয়াবহ রকমের নির্যাতিত হন। শায়খ বুরহানুদ্দীন এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গৌড়ের সুলতানের নিকট অভিযোগ করেন। সুলতান তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সিকান্দার খান গাযীকে পাঠান । সিকান্দারের চেষ্টা ব্যর্থ হলে সুলতান তার সেনাপতি নাসিরুদ্দিনের নেতৃত্বে তাকে অতিরীক্ত সৈন্য প্রেরক্ত করেন। তবুও সুলতানের সৈন্যবাহিনী উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হন। এ সময় শায়খ জালাল তাঁর ৩৬০ জন দরবেশ নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। রাজা গৌড় গোবিন্দ এবার পরাজিত হয়ে পাহাড়ী এলাকায় পলায়ন করে প্রাণ বাঁচান । সিলেট বিজয়ের পর শায়খ জালাল সিলেটে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ৫৯১ হিজরী / ১২১৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১]

'সুহাইল-ই-ইয়ামন' অনুসারে শায়খ জালাল ছিলেন ইয়ামনী । কিন্তু আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলের একটি শিলালিপি অনুযায়ী তিনি ছিলেন কুনিয়াবী অর্থাৎ তুর্কীস্তানের কুনিয়ার বাসিন্দা।[২] শিলালিপির সাক্ষ্য 'গুলজার-এ-আবরার' এর বিবরণ দ্বারা সমর্থিত । যা হোক, শায়খ জালালের জন্মস্থান সম্পর্কে বিতর্কের বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। এখানে তার পুণরোল্লেখ নিস্প্রয়োজন ।

হযরত শাহ জালাল (রহ:) সম্পর্কে 'গুলজার-এ-আবরার'-এ যে বিবরণ রয়েছে তা নিম্নরুপ : শায়খ জালালুদ্দিন মুজাররাদের স্মৃতি। তিনি তুর্কিস্তানীজাত বাঙালী ছিলেন । তিনি সুলতান আহমদ ইয়াসভীর খলিফা ছিলেন। তিনি একদিন তার রৌশন- যমীর (উজ্জ্বল হৃদয়) পীরের নিকট আরজ করলেন যে, যেমন হুজুরের হিদায়েতে সে শ্রেষ্ঠ জিহাদে (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনায়) কিছু জয়লাভ করেছে. সেইরূপ হুজুরের সফলতা প্রদানকারী আশীর্বাদের সাহায্যে ক্ষুদ্র জিহাদেও (ধর্ম যুদ্ধে) যেন সে মনের বাঞ্ছাপূর্ণ করতে পারে এবং যেখানে যেখানে বিধর্মী রাজ্য আছে, সে সমস্ত স্থান জয় করে সে যেন গাযী বা শহীদের উচ্চ পদ পেতে পারে। বুযুর্গ পীর তাঁর মিনতী কবুল করলেন এবং তার প্রধান খলিফাগণের মধ্যে কয়েকশত ভাগ্যবান জনকে তার সঙ্গী করে দিলেন (আল্লাহ তাদেরকে ইজ্জত দান করুন)। যেখানেই শত্রুর সঙ্গে তাদের মোকাবেলা হত, তাঁরা জয় পতাকা উড়াতেন। আশ্চার্যতর ব্যাপার ছিল যে, এই বহু বিস্তৃত লড়াইয়ে লুটের মাল ভিন্ন তাঁদের অন্য কোনও রুযী ছিলনা.তবুও তাঁরা বড় মানুষী হালে জীবন-যাপন করতেন।

কোন লুটের মাল বা গৃহ পালিত জন্তু লাভ হলে কোন এক বুজর্গ কে তা দিয়ে ইসলামের পথ প্রদর্শন ও বিস্তারের ভার তার উপর সোপর্দ করা হত। শেষ কথা, তিনি (শাহজালাল) ৩১৩ জন সহ সুবা বাংলার এলাকার সিরহাতে (শ্রীহট্ট) পৌঁছুলেন। এক লক্ষ পদাতিক এবং কয়েক হাজার ঘোড় সওয়ারের মালিক গৌর গোবিন্দ ঐ স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন । সেই লস্করের তুলনায় এই দল খাবারের মধ্যে নুনের সঙ্গেও তুলনীয় হতে পারতনা। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল তখন অদৃষ্টের পর্দা থেকে"কতনা ক্ষুদ্র দল আল্লাহর হুকুমের বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে" এই (কুরআনের) বাণীর প্রকাশ জাজ্জ্বল্যমান হল এবং সেই মূর্তি

১. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

২. Shamsudding Ahmed. Inscription of Bengal, vol. iv-p.169.

Dhaka University Institutional Repository

পূজক পালায়ন পর হয়ে কেবল নিজ প্রাণকে নরকের দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু সামার্থ হল না। সমস্ত দেশ ও ভূমি, জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের জয়ীদের হাতে পড়ল।

শায়খ মুজাররদ প্রত্যেকের জন্য হিসসা স্থির করে তাদের জায়গীর দিলেন এবং প্রত্যেককে বিবাহ করার ও অনুমতি দিলেন এই ভাগাভাগিতে শহরটি 'শায়খ নূরুল হুদা আবুল কিরামত সায়দী হুমায়নীর' ভাগে পড়ে । তিনি গৃহী হন এবং সন্তান জন্ম দান করেন। তার বংশধর শায়খ আলী শের এই বৃত্তান্ত তার নুজহাতুল আরওয়াহের টীকার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

১৫১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ বিজয়বার্তা উল্লিখিত হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে -"শায়খুল মাশায়েখ মাখদূম শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সিকান্দার খান গাযীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলভীর শাসনামলে ৭০৩ হিজরী সনে।[২]

যাহোক সিলেট বিজিত হওয়ার পর হযরত শাহজালাল (রহ) সেখানেই নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তার শিষ্যগণের একাংশ গৌড়ীয় সেনাদলের সাথে ফিরে আসেন। তারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। অবশিষ্টাংশ তার সাথেই অবস্থান করতে থাকেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি সিলেট, তার চতুর্পার্শ্বস্থ জেলা সমূহে ও আসামে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অভিযান চালান। ফলে বাংলা ও আসামের অধিকাংশ মানুষ তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।[৩]

হযরত শাহ জালাল তার শিষ্যগণ সৈয়দ জাফর, সৈয়দ আব্দুল গফুর, সৈয়দ ইবরাহীম, সৈয়দ ইসমাইল, সৈয়দ ইসহাক, সৈয়দ মৌলভী রওশন আলী, সৈয়দ গোলাম মুর্তজা, শাহ জামাল, শাহ্ কামাল, সৈয়দ শাহ্ আকরাম আলী এবং শাহ্ আম্বিয়াকে ত্রিপুরা জেলায় ইসলাম প্রচারে পাঠান এবং মাওলানা হাফিজ আহম্মদ, শাহ্ হাফিযুল্লাহ, শাহ মুহাম্মদ দাঈম, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ আহম্মদ ওরফে কল্লা শহীদ প্রমুখকে নোয়াখালী জেলায় পাঠান। কাছাড়, রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্রগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হযরত শাহ্ জালালের শিষ্যগণ ইসলাম প্রচার করেন। কথিত আছে যে, জেলা ২৪ পরগণার পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোঁরাচাদ তার খলিফা ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে সুন্দর বন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হন। তার মাযার জেলা ২৪ পরগণার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে আছে।[৪] মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন এবং চট্টগ্রাম থেকে তিনি সিলেটে হযরত শাহজালালের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য গমন করেন এবং কামরূপে তার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি দরবেশ শাহ্জালালের আস্তানায় কিছুদিন অবস্থান করেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় দরবেশের সংযম,নিষ্ঠা ও সেবাধর্মী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে, তিনি

১. ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৮.

২. J.A.S.B. 1922. p. 413.

৩. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন তখন তিনি খুবই বৃদ্ধ। তিনি পাতলা ও লম্বাগড়নের ছিলেন। তাঁর অল্পদাঁড়ি ছিল। তার দু'দিকের গাল ছিল বসা, একশো পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বাগদাদের খলিফা মুতাসিম বিল্লাহকে দেখেছেন এবং খলিফাকে হত্যা করার সময় (১২৫৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর একাধারে রোযা রাখেন এবং দশদিন অন্তর রোযা খুলতেন। তাঁর একটি গাভী ছিল এবং একমাত্র এর দুধই ছিল তার খাদ্য। তিনি সারারাত উপাসনায় মশগুল থাকতেন।

ইবনে বতুতা আরও বলেন যে, এই দরবেশের প্রচেষ্টাতেই ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং এজন্য তিনি তাদের মধ্যে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই খানকাহ ছিল সাধু-দরবেশ, পরিব্রাজক ও দুঃস্থ মানুষের আশ্রয় স্থল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। তারা তাঁর জন্য নানা প্রকার সামগ্রী উপহার আনত এবং এগুলো দিয়ে তার আস্তানায় বহু লোককে খাওয়ানো হত।[১]

ইবনে বতুতা তিন দিন পর্যন্ত শায়খ জালালের আস্তানায় অবস্থান করেন। তিনি বলেন-"তাঁর (শাহজালালের) আস্তানা থেকে আমি যখন দু'মঞ্জিলের পথ দূরে ছিলাম তখন পথে দরবেশের চারজন শিষ্যের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তাঁরা আমাকে জানালেন, শায়খ অধিকাংশ দরবেশকে জানিয়েছিলেন যে, আরব দেশ থেকে একজন পর্যটক আমার নিকট আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানতে হবে। কাজেই শায়খের নির্দেশ মত আমরা এখানে এসেছি। অথচ আমার আগমন সম্পর্কে শায়খ কিছুই অবগত ছিলেন না । ------- তাঁদের সাথে শায়খের নিকট আমি উপস্থিত হওয়া মাত্র দরবেশ উঠে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং দেশের ও পথের অবস্থা জানতে চাইলেন। আমি সব অবস্থা বললাম। তিনি বললেন-এই আরব ও আযমের মুসাফিরকে তোমরা যথাযোগ্য সমাদর কর।"[২]

তিনি আরও লিখেছেন-"আমার সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের দিনে তিনি পরেছিলেন একটি পশমের জোব্বা। আমার বিদায় বেলায় দরবেশ তাঁর জোববাটি খুলে আমাকে পরালেন। তাঁর মাথার টুপি আমার মাথায় রাখলেন। এসময় তাঁর পরনে ছিল তালি দেওয়া একটা ছেড়া জামা। অনুচরদের নিকট আমি জানতে পারলাম যেদিন আমি আস্তানায় উপস্থিত হলাম সেদিন দরবেশ বলেছিলেন মরক্কোর মুসাফির আমার নিকট থেকে জামাটি চেয়ে নিবেন কিন্তু এক বিধর্মী রাজা তাঁর কাছ থেকে সেটা নিয়ে নিবে। সবশেষে সেই বিধর্মী রাজাই জোব্বাটি আমার ভাই শার্ঘজের বুরহানুদ্দীনকে প্রদান করবে।"[৩]

শায়খ জালালের এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। দুই বছর পর চীন দেশে পরিভ্রমণে গিয়ে ইবনেতুতা তার প্রমাণ পেলেন। তিনি লিখেছেন-" শায়খ জালালুদ্দীনের জোব্বা পরিহিত অবস্থায় আমি চীনের 'খানসাহ্' (হাংচৌফু) শহরে গিয়ে পৌছলাম। আমি যে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সে রাস্তা

১. ইবনে বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩.
২. ইবনে বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩.
৩. ইবনে বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪.

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েই আসছিলেন রাজার মন্ত্রী ও পরিষদবর্গ। মন্ত্রী আমাকে কাছে ডেকে হাত ধরাধরি করে হাটতে লাগলেন এবং রাজ প্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হলাম। তারা আমাকে আসতে দিলেন না আমাকে রাজা দরবারে উপস্থিত করা হল। কথাবর্তা বলার সময় রাজা আমার জোব্বার দিকে তাকিয়ে বললেন- 'বাঃ, পোশাকটি তো সুন্দর।' রাজার কথা শুনে মন্ত্রীরা আমাকে বললেন-'জোব্বাটি খুলে ফেলুন।' আমি আদেশ পালন করলাম। রাজা জোব্বাটি নিলেন। বিনিময়ে আমাকে দশটি পোশাক একটি সজ্জিত ঘোড়া, সাজ-সরঞ্জাম ও কিছু নগদ অর্থ প্রদান করলেন।[১]

ইবনে বতুতা আরও লিখেছেন-"পরের বছর আমি চীনের রাজধানী খানবালিক (পিকিং) গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে থাকতেন বিখ্যাত দরবেশ হযরত বুরহানুদ্দীন শার্ঘজ। একদিন আমি তার আস্তানায় গিয়ে তাঁর গাঁয়ে শায়খ জালালের সেই জোব্বা দেখে আর্শ্চয হলাম। হাত বাড়িয়ে আমি তার জামাটি পরীক্ষা করার জন্য উদ্যত হওয়া মাত্র তিনি হেসে বললেন, 'পরীক্ষা করে কী লাভ, এ জামা আপনার পরিচিত।' আমি জামাটি সম্পর্কে শায়খ বুরহানুদ্দীনেকে সকল কথা খুলে বললাম সব কথা শুনে দরবেশ জানালেন যে, তিনি এসবের সবই জানেন। শায়খ বললেন- এ জোব্বাটি শায়খ জালাল আমার জন্য তৈরি করেছিলেন এবং আমাকে পত্র মারফত জানিয়েছিলেন যে, অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে জোব্বাটি আমার নিকট পৌছবে। শায়খ আমাকে পত্রটি দেখালেন। আমি পত্রটি পড়লাম এবং শায়খের নিশ্চিত সত্য ভাষণের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। শায়খ বললেন-আমার ভাই শায়খ জালাল প্রকৃতপক্ষে এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। এর চেয়েও অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় তিনি দিতে পারেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পাদপদ্মে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।[২]

শায়খ জালাল সম্পর্কে আরও বহু রকম অলৌকিক ঘটনা বিবরণ প্রচলিত আছে। বস্তুতপক্ষে এ কাহিনীগুলোতে হযরত শাহ জালালের (রহ) মহান আধ্যাত্মবাদ মানবসেবার আদর্শ প্রতিফলিত হয়; তাঁর এ আদর্শ জনগণের মধ্যে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করে যে, তারা তাঁকে একজন অসাধারণ মানুষ বলে মনে করত। উত্তর-পূর্ব বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তার ধর্ম প্রচারের উদ্যম ও নিঃস্বার্থ সেবার ফলে এই সুদূর অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল এবং এটা বাংলার অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নীত হয়েছিল। বাস্তবিকই শাহ্ জালাল তাঁর মহান কার্যাবলীর দ্বারা মুসলিম বাংলার নির্মাতাদের মধ্যে উচ্চ আসন লাভের অধিকারী। আদর্শ জীবন, ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ ও দুঃস্থ মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তিনি বাংলার অমুসলমানদেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন[৩] এবং শত শত লোক সংগীতে তার স্মৃতি অদ্যাবধি উজ্জ্বল হয়ে আছে।[৪] যেমন

১. ইবনে বতুতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪.
২. ইবনে বতুতা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫
৩. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৪. দ্রষ্টব্যঃ Md. Enamul Haq, op. cit. p-220-26.

Dhaka University Institutional Repository

"ধন্য তুমি দীনের ফকির, ফকির শাহ্ জালাল,
করছে সারা 'আজম' আলো তোমার মশাল গো॥
ধন্য সে দেশ যে দেশেতে রাখছ তোমার পাও,
ধন্য সে দেশ যাহার বুকে রাখছ পাকি পাও গো"

আবার,

" হিন্দু আছে লাখোলাখো নাইরে মুসলমান
সিলেটের কাছে আসি কে দিল আজান" ?

১৫০ বছর বয়সে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে এই সূফী দরবেশ ইহধাম ত্যাগ করেন।[১] সিলেটে তাঁর মাযার শরীফ আজও সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট তীর্থস্থান।[২]

---

১. হযরত শাহ জালাল (রহ) ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে/৫৯১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন- সুহাইন -ই- ইয়ামনের এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উপরে দেখা গেছে যে, ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ইবনে বতুতা শাহ্ জালালের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। দরবেশ ইবনে বতুতাকে বলেছিলেন যে, ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুহাইল-ই- ইয়ামানের নিজ সাক্ষ্য মতেই বাংলার আসার পথে শায়খ জালাল হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নিযামুদ্দীন আউলিয়া ইন্তিকাল করেন ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে। খানবালিকে অবস্থানের সময় অর্থাৎ ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে ইবনে বতুতা দরবেশের মৃত্যু সংবাদ পান। আর ইবনে বতুতা বলেন যে, দরবেশ ১৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। সুতারাং ১৫০ বছর বয়সে দরবেশ যদি ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে মারা গিয়ে থাকেন তবে তার জন্ম হয়েছিল ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলী সে গুলো সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এ দু'টো প্রান্তিক তারিখের সঙ্গে খাপ খায়। যেমন- তিনি ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু বরণকারী শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন এবং ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। (ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪)

২. এখানে উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুয়ার শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলার ইতিহাসে একজন বড় মাপের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং বাংলার সমগ্র এলাকায় তাঁর নাম ও কার্যপ্রভাব এতবেশী বিস্তৃত হয়েছিল যে, তাঁর ইন্তিকালের ১২০ বছর পরে মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলা সফরে এসে সিলেটের হযরত শাহ্ জালাল মুজাররাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জালালুদ্দীন তাবরিজীরূপে উল্লেখ করে গেছেন। ইবনে বতুতার এই বর্ণনার কারণে কেউ কেউ পাণ্ডুয়ার শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও সিলেটের হযরত শাহ্ জালাল মুজাররাদকে অভিন্ন মনে করেছেন। অথচ উভয়ের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কয়েকশ মাইলের ব্যবধান রয়েছে এবং উভয় দরবেশেরই জীবন কালের ব্যবধান শতাধীক বৎসরের। কাজেই উভয় দরবেশের ভিন্ন ভিন্নতাই সত্য বলে মনে হয় । তাই আমি উভয় দরবেশের এক ও অভিন্নতা সম্পর্কিত বিতর্কে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে উভয়ের পৃথক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আলাদা-আলাদাভাবে তাদের জীবনীতে তুলে ধরেছি । কেননা,আধুনিককাল পর্যন্ত বহু পন্ডিত ও গবেষক এই পূণ্যাশ্লোক সূফী সাধকদ্বয়ের জীবন বৃত্তান্ত অনুসন্ধানের চেষ্টা করে এসেছেন,কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই আজ পর্যন্ত সর্বজন স্বীকৃত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রহ)
(মৃ.১৩০০ খৃঃ)

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রহ) ছিলেন একজন বিখ্যাত সূফী দরবেশ ও পন্ডিত। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য তিনি অসামান্য এক ভূমিকা পালন করেন। তার বিভিন্ন প্রতিভার আলোকোচ্ছটায় সেকালে সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে বিশাল এলাকার নগর বন্দর জনপদ ইসলামের চিরন্তনবাণী প্রচারিত হয়েছে; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত ধারা অনুসৃত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ইসলামি চিন্তাধারার বাস্তবায়ন, উপযুক্ত মানুষ গড়ে তোলার সার্থক প্রচেষ্টা সমাজকল্যানে নিরলস জোরালো ভূমিকা, গ্রন্থ রচনা ইত্যাদির জন্য হযরত আবূ তাওয়ামার (রহ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শায়খ শরফুদ্দিন আবূ তাওয়ামা (রাঃ) আনুমানিক এয়োদশ শতাব্দির প্রথম পাদে উজবেকিস্তানের প্রাচীননগর বোখারার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মাতার পরিচয় পাওয়া যায়না । তবে ঐতিহাসিকগণের ধারণা মতে, ইসলামী দাওয়াত নিয়ে তাঁর পূর্বসূরীগণ বোখারায় হিযরত করেন।[১] তখনকার দিনে বোখারা ও খোরাসান ছিল জ্ঞানানুশীলনের অন্যতম কেন্দ্র । বোখারাতেই তিনি প্রথম লেখা পড়া করেন । তাঁর পরিবার ছিল ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান। সে কারণে বাল্যকালেই আবূ তাওয়ামার ইসলামী শিক্ষা শুরু হয়। আবূ তাওয়ামা যখন বোখারায় লেখা-পড়া করেন তার অনেক আগে থেকেই ইমাম বোখারীর (রাঃ) শিষ্যগণ হাদীস বিষয়ে উচ্চ মানের শিক্ষা দান করে আসছিলেন। আবূ তাওয়ামা তাদের কাছেও সহীহ বোখারী বিষয়ে উন্নতমানের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ছিল অসাধারণ ধী শক্তি। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য দূগর্ম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে তিনি পারস্যের খোরাসানে ছুটে যান এবং সেখানে লেখা-পড়া করেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিকতাও পান্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ধর্মতত্ত্ব, ফিকহ্, হাদীস প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রসায়নবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং যাদু বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে জ্ঞান দানের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজত্বের প্রারম্ভে (১২৬০ খৃঃ) দিল্লীতে আগমন করেন ।[২] দিল্লি এসে তিনি ইসলামী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৩] এখানে এসে তিনি জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চতর তরবিয়াত দানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি, সর্বোপরি ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞানের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে দিল্লি ও তার আশে পাশের বহু জ্ঞানী ও গুণী তার ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে

---

১. Dr. Muhammad Ishaq, Indian Contribution to the Study of Hadith Literature, The University of Dhaka. 1971. p. 53.

২. ড. আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ১৯৫

৩. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৩৬ ইং, পৃ. ৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

পড়েন । হযরত আবূ তাওয়ামা (রাঃ) তাঁর আধ্যাত্মিকতা, পুতচরিত্র ও জ্ঞানের দ্বারা জন সমাজে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় শাহ শুয়ায়বের বর্ণনায়। তিনি বলেছেন- "ঐ সময় মাওলানা আশরাফ উদ্দিন (শরফ উদ্দিন) তাওয়ামার আধ্যাত্মিক জ্ঞান, পান্ডিত্য ও পুতচরিত্রের খ্যাতি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলগুলোতে এবং আরব, ইরান ও অন্যান্য দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। এমনকি রসায়নবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং যাদু বিদ্যায়ও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ধর্ম বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং সাধারণ লোক থেকে শুরু করে আমির মালিক সকলেই তার প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ছিলেন।"[১]

তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন (১২৬০ খৃঃ) ইর্ষান্বিত হন এবং তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা করেন। সে জন্য সুলতান কৌশলে আবূ তাওয়ামাকে সোনারগাঁয়ে চলে যাবার পরামর্শ দেন। সে সময় বাংলাদেশ সুলতানের অধীনে ছিল। সুলতানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি তাঁর সাথে বিরোধিতা করেননি, বরং শাসকের আদেশ মান্য করা বিধেয় বিবেচনা করে তিনি সোনারগাঁয়ের দিকে যাত্রা করেন।[২]

হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ.) সোনারগাঁও অঞ্চলে যাওয়ার সময় কিছু দিনের জন্য বিহারের মানের এ অবস্থান করেন এবং বিখ্যাত দরবেশ শায়খ ইয়াহ্ ইয়া মানেরীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাত করেন । শায়খ ইয়াহ্ ইয়া মানেরীর (রহ.) অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র শরফূদ্দীনের মেধা ও জ্ঞান পিপাসা দেখে আবূ তাওয়ামা অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শায়খ মানেরী এবং তরুণ শরফুদ্দীনও আবূ তাওয়ামার (রহ) শিক্ষা, জ্ঞানের গভীরতা ও তাসাওউফ সাধনায় মুগ্ধ হয়ে যান। সুতরাং পিতামাতার অনুমতি নিয়ে শায়খ শারফুদ্দীন মানেরী সোনারগাঁয়ের পথে শায়খ আবূ তাওয়ামার সঙ্গী হন।[৩]

কখন হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ) সোনারগাঁয়ে আগমন করেন ,এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সৈয়েদ আব্দুল হাই এর 'নুজহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থ অবলম্বনে ডক্টর মুহাম্মদ ইসহাক মনে করেন যে, হযরত আবূ তাওয়ামা সুলতান ইতুৎমীশের আমলে (১২১০-১২৩৬ খৃঃ) সোনারগাঁও আগমন করেন।[৪] ড. সগীর হাসান আল মাসুমী 'মানাকিব-উল - আসফিয়া' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ.) ১২৭০ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবলের আমলে সোনারগাঁও আগমন করেন।[৫] আব্দুল মান্নান তালিব এ উভয় মতই অগ্রহণীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৬] এ বিষয় এর উপর ডক্টর আব্দুল করিম তথ্যবহুল আলোচনা করে মত প্রকাশ করেছেন

১. Calcutta Review, 1939. vol. Lxxi, p.195.
২. Ibid. p. 195.
৩ . Ibid. p. 196.
৪. Dr. Muhammad Ishaq, op. cit. p. 53
৫. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
৬. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

যে, ১২৮২ থেকে ১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শরফুদ্দিন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁও আগমন করেন।[১] উপর্যুক্ত মতবাদগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ.) ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে সোনারগাঁও আগমন করেন।

দিল্লী ত্যাগকালে হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ.) এর সাথে ছিলেন বেগম তাওয়ামা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা যয়নুদ্দীন। তাঁর একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন সন্তান ছিল কী না জানা যায় না। প্রিয় ছাত্র শায়খ শরফুদ্দীনের সাথে তার বিয়ে হয়। তার গর্ভে দু'পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন । পুত্র সন্তান লাভের পর তাওয়ামা তনয়া মৃত্যু বরণ করেন এবং সোনারগাঁয়েই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।[২]

সোনারগাঁও এসে আবূ তাওয়ামা (রহ.) শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত হন। তিনি নুতন ধরণের ও উচ্চ পর্যায়ের কারিকুলাম প্রণয়ন করে একটি মাদ্রাসা (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর মাদ্রাসায় বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে জ্ঞানপিপাসুগণ জ্ঞানান্বেষণে ছুটে আসেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সোনারগাঁও এদেশের ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। শায়খ আবূ তাওয়ামা বোখারার অধিবাসী ছিলেন বিধায় তিনি সেখান থেকে সহীহ্ বোখারীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তথ্যাদি সাথে নিয়ে আসেন। তার প্রচেষ্টার ফলে সোনারগাঁও হাদীস শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৩]

হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ.) প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করা হত । (ক) আল উলুমুল নাকলিয়া (Traditional Science), (খ) আল উলুমুল আকলিয়া (Rational Science), আল উলুমুল নাকলিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল : (১) ইলমুল কিরাত , (২) ইলমুল তাফসীর কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত বিষয়, (৩) ইলমুল হাদীস (৪) ইলমুল ফিক্হ্, (৫) ইলমুল তাওহীদ, (৬) ইলমুল কিয়াস,(৭) ইলমুল আদব (৮) ব্যাকরণ, (৯) ইতিহাস (১০) সীরাতে রাসূল এবং সাহাবগণের জীবনী। আল উলুমুল আকলিয়ার অন্তর্ভূক্ত বিষয় ছিল (১) দর্শন (২) যুক্তিবিদ্যা, (৩) জ্যোতিষ বিদ্যা, (৪) মনোবিজ্ঞান, (৫) পদার্থ বিদ্যা, (৬) রসায়ন, (৭) উদ্ভিদ বিজ্ঞান, (৮) ভুতত্ত্ব, (৯) প্রাণিবিদ্যা, (১০) ভুগোল, (১১) গণিত (১২) চিকিৎসাবিদ্যা (১৩) প্রযুক্তি বিজ্ঞান, (১৪) ব্যবসা এবং (১৫) কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি।[৪]

তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষাবীদগণকে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল্লামা তকীউদ্দিন, আবূ তাওয়ামার ছোট ভাই আল্লামা যয়নুদ্দীন ও পরবর্তীকালে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন শায়খ আলাউল হক। হযরত আবূ তাওয়ামার (রহ.) ইন্তিকালের পর তাঁর শিষ্য শায়খ ইবরাহীম দানেশমন্দকে উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এখান থেকে বহু জ্ঞানী-গুণীর আবির্ভাব হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহ্ইয়া মানেরী, শায়খ বদরুদ্দীন যায়েদ, শায়খ যঈন ইরাকী, শায়খ ইবরাহীম দানেশমন্দ। তাঁরা রসায়নবিদ্যা. জ্যোতির্বিদ্যা, সমরবিদ্যা , তফসীর ও হাদীস বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন।

১. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

২. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, 'শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রহ.)' ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৯২ইং, পৃ. ৩৯৯

৩. মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৭০ ইং, পৃ. ৬৭১.

৪. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁও অঞ্চলেই তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমিত রাখেননি। তিনি সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে আসাম সহ সমগ্র বাংলাদেশে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে একজন চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্র নায়কের ভূমিকা পালনে ব্যতিক্রম ধর্মী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের সকল নদীপথের দূরত্ব ও যাতায়াত সুবিধার জন্য জরিপ সম্পন্ন ও একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রণয়নের নির্দেশ দেন। রাজমহল, আসাম ও আরাকান এলাকায় যে সব মুসলসমান বসতি স্থাপন করে ব্যবসার কাজ করতেন, তাদের সাথে এলাকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন।[১] তিনি একটি বড় আকারের লঙ্গরখানাও স্থাপন করেন এবং এতে নও মুসলিম মুজাহির ও মুসাফিরগণের বিনা পয়সায় খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করেন।

কুরআন, হাদীস এবং ফিক্‌হ ছাড়াও শায়খ আবূ তাওয়ামা রসায়ন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা পাওয়া যায়না। তাঁর দু'টি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি 'মাকামা' অপরটি 'নাম-ই -হক'। ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায় সোনারগাঁও অঞ্চলে এরূপ আরো বহু সম্পদ লুকায়িত থাকতে পারে । অনুসন্ধান আর গবেষণা করে তা বের করে আনা গেলে অমূল্য রত্নরাজী আমাদের জন্য অবারিত হবে।[২]

শিক্ষাদান, ইসলামি দাওয়াত প্রচার ও প্রসার, তরবিয়াত, সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্তব্য পালনে শায়খ আবূ তাওয়ামা যে খ্যাতি অর্জন করেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তার চেয়েও অধিক সম্মান লাভ করেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ আলিম ও ওলী। রাতের বেলায় মাটির নিচে কুঠুরিতে আল্লাহর মুরাকিবা মুশাহিদায় ঘন্টার পর ঘন্টা মগ্ন থাকতেন। আজও তাঁর সেই ইবাদত গৃহটি অক্ষত অবস্থায় আছে।[৩]

শায়খ আবূ তাওয়ামা (রহ.) তাঁর অদম্য সাধনা বলে বাংলাদেশে জ্ঞান বিস্তারের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে বাংলার কোথাও অত্যাচার, যুলুম, নির্যাতন হলে তার নিরসনেও তৎপর হতেন। দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে প্রায়ই মুসলিম নির্যাতনের সংবাদ সোনারগাঁয়ে এসে পৌছ। চট্টগ্রাম থেকে এমন একটি সংবাদ সোনারগাঁয়ে এসে পৌছলে হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ.) তার খলিফা বদরুদ্দীন যায়দকে অবিলম্বে উপর্যুক্ত নৌ-বহর তৈরীর নির্দেশ দেন। উস্তাদের নির্দেশে তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বড় আকারের ১৬০ খানা নৌকা নির্মাণ করেন।[৪]. বদরুদ্দীন যায়দ উস্তাদের আদেশে চট্রলা অভিমুখে রওয়ানা দেন। তার প্রজ্ঞাবলে বিনা রক্তপাতে মগদের বিতাড়িত করে চট্রলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

অতঃপর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থেকে মুসলিম নির্যাতনের সংবাদ এলে আবূ তাওয়ামা (রহ.) বদরুদ্দীন যায়দকে হেমতাবাদ প্রেরণ করেন। যায়দ তাঁর কুটনৈতিক প্রজ্ঞাবলে সুলতান হুসাইন শাহের সাহায্যে রাজা মহেশকে পর্যুদস্ত করেন এবং মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

চট্রলা-হেমতাবাদের ন্যায় রাজমহলেও মুসলিমদের উপর অত্যাচারের সংবাদ আসলে আবূ তাওয়ামা (রহ.) বদরুদ্দীন যায়দকে নৌ-বাহীনির দায়িত্ব দিয়ে রাজমহল অভিযানে প্রেরণ করেন। যঈন ইরাকীকে তার সাথে স্থল বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। রাজশাহীর ঘোড়াঘাটে উভয় বাহিনীর একত্রে মিলিত হয়ে রাজমহল অবরোধ করেন। অতঃপর সেখানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রহঃ) ৭০০হিঃ/১৩০০ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং সোনারগাঁয়ে সমাধিস্থ হন।[৫]

---

১. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮
২. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯
৩. ফজল মুহাম্মদ, সোনার গাঁয়ে সেই সোনা নেই, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৯শে মে, ১৯৮৯ইং, ঢাকা।
৪. ফজল মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত
৫. Dr. A.K.M. Ayub Ali. History of Tradition Islam Education in Bangladesh. Islamic foundation Bangaladesh. 1983. p.31.

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহ্ইয়া মানেরী (রহ.)
(১২৬৩-১৩৭১ খৃঃ)

শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ হিঃ ৬৬১ সালের শাওয়াল মুতাবিক ১২৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিহারের পাটনা জেলার 'মানের' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম শায়খ ইয়াহইয়া এবং মাতার নাম রাজিয়া বিবি। তাঁর পিতৃকুল কুরাইশ গোত্রের আবদ মুন্নাফ এবং মাতৃকুল ইমাম জাফর সাদিকের বংশধর ছিলেন।[২] পিতৃগৃহেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। অতঃপর মক্তবে ভর্তি হন। বাল্যকাল থেকেই উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং এক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন।[৩]

পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি স্বদেশে শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞান লাভের আগ্রহ ও আকাঙ্খা তার এত তীব্র ছিল যে, পনের বছর বয়সেই তিনি ইলম হাসিলে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য বিখ্যাত সূফী ও পন্ডিত হযরত আবূ তাওয়ামার (রহ.) ছাত্র হিসেবে সোনারগাঁও আগমন করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সোনারগাঁও পৌছে তিনি জ্ঞানার্জনের ভেতর একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়ে যান। তিনি পনের বছর সোনারগাঁও অবস্থান করে এখানেই তাঁর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি যেমন একদিকে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, কালাম, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও গণিত প্রভৃতি যাহিরী ইলম এ দক্ষতা অর্জন করেন। অন্যদিকে তেমনি তাসাওউফ সাধনায় বহু সময় অতিবাহিত করেন এবং ধ্যান ও আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা বাতিনী বিদ্যায় পারদর্শী হন।[৪] তাঁর রচনাবলীতে এসব সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে।

শায়খ শরফুদ্দীন আহম্মদ অধ্যয়ন ও পাঠাভ্যাসে খুবই মগ্ন থাকেন এবং সময়ের যথার্থ মূল্য দিতেন। ছাত্র ও আগন্তুকদের সাধারণ দস্তরখানে হাজির হওয়া এবং সকলের সঙ্গে খাওয়ায় শরীক হওয়া ও সেখানে অধিক সময় অতিবাহিত করা তিনি পছন্দ করতেন না। ফলে আবূ তাওয়ামা (রহ.) তাঁর গভীর নিবিষ্টতা ও প্রকৃতির এ ধরনের চাহিদা অনুযায়ী তাঁর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন।[৫]

এ সময় তিনি অধ্যয়ন ও চিন্তা গবেষণায় এত তন্ময় থাকবেন যে বাড়ীর চিঠি-পত্র পড়ার অবসর পেতেন না। সোনারগাঁও অবস্থানকালে দেশ থেকে যেসব চিঠি-পত্র আসত সেগুলোকে তিনি একটি ঝুঁড়িতে রেখে দিতেন এবং তাদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি চিঠিগুলো খুলে দেখেন। প্রথম চিঠিখানী পড়েই তিনি জানতে পারেন যে, তার পিতা শাহ মাখদুম ইয়াহইয়া ইতোমধ্যে অর্থাৎ ১২৯১ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেছেন।[৬] এ দুঃসংবাদ অবগত হয়ে তিনি খুবই মার্মহত ও কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে পড়েন।

---

১. Dr. Muhammad Ishaq, op. cit. p. 67.
২. ইসলামী বিশ্বকোষ (৩য়খন্ড), পৃ.২৬৩
৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
৪. অধ্যক্ষ, শইখ শরফুদ্দীন, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৬৯ইং, পৃ. ১৫৯
৫ Calcutta Review, 1937. p. 197.
৬. সৈয়দ মুর্তজা হোসাইন আবুল উলায়ী, (অনূ. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ সাহিত্য ভূষণ), সহীফায়ে সিদ্দীকীয়া, খানকাহ আবুল উলাইয়া সিদ্দীকীয়া, ঢাকা-১৯৮২ ইং, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

শরফুদ্দীন দীর্ঘ পনর বছরকাল শায়খ আবূ তাওয়ামার (রহ.) অধীনে ইসলামী বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় জ্ঞানার্জন করেন এবং পূর্ণতা লাভ করেন। তাঁর প্রতিভা ও গুণাবলীর স্বীকৃতি স্বরূপ আবূ তাওয়ামা (রহ.) স্বীয় কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মলাভ করে। পরে তাঁর স্ত্রী ও দুইপুত্র মারা যান এবং সোনারগাঁয়ে তাদের সমাধিস্থ করা হয়। ১২৯২/৯৩ খৃষ্টাব্দে সোনারগাঁও ত্যাগ করে তিনি মানেরে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

পরবর্তীকালে তিনি বাংলার এসেছিলেন কী না জানা যায় না। তবে সুলতান সিকান্দার শাহের সঙ্গে তার পত্র যোগাযোগ ছিল।[২] চিঠিতে তিনি সুলতানকে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।[৩] বিহারে ফিরে গিয়ে তিনি ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। দেশে কিছুকাল কাটানোর পর তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র যাকিউদ্দীনকে সাথে নিয়ে দিল্লীর পথে যাত্রা করেন। সেখানে অনেকের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি দিল্লী থেকে পানিপথে চলে যান এবং শায়খ বুআলী কলন্দরের (মৃ.১৩২৩ খৃ.) সাথে সাক্ষাত করেন। অতঃপর তিনি লাহোর গমন করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দীন ফেরদৌসীর (মৃ.৭৩৩হি.) শিষ্যত্ব বরণ করেন। ইজাজত নিয়ে তিনি আবার মানেরের দিকে রওয়ানা হন। এ সময় বিহহিয়ার গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তার হঠাৎ 'হাল' দেখা দেয়। তার ধৈর্য ও সংযমের বাধ ভেঙ্গে যায় এবং গিরিবন চক জঙ্গলের পথ ধরে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বার বছর পর্যন্ত বিহহিয়ার জঙ্গলে তিনি কঠিন ইবাদাত, যিয়ারত ও চিল্লাকাশীতে কাটান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে ধন্য হয়ে তিনি পূনরায় তাঁর মায়ের নিকট ফিরে আসেন।[৪]

কিছুদিন বাড়ীতে অবস্থান করার পর তিনি বিহারের রাজগীরের জঙ্গলে রিয়াজত ও মোশাক্কাতের উদ্দেশ্য গমন করেন। এজঙ্গলে তিনি সুদীর্ঘ আটাশ বছর অতিবাহিত করেন। কিন্তু কারো সাক্ষাত লাভের সুযোগ ঘটেনি। এ সময়কাল তিনি রিয়াযত ও মুজাহাদা, নির্জনবাস ও মুরাকাবা, অত্যাশ্চর্য ও ভবঘুরে অবস্থা এবং আত্মহারা ও অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারন করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-"আমি যে রিয়াযত করেছি সে রিয়াযত যদি পাহাড়ও করত তবে সে গলে পানি হয়ে যেত। কিন্তু শরফূদ্দীনের কিছুই হল না।"[৫] রাজগীরের জঙ্গলের পাহাড়ের পাদদেশে একটি উষ্ণ প্রসবণ সংলগ্ন তার হুজরা আজও বর্তমান। 'মাখদূমকুন্ড' নামে সেখানে একটি ঝর্ণাও রয়েছে।

রাজগীর জঙ্গলে অবস্থানকালে তাঁর নিকট লোকজনের সমাগম বাড়তে থাকলে বীরজুন শহরে একটি খানকাহ নিমার্ণ করে সেখানে অবস্থান করেন এবং লোকজনের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। ৭২১ থেকে ৭২৪ হিজরীতে নিযামুদ্দীন আওলিয়ার একজন সহচর নিযাম মওলা বিহার শহরের বাইরে তার জন্য একটি পাকা-পোক্ত দালান নির্মাণ করেন এবং শায়খকে তথায় অবস্থান করার অনুরোধ করেন।

১. সায়্যিদ জমীর উদ্দীন আহমদ, সিরাতুশ শরফ, পৃ. ৫২

২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, কলিকাতা, ১৯৬৬ ইং, পৃ. ৫৭

৩. ড. আব্দুল করিম,বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১.

৪. সৈয়দ মোর্তজা হোসাইন আবুল উলায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৫ সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, (অনূ. আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী), ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (৩য় খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ইং, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন এবং বলেন-" তোমাদের ভালবাসা আমাকে একটি প্রতিমা গৃহে অবস্থান করতে বাধ্য করছে।"[১] অতঃপর সুলতান মুহাম্মদ শাহ তুঘলক একটি সুরম্য খানকাহ্ তৈরী করে তাঁকে সেখানে বসবাস করার অনুরোধ করেন। এর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তিনি রাজগীর পরগণার জায়গীরও দান করেন। অনন্যোপায় হয়ে তিনি তা গ্রহণ করেন। অবশ্য সুলতানের মৃত্যুর পর সুলতান ফিরোজশাহ্ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করার পরে তিনি প্রদত্ত জায়গীরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[২]

অবশেষে তিনি লোকের অনুরোধ বিহারের এসে বসবাস করতে থাকেন।৭২৪ হতে ৭৮২ হিজরী পর্যন্ত অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী কালেরও বেশী সময় আল্লাহ্র সৃষ্টিকূলকে হিদায়াত ও পথ প্রদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের তালিম ও তারবিয়াত প্রদানে অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর শিষ্যের সংখ্যা লক্ষাধিক ছাড়িয়ে যায়। কতিপয় হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীও তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

শায়খ মালেরীর চাল-চলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। তিনি সাধারণ মানের পোশাক পরিধান করতেন। মানুষের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতেন, মুসলমানদের অবস্থা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং সৃষ্টির সেবাকে সর্বোত্তম কাজ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন-"মুসলমানদের প্রয়োজনীয় কাজ করে দেয়া, তাদের কল্যাণ চিন্তায় সর্বদা লেগে থাকা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার এটা নবীদের কাজ। এ অন্ধকার দুনিয়ায় কলম, মুখ এবং সম্পদের দ্বারা যতদূর সম্ভব অভাবী ও মুখাপেক্ষী লোকদের শান্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"[৩]

একাধারে চল্লিশ বৎসরকাল পাহাড়ে জঙ্গল থেকে উবাদাত ও রিয়াযতে নিমগ্ন থাকার পরেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর জ্ঞানের পরিমন্ডল ও পরিধি যে কত ব্যাপক ও গভীর ছিল এতে সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর রচিত মাকতুবাত (পত্রাবলী)। মালফুজাত ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রণীত পুস্তকাবলী তাঁর উচ্চ জ্ঞান গরীমার নিদর্শন বহন করছে। সর্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। যুগের মহাজ্ঞানীদের প্রথম সারিতে তাঁর অবস্থান ছিল। জ্ঞানের বিবেচনায় তাঁকে 'ইমামুল আয়িম্মা' বলা চলে।'[৪] তিনি তাফসীর হাদীস, ফিক্হ, আদব, মানতিক, আকাঈদ, ফালসাফা, রিয়াজি এবং হিন্দাসা ইত্যাদি সকল বিষয়ের জ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। ইন্দ্রিয়-অতীন্দ্রিয় সকল প্রকার জ্ঞানের অঙ্গনে তিনি বিচরণ করতেন। তিনিই প্রথম ভারত বর্ষে ইলম-ই-হাদীস চর্চা আরম্ভ করেন।ইলম-ই-হাদীসের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তাঁর রচিত মালফুজাত, মাকতুবাত ও অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে স্থানে স্থানে হাদীসের সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাদীস শাস্ত্রে তার অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন ড.

১. ইসলামী বিশ্বকোষ (৩য়খন্ড), পৃ. ২৬৩
২. শাহ্ শুআয়ব, মানাকিবুল আসফিয়া, বিহার-১৯২৬ইং, পৃ. ১৩৫
৩. শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ মানেরী, মাকতূবাত -এ- সাদী, মাকতুব নং ৬১
৪. শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ ইয়াহইয়া মানেরী (অনু. মীর হাসান আলী), মাকতূবাত-এ-সাদী, ঢাকা-১৯৭৯ইং (মূল গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অধ্যায়)

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইসহাক এভাবে-" Sharaf-al-Din was an out standing Traditionist of this part of India. He was thoroughly acquinted with all the branches of Hadith literature, viz Ilm Tawil -al-Hadith. Ilm Rijal-al-Hadith and Ilm Mustalahat-al- Hadith. His Maktubat and books on sufism are interspered with Ahadith both verbatim and reproduced. This is not all at times he would devot pages of his works for the discussion of the different aspect of the science e.g. Rewayat bil mana (Narration of the Traditionists and not the wardings of) Shurat-al-Rewi (conditions for an approved transmitter), and so on so forth. In his works references have been made of sahihan, the Musnad of Abu Yata -al- Mawsili sharh-al- Masabih and Moshariq-al-Anwar. Further, a copy of sharh sahih Muslim by al Nawawi (d. 672) is believed to have been in his possesion for the purpose of his study. He is credited to have for the first time, indtroduced the teaching of the Sahihan in Bihar, any in India. He was not merely well conversant with Hadith. As a matter of fact, he practised it to such an extent that he did never in his life taste melon. Simply because there was nothing to shaw that the prophet of Islam had tasted it. Last but not the least, he was an authority of the Mystical teachings of both the Quran and the sunnah."[১].

এ পর্যন্ত তাঁর রচিত যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় সে সব হল- (১) ফাওয়াইদ-ই-রুকনী, (২) রাহাতুল কুলুব আজওয়াবাহ্, (৩) ইরশাদুল তালিবীন, (৪) ইরশাদুস সালিকীন, (৫) রিসালা-ই-মাক্কিয়া, (৬) মিদানুল মাআনী, (৭) লাতাঈফুল মাআনী, (৮) ইশারাত-ই-মুখখুল মাআনী, (৯) তুহফা-ই-গায়বী (১০) খানেপুর নি'মাত, (১১) রিসালা-ই-দর তলব-ই- তালিবান, (১২) মালফুজাত, (১৩) যাদ-ই-সফর (১৪) আকাঈদ-ই-শারফী, (১৫) ফাওয়াঈদ-ই-মুরিদীন, (১৬) বাহরুল মাআনী, (১৭) সাদারুল মুজাফফার (১৮) কানজুল মাআনী, (১৯) গন্দে লা ইউফনী, (২০) মুনিসুল মুরিদীন, (২১) শরাহ্ আদাবুল মুরিদীন এবং (২২) মাকতূবাত গ্রন্থগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থসমূহ আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত। তাঁর সবচেয়ে বড় স্মৃতি এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা, বিশ্লেষণের স্থান ও ইজতিহাদী শক্তির সর্বাপেক্ষা বড় প্রকাশ তাঁর মাকতূবাত (পত্রাবলী)। তাঁর লিখিত মাকতুবকে সংকলণ করে যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে তা-ই মাকতুবাত নামে পরিচিত। এ সব গ্রন্থে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তার গ্রন্থরাজীর প্রশংসা করতে গিয়ে শায়খ আব্দুল হক দেহলভী লিখেছেন-"শায়খ শরফুদ্দীন মানেরী ভারতের বিখ্যাত সূফী পুরুষদের অন্যতম। তিনি প্রশংসার অতীত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি পান্ডিত্যপূর্ণ ও উচ্চ প্রশংসিত। সূফীমতের মূল সুত্র ও সত্যের রহস্য তাঁর গ্রন্থাবলীর বিষয়বস্তু।"[২]

এই মহান মনীষী ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে ১২০ বছর বয়সে বিহারে ইন্তিকাল করেন। সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর তার নামাযে জানাজা পড়ান। বিহার শহরে তাঁর মাযার এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং লোকজন তা নিয়মিত যিয়ারত করে থাকেন।

---

১. Dr. Muhammad Ishaq. op. cit, p. 67-68.

২. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ রিজা বিয়াবাণী (রহ.)
(মৃ. ১৩৫৩ খৃঃ).

কেবল গোলাম হুসায়ন সলীমই-তাঁর 'রিয়াজ-উস-সালাতীনে' শায়খ রিযা বিয়াবানীর নাম উল্লেখ করেছেন।[১] তিনি উত্তরবঙ্গের একজন প্রভাবশালী দরবেশ ছিলেন। চতুর্দশ শতকের (১৩৪২-১৩৫৭) গৌড়ের সুলতান ছিলেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। সুলতান এই দরবেশকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।[২] দিল্লীর বাদশাহ্ ফিরোজ শাহ (১৩৫১ -১৩৮৮) ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে গৌড় আক্রমণ করলে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ 'একডালা' দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ফিরোজ শাহের সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় নগরের অভ্যন্তরে শায়খ রিযা বিয়াবানী ইন্তিকাল করেন। ঐ সময় সুলতান নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে ফকিরে ছদ্মবেশ ধারন করে দরবেশের জানাজায় যোগদান করেন।[৩] অতঃপর দূর্গে ফিরে যান।

মাখদূম শাহ জালালুদ্দীন জাহানিয়া জাহান গাশ্‌ত (রহ.)
(১৩০৭ - ১৩৮৩)

এই দরবেশ ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ শেষে তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। তদানীন্তন বাংলার প্রাণকেন্দ্র পান্ডুয়ায় কিছুকাল অবস্থান করে তিনি রংপুরে আসেন। রংপুরের প্রথম ইসলাম প্রচারক হিসেবে তাঁর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রংপুরের তিন/চার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহীগঞ্জ নামক স্থানে তাঁর একটা আস্তানা বর্তমান রয়েছে। তিনি ছিলেন সৈয়দ জালালুদ্দীন বোখারীর দৌহিত্র ও আহমদ কবিরের পুত্র।[৪] তিনি সাধারণতঃ শাহজালাল মাহী সাওয়ার নামে পরিচিত। বহুদেশ ভ্রমণ করায় তাঁকে 'জাহানিয়া জাহান গাশত' উপাধি দেয়া হয়েছিল। তাঁর নামানুসারেই মাহীগঞ্জ এলাকার নামকরণ করা হয়েছে। মাহীগঞ্জের খানকাহ্ হতে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি পাঞ্জাবে ফিরে যান। পাঞ্জাবের 'উচ' নগরে ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। 'উচ' নগরে তাঁর মাযার রয়েছে।

পান্ডুয়ায় অবস্থানকালে এ দরবেশ বিখ্যাত সূফী সাধক হযরত আলাউদ্দিন আলাউল হক (রহ.) এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর জানাজায় ইমামতি করেছিলেন।[৫] এটা সত্য নয়। কেননা, প্রাপ্ত তথ্যানুসারে জানা যায় যে, শায়খ আলাউল হকের (রহ.) ইন্তিকালের (৮০০হিঃ) প্রায় ১৫ বছর পূর্বে জাহানিয়ান জাহাগাশ্‌ত ইন্তিকাল (৭৮৫ হিঃ) করেন।

পান্ডুয়ায় 'জাহান জাহানিয়া' নামে একটি মসজিদ রয়েছে। সম্ভবত নামটি জাহানিয়ার বিকৃতরূপ এবং মাখদূম জাহানিয়া জাহান গাস্তের নামানুসারে মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছিল। এ মসজিদটি সুলতান গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। কিংবদন্তি অনুসারে আরও দু'টি পুরা নিদর্শন এ দরবেশের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তামা দন্ডের উপর স্থাপিত ঝান্ডা বা কুলজী নকশা এবং কদম রসূল বা রাসূল (সাঃ) এর পদ চিহ্নের পাথরের প্রতিকৃতি। প্রথমটি পান্ডুয়ায় শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর দরগাহে এবং দ্বিতীয়টি গৌড়ের বিখ্যাত কদম রসূল ভবনে রক্ষিত আছে।[৬]

১. গোলাম হুসায়ন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৩. রমেশচন্দ্র মজুদার, বাংলাদেশের ইতিহাস(২য় খন্ড), কোলকাতা, ১৩৮৫ বাং, পৃ. ৩৬
৪. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, আখবারুল আখিরার, দিল্লী, ১৩৩২ হি. পৃ. ১৪৭
৫. Abid Ali Khan, op.cit. p. 109.
৬. Abid Ali Khan, op. cit. 92.

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ কলন্দর (রহ.)

রংপুরের ডোমার রেলস্টেশনের অনতিদূরে সোনারাই গ্রামে শাহ্ কলন্দরের মাযারের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। তাঁকে ত্রয়োদশ শতকের একজন সূফী বলে গণ্য করা হয়। প্রতিবছর ২৭শে বৈশাখ শাহ্ কলন্দরের স্মৃতি উপলক্ষে বহু জন সমাগম হয়। কথিত আছে যে, শাহ্ কলন্দরের আধ্যাত্মিক শক্তি, সাধনা ও চরিত্র মাধুর্যে বিমুগ্ধ হয়ে দেশ-বিদেশের বহু লোক এসে তাঁর শুভেচ্ছা কামনা করত। তৎকালীন সমাজে ক্রীতদাসগণ তাদের মনিবদের নিকট যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন ভোগ করত, শাহ্ কলন্দর বহু ক্রীতদাসকে সে ভয়ানক অবস্থা থেকে মুক্ত করেন এবং ইসলামে দীক্ষিত করেন। উপরন্ত, তাঁর উপদেশ ও কর্মত ৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে অসংখ্যা লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর জন্ম মৃত্যুর সময় নিরূপণ করা যদিও দূরূহ ব্যাপার, তথাপিও এটা সত্য যে, তিনি পরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।[১]

গাযী ইসমাঈল হোসাইন (রহ.)

গাযী ইসমাইল হোসাইন শহীদ 'রিসালাতুশ শুহাদায়' বর্ণিত সুলতান রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ্র (১৪৫৯-১৪৭৪) সেনাপতি হিসেবে উড়িষ্যা ও কামরূপ বিজয়ী শাহ ইসমাইল গাযী এক ও অভিন্ন কী না তা গবেষণার বিষয়। গাযী ইসমাইল হোসাইন শহীদ রংপুর শহরের ২০ মাইল দক্ষিণে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত আছেন। তিনি সম্ভবত ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আরবের ইয়ামন থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য উত্তর বাংলায় আগমন করেন। তাদের দলপতি ছিলেন হযরত শাহ জালাল (রহ.)। অন্য মতে, তাদের সঙ্গে আরও ৬০ জন দরবেশ ছিলেন। হযরত শাহ্ জালাল (রহ.) সিলেট জেলায় আস্তানা নির্মাণ করে সেখানেই অবস্থান করেন এবং গাযী ইসমাইল হোসাইনকে কতিপয় সহচর সহ রংপুরে প্রেরণ করেন। রংপুর তখন গৌড়ের অধীনে ছিল। গৌড়ের তদানীন্তন নবাব নূর বদর জঙ্গ গাযী ইসমাঈল হোসাইনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। দরবেশ উক্ত পদ গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। জীবদ্দশায় বহু যুদ্ধে জয়লাভ করায় তাকে 'গাযী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২]

জনশ্রুতি মতে, বগুড়ার রাজা নীলাম্বর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কয়েকবার দরবেশকে হত্যার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু প্রতিবারই তিনি ঐশী শক্তিবলে রেহাই পান। একবার রাজা নীলাম্বর গাযী ইসমাইল হোসাইনকে প্রাণে মারার জন্য খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেন এবং তাপস দরবেশ এবারও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান এবং ইসলাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। মানবতার সেবায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর ভক্তগণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েন এবং তাঁর মাযারের উপর একটি দরগাহ্ নির্মিত হয়। প্রার্থনা জানায় রোগমুক্তির জন্য, ইহকাল ও পরকালের শান্তির জন্য।[৩]

---

১. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

২. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৩. মোস্তাফিজুর রহমান কাদরী,দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা-৩রা, আশ্বিন, ১৩৭৬ বাং,

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ আব্দুল্লাহ্ কিরমাণী (রহ.)

এই দরবেশের পুরো নাম সায়্যিদ আব্দুল্লাহ্ ওয়ালী হুসায়নী কিরমাণী। তিনি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর (১১১২-১২৩৫ খৃ.) শিষ্য ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে আগত প্রথম যুগের চিশতীয়া সূফীদের অন্যতম। ইরানের কিরমান নগরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা সুলতান বরখোরদার শাহ্ কিরমান অঞ্চলের শাসক ছিলেন। কিরমানে জন্ম গ্রহণ করেন বলে তাঁর নামের সঙ্গে কিরমানী স্থান বাচক পদবী ব্যবহার করা হয়।[১]শায়খ আব্দুল্লাহ্র পিতা একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও পরহেযগার দীনদার সূফী সাধক ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্কে রাজনীতি ও যুদ্ধ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করেন। আধ্যাত্মিক সাধনায়ও তিনি দীক্ষিত হন। তাঁর সমসাময়িক সূফীগণের সান্নিধ্যে এসে তিনি সূফী দর্শনের ইলমী জ্ঞান ও ইলমে তাসাওউফ সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অতি শৈশবেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘটনার দূর্বিপাকে পড়ে সুলতান বরখোরদার শাহ্ রাজ্য হারিয়ে পরিবার পরিজন সহ ভারত সম্রাট নাসির উদ্দীনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাহ্ তাঁকে সম্মান জনক রাজকার্য্যে নিয়োজিত করেন।এ সময় আব্দুল্লাহ্ দিল্লী নগরীর ঐশ্বর্য-বিলাসীতা ত্যাগ করে পিতা-মাতার অনুমিত নিয়ে মুলতানের কামিল দরবেশ শায়খ মাখদূম আরযানীর সান্নিধ্যে চলে যান এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সাধনায় সিদ্ধী লাভ করেন। অতঃপর পীর তাঁকে খিলাফাত প্রদান করেন। পীরের ইন্তিকালের পর তিনি পশ্চিম বাংলার সেনভূম পরগণায় এসে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে তুর্কী রাজত্বের গোড়াপত্তনকালে তিনি এ দেশে আগমন করেন। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারিত হয়। তিনি ৯৫৫ হিজরীর ৪ঠা সফর অনন্ত পথে যাত্রা করেন।[২]

সৈয়দ নাসির উদ্দীন শাহ্ আউলিয়া (রহ.)

সৈয়দ নাসির উদ্দীন শাহ্ আউলিয়া (রহ.) সৈয়দ নেকমর্দান নামে পরিচিত। ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তিনি সর্ব প্রাচীন। ঠাকুরগাঁয়ের রাণী সংকৈল থানার নেকমর্দ নামক স্থানে তাঁর মাযার ও আস্তানা বিদ্যমান। তাঁর সম্পর্কে দিনাজপুর গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে-"--------One of the best known of these saints appears to have been Naiyad Nekmardan, in memory of whom, a great fair or mela is still held at Nekmard in the Ranisankail thana. No proper monument of this saint is preserved Nekmord, the place where he buried it regarded as especially holy."[৩]

---

১. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. 197-98.

২. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

৩. Denaj pur District Gazetteers, 1912. p.21.

Dhaka University Institutional Repository

স্থানটির পূর্ব নাম ছিল ভবানন্দপুর। তারও পূর্বতী নাম ছিল করবর্তন ইত্যাদি। তবে পূণ্যাত্মা পীরের আগমন, অবস্থান এবং তদীয় শিষ্যদের বসতি স্থাপনের ফলে ভবানন্দপুরে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠে এবং বুযুর্গ পীরের নামানুসারে স্থানটিরও নাম হয় নেকমর্দ।[১]

সৈয়দ নেকমর্দান সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, এ অঞ্চলে তৎকালে নাথপন্থীদের প্রাধান্য ছিল এবং এখানে নাম পন্থীদের গুরু গোরক্ষনাথের একটি মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। ভীমরাজ ও পৃথীরাজ নামক দু'জমিদার ভ্রাতা ছিলেন এমতবাদের পৃষ্ঠপোষক। এদের সমসাময়িককালে কোন মুসলিম পর্যটক আগমন করলে এই ভ্রাতৃদ্বয় তাদেরকে প্রতি নির্মম অত্যাচার চালাতেন। তার কারণ, এ অঞ্চলে মুসলমান পরিব্রাজক ও দরবেশগণ হিন্দু জনসাধারণের উপর এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তারা কোনও পথ দিয়ে গমনাগমন করার সময় হিন্দুগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করত। ফলে দরবেশদের প্রতি জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় নির্মমভাবে অত্যাচার চালালে সে সংবাদ সৈয়দ নেকমর্দানের কর্ণগোচর হয়। এর ফলে তিনি সুদূর বিদেশ হতে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভীমরাজ ও পৃথীরাজ বাধা ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করলেও তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। শেষ পর্যন্ত এই দরবেশের প্রভাবে প্রতাপশালী জমিদার ভ্রাতৃদ্বয়ের শক্তি খর্ব হয় এবং পতন ঘটে।[২] কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, ভীমরাজ ও পৃথীরাজের শত্রুতায় একবার এই দরবেশকে গ্রেফতার করা হয় এবং কুলিক নদীর উপকূলবর্তী কোন এক গহবরের অভ্যন্তরে রেখে অনাহারে তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চলে। এ খবর প্রচারিত হলে আরব- পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বহু সাধু-সন্ত, পীর-দরবেশ বিপুল সংখ্যায় এ অঞ্চলে এসে অত্যাচারী রাজাদের প্রভাব খর্ব করে তাঁদের নিহত করেন। সেই সময় থেকেই দিনাজপুরের (বর্তমানে ঠাঁকুরগাঁও) এই অঞ্চলকে নেকমর্দ বলা হয় এবং সৈয়দ নাসির উদ্দীন শাহ আউলিয়াকে নেকমর্দের পীর বলা হয়।[৩] যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান ও পীর দরবেশের আগমনের ফলে এ অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়।

সৈয়দ নেকমর্দের মাযারটি বহুদিন অনাদর, অবহেলায় পড়েছিল। পরে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব এ মাযার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০০বিঘা জমি দান করেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলে সৈয়দ নেক মর্দানের যে বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে আসছে তাতে মনে হয় তিনি এ অঞ্চলে আগমন করেন ত্রয়োদশ শতকের শেষ বা চতুদর্শ শতকের প্রথমভাগে।

---

১. Ibid, p. 139.

২. মেহরাব আলী, দিনাজপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ ইং, পৃ. ১৮৮-৯০

৩. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা আতা ওয়াহিদুদ্দীন (রহ.)
(মৃ. ১৩৬৩ খৃঃ)

মোল্লা আতা ওয়াহিদুদ্দীন (রহ.) দিনাজপুরের দেবকোটস্থ 'দল দীঘি'র পাড়ে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত আছেন। এ কবর শিলালিপির মাধ্যমে তাঁর নাম জানা যায়। সম্ভবতঃ তিনি ১৩০০ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে ইসলাম প্রচারের জন্য দিনাজপুর আগমন করেন। মোল্লা আতা একটি গৃহের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা সম্পন্ন করার পূর্বেই ইহজগত ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর এই অসম্পুর্ণ কাজটি সম্পন্ন করেন সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৮-১৩৮৯) ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে।[১]

এই দরবেশের দরগাহ্ থেকে এ পর্যন্ত চারটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ শিলালিপিগুলোর তারিখ ১৩৬৩ হতে ১৫১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম শিলালিপিতে তাঁকে 'দরবেশদের আলোক রশ্মি কেন্দ্র', 'অদ্বিতীয় সন্ধানী, সত্য, আইন ও ধর্মের প্রদ্বীপ মাওলানা আতা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে 'মাখদূম মাওলানা আতাওয়াহিদুদ্দীন' এবং চতুর্থটিতে 'শায়খুল মাশায়েখ শায়খ আতা' রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এসব শিলালিপি থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাঁর নাম হচ্ছে মাওলানা আতা ওয়াহিদূদ্দীন এবং তিনি ছিলেন প্রাথমিক যুগের একজন দরবেশ। তিনি সুলতান সিকান্দার শাহ্র রাজত্বকালে ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দের ইন্তিকাল করেন। আজও তাঁর দরগাহ্ একটি তীর্থস্থান।

চিহিল গাযী
(বাঙলায় আগমন তের শতকের মাঝামাঝি)

দিনাজপুর জেলায় চিহিল গাযীর মাযার বিদ্যমান। মুলতঃ চিহিল গাযী কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। ফারসী শব্দ চিহিল এর অর্থ চল্লিশ । কারণ এক সময়ে চল্লিশজন ধর্ম প্রচারক গাযী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং চল্লিশজন দরবেশ অর্থে চিহিল ব্যবহৃত হয়। আরব, ইরান ও বাগদাদ প্রভৃতি দেশ থেকে যে সব ধর্ম প্রচারক সূফী দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন এবং ইসলামের আদর্শ ও মাহাত্ম এ দেশের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন, তাদের মধ্যে একদল দরবেশ দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এই স্থানটি পূর্ব থেকেই হিন্দু প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। দরবেশদের প্রচারকার্য বন্ধ করতে গিয়ে হিন্দু রাজাগণ মুসলমান পীর-দরবেশগণের সাথে বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়। হিন্দু রাজাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে চল্লিশজন ধর্ম প্রচারক বা গাযী পাশাপাশী মৃত্যুবরণ করেন এবং তাদের সকলকে এক সঙ্গে সমাহিত করা হয়। সময়ের দূর্বিপাকে পড়ে তাঁদের

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা-১৯৪৮ইং, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কবরগুলো মাটির সাথে মিশে গেছে। এর ফলে চল্লিশটি কবর ৫৪ ফুট দীর্ঘ । তাকে একটি মাত্র কবর বলে ভ্রম হয়।

এই চিহিল বা চল্লিশ গাযীর নাম জামা যায় না। তবে এঁদের দলপতি যিনি ছিলেন তাঁর নাম হযরত শায়খ জয়নূদ্দীন সোহেল বাগদাদী। অনেকের ধারণা মতে ইনিই সাধারণের চিহিল গাযী নামে পরিচিত।[১]

মাযারটি দিনাজপুর শহরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। তাঁর পীর ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) (১১৮৬-১২৩৭)। পীরের ইন্তিকালের পর তাঁর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য বিহার থেকে দিনাজপুরের এসে উপস্থিত হন। এখানে আস্তানা স্থাপন করে তিনি জনসাধারণের মাঝে ইসলাম প্রচার করেন।

উল্লেখ্য যে, সেকালে দিনাজপুরের গোপালগঞ্জে গোপাল নামে একহিন্দু রাজা বাস করতেন।তার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে জনসাধারণ দরবেশ চিহিল গাযীর নিকট ইসলাম ধর্ম বরণ করে। বিষয়টি রাজার গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি দরবেশকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য বলরামের নেতৃত্বে একদল বাহিনী প্রেরণ করেন। বলরাম দরবেশের কিছুই করতে পারল না, বরং দরবেশ বলরামকে নির্বিকার চিত্তে ইসলামের শাশ্বত বাণী শুনাতে লাগলেন। এতে বলরাম মুগ্ধ হয়ে দরবেশের হাতে ইসলাম কবুল করেন। অশ্বারোহী দলের নেতা ছিলেন বলে বলরামের নতুন নাম হল ঘোড়াপীর।[২] অতঃপর রাজা গোপাল সসৈন্যে দরবেশকে আক্রমণ করে বসেন। উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই হয়। জয়নুদ্দীন বাগদাদী চল্লিশ জন সহকর্মী সহ এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। যেহেতু জয়নুদ্দীন বাগদাদীর পীর বখতিয়ার কাকী ইন্তিকাল করেন ১২৩৭ খৃষ্টাব্দে, সেহেতু ধরা যায় তের শতকের মাঝামাঝি সময়ে চিহিল গাযী দিনাজপুরে আসেন এবং তের শতকের শেষে তাঁর ওফাত হয়।[৩]

শাহ নূর (রহ.)

হযরত শাহ্ নূর ত্রয়োদশ শতকের একজন দরবেশ বলে অনুমতি হয়। তিনি মাখদূম শাহদৌলা (সম্ভবত শাহযাদপুরের) সাহেবের অব্যবহিত পরেই এদেশে আগমন করেন। শাহযাদপুর থানার দেওয়ান তারটিয়া গ্রামে একটি দরগাহ্ রয়েছে। অনুমিত হয় এখানকার মাযারটি দরবেশ দেওয়ান সৈয়দ শাহ্ নূর সাহেবের। তাঁর বংশধরগণ হযরত হাসান বসরীর পৌত্র বা প্রপৌত্র বলে প্রকাশ। জনশ্রুতি এই যে, শাহযাদপুরের মাখদূম শাহ্ দৌলার সহায়তার ও মধ্যস্থতায় হযরত শাহ্ নূর (রহ.) নরনিয়া (নরন্যা) গ্রামের শাহ্ ইশার কোন এক কন্যার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাতে নরনিয়া অথবা তারটিয়া গ্রামের একটি মুসলিম পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর এখানে তাঁর মাযার রচিত হয়। এই মাযার অদ্যাবধি শাহ্ নূরের দরগাহ্ বলে পরিচিত।[৪]

---

১. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩
২. মেহরাব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৩. মেহরাব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৪. রাধারমন সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস, ১৩৩০বাং, পৃ. ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

শাহ কুতুব উদ্দীন (রহ.)

এই দরবেশের জীবনবৃত্তান্ত তেমন জানা যায় না। তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের দরবেশ হবেন। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার অধীনে গয়হাট্টা অঞ্চলে ১১ জন মুসলমান সাধক আগমন করেন। সেখান থেকে দরবেশগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। শাহ্ কুতুব উদ্দীন গয়হাট্টা অঞ্চলে থেকে যান এবং সার্বন্তকরণে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁকে এখানেই সমাহিত করা যায়।[১]

সৈয়দ আলী তাবরিজী (রহ.)

ঢাকা জেলার ধামরাই অঞ্চলে বিখ্যাত সূফী সাধক মীর সৈয়দ আলী তাবরিজীর মাযার বিদ্যমান। সম্ভবত তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে ঢাকার ধামরাই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। তিনি ইসলাম প্রচারকল্পে বহু অনুচরসহ আগমন করেন। তাঁর দরগাহ্ সর্বজন সম্মানিত। ধামরাই বঙ্গের মুসলিম রাজত্বের প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম। এই স্থান থেকে আবিস্কৃত শিলালিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম শিলালিপি খানি ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে ফতেহ্ শাহর রাজত্বকালে (১৪৮২-৮৭) উৎকীর্ণ হয়েছিল।[২]

শাহ্ তুর্কান শহীদ (রহ.)

হযরত শাহ্ তুর্কান শহীদের (রহ.) ইসলাম প্রচার কেন্দ্র ছিল বগুড়া জেলায়। বগুড়া জেলার শেরপুরে তাঁর 'শিরমোকাম' ও 'ধরমোকাম' নামে দুইটি মাযার রয়েছে। এই দরবেশ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে এদেশে আগমন করেন। তাঁর আগমনকালে তখনও উত্তর বঙ্গে প্রতাপশালী হিন্দু শাসকদের প্রভাব ছিল। এই সিদ্ধ পুরুষ মুষ্টিমেয় অনুচর ও শিষ্য নিয়ে বাংলার তদানীন্তন রাজা বল্লাল সেনের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ইসলামের মান মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিকল্পে তিন অকুতোভয়ে যুদ্ধ করে জীবন দান করন। করতোয়া নদীর তীরে শেরপুর নামক স্থানে তাঁর মাযার বিদ্যমান। এ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত হয়। যেখানে তাঁর শির মুবারক দাফন করা হয় সেখানে যে মাযারটি আছে-সেটাকে বলে শিরমুকাম। আর যেখানে তাঁর দেহ কবরস্থ করা হয় সেখানে যে মাযার আছে তাকে বলে ধরমুকাম। শাহ তুর্কানের মাযার সব সময় বহু লোক ভক্তি সহকারে যিয়ারত করে থাকে।এই দরবেশ সম্পর্কে ইউলিয়াম হান্টার বলেছেন-"Turkan Shahid was a Gazi Salin in battle by the Hando king Ballal Sen. One Shrine is called 'Sir Mokam' Where the head fell and the other 'Dhar Mokam' where his body fell, these Shrine or Darghas of Turkan Shahid are highly revered"[৩]

---

১. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

২. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৩. w.w. Hunter, A statistical Account of Bengal, vol-1, New Delhi, 1974. p. 60-71

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা তাকী উদ্দীন আল আরাবী (রহ.)

মাওলানা তাকী উদ্দীন আর আরাবীর (রহ.) জীবনী সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তাঁর নামের শেষে উপাধি দেখে মনে হয়, তিনি আরব দেশীয় ছিলেন। তবে তিনি যে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে এদেশে আগমন করেন এবং রাজশাহী জেলার মাহিসুনে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত সূফী শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরীর পিতা শায়খ ইয়াহ্ইয়া মানেরী মাওলানা তাকী উদ্দীন আল আরাবীয়ার শিষ্য ও ছাত্র ছিলেন। শায়খ মানেরী তাকী উদ্দীন আরাবী প্রতিষ্ঠিত মাহিসূনের মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। শায়খ মানেরী ৬৯০ হিজরী মুতাবিক ১২৯১ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[২] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মাওলানা তাকী উদ্দীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলাদেশে আসেন এবং রাজশাহীর মাহিসুনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাই সম্ভবত এদেশেত প্রথম মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে আরবী ও ইসলামী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া হত। ইসলাম প্রচার ও ইসলাম শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি আরবদেশ থেকে বাংলাদেশে আসেন। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শী একজন প্রথিতযশা উচ্চ স্তরের আলিম ছিলেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাহিসুনের মাদ্রাসায় ইলম্ হাসিলের জন্য সমবেত হত।[৩] তিনি এদেশেই সারাজীবন কাটিয়েছেন না কী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। এমনকি তিনি কতকাল জীবিত ছিলেন এবং কোথায় ইন্তিকাল করেন তাও জানা যায় না, জানার কোন উপায়ও নেই।

হযরত শাহ্ বন্দেগী গাযী (রহ.)

খুব সম্ভবত এই দরবেশ দ্বাদশ শতকের শেষে এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। বগুড়া জেলার শেরপুরের মসজিদের সন্নিকটে শাহ বন্দেগীর মাযার বিদ্যমান। এ মসজিদটিকে 'টোলার মসজিদ' বলা হয়। মনে হয় মসজিদটি ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন জালাল শাহ্র রাজত্বকাল নির্মাণ করা হয়। হযরত বাবা আদম যে কয়জন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে বল্লাল সেনের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত শাহ বন্দেগী। যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি গাযী হয়েছিলেন। তিনি নিরলসভাবে অমুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের বাণী প্রচার করেন। তার কবরগাহ্ সমতল ভুমি থেকে প্রায় একগজ উচু এবং ইট দিয়ে বাঁধানো।[৪]

---

১. History of Bengal -vol- 2, Dhaka, p. 37.
২. সৈয়দ মোর্তজা হোসাইন আবুল উলায়ী, সহীফায়ে সিদ্দিকীয়া, ঢাকা-১৯৮২ইং, পৃ. ৮৫
৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৪. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান শাহাদাত হোসাইন (রহ.)

জয়পুরর হাটের নেঙ্গাপীর গ্রামে হযরত দেওয়ান শাহাদাত হোসাইনের (রহ.) মাযার বিদ্যমান। এ অঞ্চলে তাঁর আগমনের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে অনেকের ধারণামতে, তিনি ১২০১ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমরকন্দ থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি এদেশের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করেন। তাঁর হাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাঁর প্রচেষ্টাতেই এ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। শোনা যায় তাঁর বংশে অনেক কামিল পীর জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানকালের কামিল পুরুষ হলেন দেওয়ান সমির উদ্দীন। তাঁকে লোকে পাগলা দেওয়ান বলত। দেওয়ান শাহাদাত হোসাইনের মাযারের অনতিদূরে একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা রয়েছে।

শাহ্ মুহসিন আউলিয়া (রহ.)

শাহ্ মুহসিন আউলিয়া বাংলাদেশ ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগের চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন করেন। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার পিয়ারী গ্রামে এ দরবেশের মাযার ছিল। নদী ভাঙ্গনের মুখে পড়ায় সেখান থেকে তাঁর মাযার বটতলী গ্রামে স্থানান্তর করা হয়। মাযারে সুলতানী আমলের তুঘরা হরফে লেখা আরবী শিলালিপি রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তিনি হিজরী ৮০০ সনে অর্থাৎ ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। চট্টগ্রামে এখনও তাঁর উত্তর পুরুষ বিদ্যমান রয়েছে।

জনশ্রুতি মতে, শাহ মুহসিন আউলিয়া প্রথমে পিয়ারীতে আসেন এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা মানুষের উপকার করতে থাকেন। এখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ বাস করত। তারা এ দরবেশের মানবিক কর্মকান্ডে আকৃষ্ট হয়। তাঁর জীবিত উত্তর পুরুষদের মতে, পীর বদর, কতলপীর এবং শাহ্ মুহসিন আউলিয়া সর্ব প্রথম পানিপথ থেকে গৌড়ে আগমন করেন। সেখানে তাদের স্থায়িত্বকাল বেশিদিন ছিল না। সেখান থেকে তারা নদী পথে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দিকে চলে যান।

শাহ্ মুহসিন আউলিয়ার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তবে নির্মি বা নির্মল বিবি নামক তার এক কন্যার কথা জানা যায়। তাঁর এক ভ্রাতুস্পুত্র শাহ্ সিকান্দারের সাথে তিনি কন্যার বিয়ে দেন। পানি পথে তাঁদের বিয়ে হয়। অতঃপর দরবেশ বাংলাদেশে আসেন্। এদিকে কন্যা ও জামাতা তাঁর সন্ধান না পেয়ে বাংলাদেশে আসেন। শত অনুরোধ করেও তারা দরবেশকে দেশে ফিরিয়ে নিতে পারেননি। এতে তাঁরা দু'জনেই ঝিয়ারীতে বসবাস করতে থাকেন। কন্যা ও জামাতা ঝিয়ারীতে আসার অল্প কিছুদিন পরেই মুহসিন আউলিয়া ইন্তিকাল করেন। পরে কন্যা ও জামাতা আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেননি। পরে তাঁদের পুত্র শাহ্ কুতুবুদ্দীন জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

---

১. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. ২৫৮.

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ বদর (রহ.)

শাহ্ বদর চট্টগ্রাম অঞ্চলে একজন বিখ্যাত অলি আল্লাহ্ ও দরবেশ। তাঁর আসল নাম আজও অপরিজ্ঞা। ইনি সাধারণত বদর আলম, বদর শাহ্, বদর পীর, বদর আউলিয়া এবং পীর বদর ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। বদর শাহ্কে চট্টগ্রামের অভিভাবক দরবেশরূপে গণ্য করা হয়। চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্র স্থলে তারই নামানুসারে বদর পট্টি নামক স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত। বাঙালী কবিগণ বদর শাহ্ বা বদর আলম নামক দরবেশের উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে দৌলত ওয়াজীর বাহরাম খান চট্টগ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এ শহরে শাহ বদর আলম সমাহিত রয়েছেন।[১]

মধ্য সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খান তাঁর পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়ে মুসলমানদের চট্টগ্রাম জয়ের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর পূর্ব পুরুষ জনৈক মাহিসওয়ার হাজী খলিল পীরের সঙ্গে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। চট্টগ্রাম এসে পৌছালে কদল খান গাযী ও বদর আলম তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। শত্রুদের পরাজিত করে এ দু'জন দরবেশ চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন।[২]

কবি আরও বলেছেন যে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কদল খান গাযী ও বদর শাহ বারজন দরবেশের সাহায্য পেয়েছিলেন যাদের মধ্যে শায়খ শরফুদ্দীনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি মায়ের দিকে থেকে কবির পূর্ব পুরুষ।[৩] সুলতান ফখর উদ্দীন মোবারক শাহ্ আমলে মুসলমানগণ প্রথম চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪] তাই মনে হয় ফখর উদ্দীন মোবারক শাহ্, কদল খান গাযী ও বদর শাহ সমসাময়িক ছিলেন এবং সুলতানও দরবেশেগণের যৌথ প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম বিজিত হয়েছিল।

জনশ্রুতি মতে শাহ্ বদরই (রহ.) চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন। সেকালে চট্টগ্রামে জ্বিন-পরীদের আড্ডা ছিল। শাহ্ বদর জ্বিন-পরীদের তাড়াবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন করেন। কিন্তু জ্বিন-পরীদের প্রভাবে ইসলাম প্রচারে বিশেষ সুবিধা হত না। এ দরবেশ তখন জ্বিন-পরীদের নিকট থেকে মাত্র একখানা চাটি চালানোর জন্য স্থানের অনুমতি নিলেন। কিন্তু চাটি জ্বালানোর পর এর আলো ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে সারা চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে জ্বিনেরাও চট্টগ্রাম থেকে চিরতরে পালিয়ে গেল। এভাবে সারা চট্টগ্রামের লোক বদর শাহ্র প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। অনেকে মনে করেন বদর শাহ্ চাটি থেকে চাটি গ্রাম বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।[৫]

চট্টগ্রামে বদর শাহ্র চাটি পাহাড় এখন ও দেখা যায়। তাঁর সমাধি ভবন এখনও বিদ্যমান। সমাধি ভবনটি একগম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির পাকা দালান; গঠন আকৃতিতে মনে হয়, সমাধি ভবনটি সুলতানী আমলে নির্মিত। বদর শাহ্ নামটি পূর্ববঙ্গে বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে

১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, লাইলী-মজনু, ঢাকা-১৯৫৭ইং, পৃ.৯

২. ডক্টর আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম, ১৯৮০ইং, পৃ. ২২-৩৯

৩. ডক্টর আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৪. East Bengal District Gazetteers, Chittagong, 1908, p. 20-21.

৫. Journal of the Asiactic Society of Pakistan, vol-vii, No. 1-1961, p. 39.

Dhaka University Institutional Repository

মাঝি-মাল্লাগণ নদী পথ পারাপারের সময় এই পীরের উদ্দেশ্যে প্রণীপাত জানায়। জলপথে বিপদের সময় মাঝি-মাল্লাগণ নিরাপত্তার জন্য পীর বদর ও পাঁচ পীরের কথা স্মরণ করে সমস্বরে গেয়ে উঠেঃ

আমরা আছি পোলা-পান।
গাযী আছে নিগাবান
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচপীর বদর, বদর।[১]

যাহোক চট্টগ্রামের জনসাধারণ যে বদর পীরের এত প্রশংসা, সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকে, তিনি জনশ্রুতি নির্ভর হতে পারেন না। তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। কেননা, ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যায় যে, সুলতান ফখরউদ্দীন মোবারক শাহের আমলে চট্টগ্রাম প্রথম বিজিত হয়। বদল খান গাযী ফখরউদ্দীন মোবারক শাহের কোন সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি শাহ বদরের দরবেশ বাহিনীর সহায়তায় ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন।[২] কাজেই শাহ্ বদর ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামে সমাধিস্থ তাঁর অন্যতম সঙ্গী মুহসিন আউলিয়ার কবরগাত্রের শিলালিপি থেকে দেখা যায় যে, ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং এর ৫৭ বছর পূর্বে তাঁর অন্যতম সঙ্গী শাহ বদরের ইন্তিকাল হওয়ায় মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।[৩]

যাহোক, প্রতি বছর ২৯ শে রমজান তারিখে চট্টগ্রামে এই পীরের পূণ্য স্মৃতি উপলক্ষে উরস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উরসে উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে শিরণী বিতরণ করা হয়। এ মাযার সর্বসাধারণের পূজ্য।তাঁর ইন্তিকালের পর মগেরা পর্যন্ত এ মাযারে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করত।[৪]

কাতালপীর (রহ.)

চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকে এ দরবেশের মাযার অবস্থিত। তাঁর আসল নাম জানা যায় না। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তিনি কাতালপীর নামে পরিচিত। এ নামের কারণে এ স্থানের নামকরণ হয়েছে কাতালগঞ্জ। জনশ্রুতি মতে, তিনি শাহ্ বদরের সঙ্গী ছিলেন। সম্ভবত মগদের সাথে যুদ্ধ করে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। হয়ত তিনি একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং যুদ্ধে বহু শত্রুর শিরচ্ছেদ করেছেন। এজন্য তিনি কতল বা শিরচ্ছেদ আখ্যা প্রাপ্ত হন।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর গ্রন্থ 'আখবারুল আখিয়ার' গ্রন্থে এ কত্তাল শাহের জীবনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর নাম সৈয়দ বদরুদ্দীন রাজু কত্তাল বোখারী । তিনি বিখ্যাত সূফী সৈয়দ জালালুদ্দীন বোখারীর ভাই ছিলেন এবং ৮২৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি পাঞ্জাবের উচ নামক স্থানে সমাহিত আছেন।[৫] কিন্তু তিনি চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

১.এ ধরণের গাঁথার জন্য দ্রষ্টব্য, Dr. Md. Enamul Haq. A History of sufism in Bengal, pp. 243-252.
২. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. 247 -48
৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, ১০৭ - ১০৮
৪. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. 250
৫. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

মুকসিদ গাযী শাহ্ কামাল (রহ.)

হযরত শাহ কামাল সম্ভবত মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে নয়তবা সমসাময়িককালে এদেশে আগমন করেন। তিনি মহাস্থান বিজয়ী সুলতান বলখী মাহী সাওয়ারের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। মহাস্থান থেকে ১৬/১৭ মাইল পশ্চিমে হারুঞ্জা গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। সুলতান মাহীসাওয়ার মহাস্থান যাওয়ার পথে হারুঞ্জা গ্রামে বেশ কিছুকাল অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন। পথের তাঁর অন্যতম শিষ্য গাযী শাহকামাল এখানে থেকে ইসলাম প্রচার করেন এবং এখানেই ইন্তিকাল করেন।

যতদূর জানা যায়, গাযী শাহ কামাল পারস্যে মতান্তরে ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। সুলতান বলখীর সাথে তিনি বাংলাদেশে আসেন। সুলতান বলখী মহাস্থান অধিপতি পরশুরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর শাহ কামাল গাযী উপাধি ধারণ করেন। গাযী হিসেবে তাঁর শিয়রে একটি প্রকান্ড পাথরের ষষ্টি প্রোথিত আছে।[১] এই মহান দরবেশের দু'জন অনুচর শাহ্ জালাল বোখারী এবং শাহ্ সুলতান মুতির মাযার রয়েছে ক্ষেতলাল থানার যথাক্রমে শালগুন ও মাত্রাই গ্রামে।

গাযী কামালের আস্তানাটি ছিল জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের মিলন কেন্দ্র। প্রতিদিন তাঁর বাণী শোনার জন্য হিন্দু, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বহু নর-নারী তাঁর নিকট আগমন করত।[২]

শরীফ শাহ্ (রহ.)

হযরত শরীফ শাহের প্রচেষ্টাতে দক্ষিণ বাংলার সুন্দর বন এলাকায় বিশেষ করে খুলনা, যশোর ও চবিবশ পরগণায় ইসলাম প্রচারিত হয়। তিনি ঠিক কোন দেশ থেকে কোন সময় এদেশে আগমন করে তা জানা যায় না। তব তিনি যে, সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কীর সমসাময়িককালে বা তার অনতিকাল পরে এখানে আসেন এটা নিশ্চিত। কোলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ক্যানিং শহরের সন্নিকটে ঘুটিয়ার শরীফে শরীফ শাহের মাযার বিদ্যমান। সুন্দরবন এলাকায় তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। প্রতি বছর এখানে যে উরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয় তাতে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন এলাকার লোক দূর-দূরান্তর থেকে আগমন করে। এ থেকে অন্তত পক্ষে ব্যাপক ইসলাম প্রচারের স্বীকৃতি মেলে।[৩]

সৈয়দ আহমদ কল্লা শহীদ (রহ.)

সৈয়দ আহমদ ছিলেন সিলেটের হযরত শাহ জালালের (রহ.) অন্যতম শিষ্য। শাহ্ জালালের (রহ.) সিলেট জয়ের পর তাঁর শিষ্যগণকে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে তরফপুর পরগণায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় সৈয়দ নাসিরুদ্দীনের নেতৃত্বে এগারজন শিষ্যের উপর। এ দলে ছিলেন সৈয়দ আহমদ। তিনি সম্ভবত তরফের হিন্দু সামন্ত রাজা আচক নারায়ণের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধে মুসলিম পক্ষ জয়ী হলেও সৈয়দ আহমদ শহীদ হন।[৪] সম্ভবত তাঁর কোন ভক্ত তাঁর কর্তিত মস্তকের সন্ধান পান এবং

১. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
২. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৪. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এ স্থান থেকে ১৫/১৬ মাইল দূরবর্তী খড়মপুরে এনে তা সমাধিস্থ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর মস্তকটি কেবল সমাধিস্থ করা হয় বলেই তাকে কল্লা শহীদ বলা হয়। অবশ্যই তবে দেহ হযরত শাহ জালালের (রহ.) মাযারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'লুতের মাযার' নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হয় বলে জানা যায়।[১] নোয়াখালী জেলার শাসদিয়া রেলষ্টেশনের নিকটে এ দরবেশের একটি আস্তানা রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, নোয়াখালী ও কুমিল্লা উভয় জেলায়ই ছিল এ দরবেশের কর্মস্থল।

শায়খ ফরিদ (রহ.)

শায়খ ফরিদের নাম বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়। চট্টগ্রামের ষোলশহর রেললাইনের এক পাহাড়ের পাদদেশে শায়খ ফরিদের নামানুসারে 'চাশম শায়খ ফরিদ' নামে একটি ঝর্ণাও আছে।[২] কথিত আছে যে, শায়খ ফরিদ এই স্থানে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন এবং তাঁর অশ্রুধারায় এই নির্ঝরিণির উৎপত্তি ঘটে।

ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক ঝর্ণা সংশ্লিষ্ট শায়খ ফরিদকে, উত্তর ভারতীয় চিশতী সাধক শায়খ ফরিদ উদ্দীন শকরগঞ্জ (মৃ.১২৬৯ খৃ.) বলে মনে করেন। তাঁর মতে, দিল্লীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬-১৩২৫) গুরু শায়খ ফরিদ পাঞ্জাবের পাক-পত্তনে সমাহিত ভারত বিখ্যাত দরবেশ শায়খ ফরিদ উদ্দীন শাকরগঞ্জ ব্যতিত আর কেউ নন।[৩]

মোল্লা মিসকীন ও অন্যান্য

মোল্লা মিসকীন হযরত শাহ্ বদরের সমসাময়িক ছিলেন। কারো মতে, তিনি শাহ্ বদরের (রহ.) কিছু দিন পরে চট্টগ্রামে আসেন। চট্টগ্রামের চন্দনপুরা মহল্লার একটি টিলার উপর তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন দরবেশ আসেন। তাঁরা হলেন শাহ নূর, শাহ্ আশরাফ, কাবুলী শাহ্, বান্দরিয়া শাহ্ ও শাহ মুবারক আলী। শাহ্ বদরের আগমনের কয়েক বছর পরে মোল্লা মিসকীনের নেতৃত্বে এ দরবেশগণ চট্টগ্রামে আসেন বলে জানা যায়। মোল্লা মিসকীনের পাশে তাঁদের কবর বিদ্যমান। তাঁদের মাযারের সন্নিকটে প্রাক মোগল আমলের একটি মসজিদ দেখা যায়। সম্ভবত বাংলার মুসলিম সুলতানদের মধ্য থেকে কেউ তা নির্মাণ করে থাকবেন।[৪]

চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকায় শাহ্ উমরের মাযার রয়েছে। এ অঞ্চলের তিনি ইসলাম প্রচার করেন। তিনি বার আউলিয়াল দলভূক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। উমর শাহ্ নামে একজন দরবেশ ছিলেন নোয়াখালীর উমরাবাদে। তিনি অমুসলিমদের মাঝে ইসলাম প্রচার করে অনেকেই ইসলামে দীক্ষিত করেন। সম্ভবত চট্টগ্রামে শাহ উমর ও নোয়াখালীর উমর শাহ্ একই ব্যক্তি। শাহ উমরের নামানুসারের নোয়াখালী সে গ্রামের নাম হয় উমরাবাদ।[৫]

---

১. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩
২.ডঃ মুহাম্মদ এনামূলক হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
৩. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. 259.
৪. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৫. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. 257.

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজ সৈয়দ আহমদ তান্নুরী (রহ.)

হাফিজ সৈয়দ আহমদ তান্নুরী (রহ.) নোয়াখালী অঞ্চলের প্রাথমিক যুগের ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম। তিনি সৈয়দ মীরান শাহ্ নামে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর (রহ.) বংশধর। তাঁর পিতার নাম হযরত আজাল্লা (রহ.)। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের (১২৫৮ খৃঃ)পর হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর (রহ.) বংশধর ও আত্মীয়-স্বজন দেশত্যাগ করে পারস্য, আফগান ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যান। হযরত সৈয়দ আজাল্লা (রহ.) এক পর্যায়ে দিল্লীতে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানেই সৈয়দ আহমদের জন্ম হয়।

তিনি পিতার নিকট হতে যাহিরী ও বাতিনী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং অন্যান্য পীরের নিকট হতে কান্দুরিয়া ও চিশতিয়া তরীকার খিলাফত প্রাপ্ত হন। হালাকু খানের মৃত্যুর পর হযরত আজাল্লা (রহ.) বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু তৎপুত্র সৈয়দ মীরান শাহ্ দিল্লীতেই থেকে যান। সৈয়দ মীরান শাহ্ অধিকাংশ সময় আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতেন। হযরত আজাল্লার ভক্ত সুলতান রুকনুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ সৈয়দ মীরান শাহ্কে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী দেখে দিল্লীতে তাঁকে বসবাস করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হয়ে বাংলা দেশে আগমন করেন। তিনি সিলেটের হযরত শাহ জালালের (রহ.) সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম বারজন শিষ্যসহ পান্ডুয়াতে আসেন। সুলতান রুকনুদ্দীন ফিরোজশাহ্ তাকে তাম্র শাসনে লিখে দেন যে, মীরান শাহ্ তার ইচ্ছামত বাংলার যে কোন স্থানে বাস করতে পারবেন। তাছাড়া তিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য লাখেরাজ ভূমি দান করেন। কথিত আছে যে, তিনি পান্ডুয়া থেকে পৌত্তলিক ধর্ম ধ্বংস করতে করতে নোয়াখালী জেলার সোনারবাগে এসে পৌছান।[১] এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় তিনি ও তাঁর দলবল ইসলাম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

মাজযুবা বিবি ও অন্যান্য

হযরত সৈয়দ মীরানশাহের (রহ.) ভগ্নী প্রসিদ্ধা তাপসী মাজযুবা বিবির মাযার ভ্রাতার মাযারের সন্নিকটেই বিদ্যমান। একটি বিশাল বটগাছের নিচে এই তাপসী মহিলা অনন্ত নিদ্রায় শায়িতা রয়েছেন। জনশ্রুতি মতে, তার সমাধির নিকট গিয়ে কোন ব্যক্তি আপন ইচ্ছা পূরণের জন্য কামনা করলে তার ইচ্ছা পুর্ণ হয়। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন কোন লোক যিয়ারত করতে গেলে তিনি প্রথমে মাজযুবা বিবির এবং পরে সৈয়দ মীরান শাহের (রহ.) মাযার যিয়ারত করে থাকেন।[২]

হরিচ্চর নামক স্থানে মিয়া সাহেব বাগদাদীর মাযার রয়েছে। বাংলাদেশে একসঙ্গে আগত বার আউলিার মধ্যে তিনি অন্যতম। হরিচ্চর গ্রামের মিয়াবাড়ীতে হযরত আহসান বা হাসান শাহ্ নামক এক দরবেশের মাযার অবস্থিত। এই দরবেশ প্রথমে কাউনিয়ার হোসেন ভুইয়ার দীঘির পারে আস্তানা স্থাপন করে বাস করতে থাকেন। কিন্তু লোকজনের উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে তিনি হরিচ্চর গমন করেন। সম্ভবত তিনি সুলতান রুকনুদ্দীন ফিরোজ শাহের সমসাময়িককালের লোক।[৩]

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামূলক হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১
২. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৩. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়িদুল আরিফীন (রহ.)

পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার কালিশুড়ি গ্রামে হযরত সাইয়িদুল আরিফীনের (রহ.) মাযার বিদ্যমান। তৈমুর লঙ্গের শাসনামলে (১৩৬১-১৪০৫খৃঃ) তাঁর নির্দেশে এ দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। বাংলার বহু স্থানে ইসলাম প্রচার করে অবশেষে তিনি বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় আসেন এবং বাউফল থানার কালিশুড়ি গ্রামে আস্তানা স্থাপন করেন। পটুয়াখালী ও বরিশালের এ এলাকার বহু অমুসলিমকে তিনি ইসলামের দীক্ষিত করেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়। তাঁর দরগাহটি আজও তথায় পাকা অবস্থায় আছে।[১]

রাস্‌তি শাহ্ (রহ.)

হযরত রাস্‌তি শাহ্ (রহ.) কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি হযরত মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.) বংশধর বলে পরিচিত। যতদূর জানা যায়, তিনি দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তোঘলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩০৮) তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। হযরত সৈয়দ আহমদ তান্নুরী (রহ.) যখন নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে আগমন করেন তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কুমিল্লা অঞ্চলে আগমন করেন বলে জানা যায়। সুলতান ফিরোজ শাহের নিকট থেকে এ দরবেশ শাহতলী মৌজা নিষ্কর পেয়েছিলেন। নিষ্কর ভূমি পেয়ে তিনি তথায় আস্তানা গাড়েন এবং জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করেন। দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালীর অঞ্চলের বহুলোককে তিনি ইসলামের দীক্ষিত করেন। তাঁর নামানুসারে সে এলাকার নাম হয়েছে শাহ্ রাস্‌তি।[২] মেহার কালীবাড়ী ষ্টেশনের পূর্ব দিকে শ্রীপুর গ্রামে তাঁর মাযার বিদ্যমান

হযরত শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী (রহ.)

হযরত শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী (রহ.) হযরত সৈয়দ আহমদ তান্নুরী (রহ.)-এর সঙ্গে এ অঞ্চলে আগমন করেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন এবং নানা শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনায়ও সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁ পীরের নির্দেশে তিনি শাহতলী এলাকায় আগমন করেন এবং এবং ইসলাম প্রচার করেন। তিনি দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের নিকট থেকে শাহতলী মৌজা লাখেরাজ সম্পত্তি হিসেব পান এবং সেখানে তিনি ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। হযরত শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী ও হযরত রাস্‌তি শাহ্ উভয়েই চৌদ্দশতকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে আসেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় বর্তমানে চাঁদপুর জেলার এ অঞ্চলে ইসলাম প্রসারিত হয়।[৩] সাবেক কুমিল্লা জেলার শাহতলী রেলষ্টেশনের কাছে শাহতলী খন্দকার বাড়ীতে এ দরবেশের মাযার রয়েছে। অনেকের ধারণা মতে, তিনি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর বংশধর। কিন্তু এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

১. রশীদ আহমদ; বাংলাদেশের সূফী সাধক, মর্ডান, লাইব্রেরী; ঢাকা-১৯৭৪ইং, পৃ. ৮১

২. দেওয়ান নূরুল, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পা.) আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, ই.ফা.বা. ১৯৯৫ইং, পৃ. ১৪১

৩. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ্ লঙ্গর (রহ.)

হযরত শাহ্ লঙ্গর (রহ.) চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যায়ে বা তারও আগে বাংলাদেশে আগমন করেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করে তিনি তখনকার পূর্ব বাংলার রাজধানী সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বাণিজ্যে পৃথিবী বিখ্যাত বন্দর নগরী সোনারগাঁয়ে আসেন। সে সময় সোনার গাঁয়ের উত্তর দিকে মুয়াযযমপুর গ্রামে এসে এ দরবেশ নিজের আস্তানা স্থাপন করেন। এই মুয়াযযমপুর গ্রামেই তাঁর মাযার বিদ্যমান । তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন, কীভাবে ও কোথা হতে এ দেশে আসেন এবং কোথায় শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন এ সম্বন্ধে প্রমাণ তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি মতে তিনি বাগদাদের রাজপুত্র ছিলেন এবং সংসার ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে তিনি ঢাকা আগমন করেন এবং মুয়াযযমপুরে বসতি স্থাপন করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।[১] তাঁর মাযারের পাশেই একটি মসজিদ রয়েছে। সমজিদ গাত্রের শিলালিপির উৎকীর্ণ পাঠ থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ শাহের আমলে (১৩৩১-১৩৪২) নির্মিত হয়েছে। এতে মনে হয় তিনি চতুর্দশ শতাব্দীরই কোন সময় এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজ পরিচালনা করেন।

শায়খ বখতিয়ার মাইসূর (রহ.)

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে যে বার জন আউলিয়া ও দরবেশ বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন তাঁদের মধ্যে শায়খ বখতিয়ার মাইসূর সন্দ্বীপে বাস করেন। সন্দ্বীপে ইসলাম প্রচারের সমস্ত কৃতিত্ব এই দরবেশের প্রাপ্য। তিনি চৌদ্দ শতকের দিকে সৈয়দ মীরান শাহের সাথে দিল্লী থেকে বাংলাদেশে আসেন। সন্দ্বীপের 'রোহিনী' নামক স্থানে শায়খ বখতিয়ার মাইসূরের (রহ.) দরগাহ বিদ্যমান।[২]

শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দীন (রহ.)
(মৃ.১৩৫৭)

বাংলাদেশের প্রথম যুগের চিশতিয়া সূফীদের মধ্যে শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দীন উসমান (রহ.) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তিনি এদেশের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন। শায়খ আঁখি সিরাজ ছিলেন পরম আধ্যাত্মিক পূর্ণতা সম্পন্ন একজন সূফী; তিনি বঙ্গদেশে চিশতি সূফী পুরুষদের একটি সম্প্রদায় রেখে যান আর রেখে যান তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীদের নিকট মানব সেবামূলক কার্যাবলীর আদর্শ।[৩]

শায়খ আঁখি সিরাজ দিল্লীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। পীরের নির্দেশ পেয়ে তিনি ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষণাবতী গমন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেন যে, তিনি বদায়ুনের অধিবাসী ছিলেন।[৪] শায়খ হুসামুদ্দীন মানিকপুরীর রচনাবলী

১. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
৪. ডঃ মুহাম্মদ এনামূলক হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

'রফিক-উল-আরিফীন' এর সংগ্রাহকের মতে, শায়খ আঁখি সিরাজ অযোধ্যার অধিবাসী ছিলেন।[১] অধিকতর প্রামাণ্য সূত্রে দেখা যায় যে, শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দীন বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। 'সিয়ার-উল-আরিফীন' তাঁকে পাণ্ডুয়া নিবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] 'আখবার আল-আখিয়ার' থেকেও জানা যায় যে, শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দীনত অল্প বয়সে শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার একজন সেবকরূপে শিষ্য ভূক্ত হন। কয়েক বছর পর তিনি তাঁর মাকে দেখার জন্য লাক্ষণাবতীতে তাঁর বাড়ীতে গমন করেন।[৩] ফলে স্বাভাবিকভাবেই জাগে-তার বাড়ী লক্ষণাবতী না হলে কেন তাঁর মা সেখানে বসবাস করবেন? তাই এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, তাঁর পিতা-মাতা স্থায়ীভাবে বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মোটের উপর, আঁখি সিরাজ বঙ্গদেশে বিখ্যাত আউলিয়ার একজন খলিফা নিযুক্ত হন এবং বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়াতেও আগমন করেন। সুতরাং শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়ার একজন আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর কর্মস্থল ও স্বদেশ ভূমি ছিল বাংলা।

যাহোক শায়খ আঁখি সিরাজ নিজেকে ইমাম হাসানের বংশধর বলে দাবী করেতন। তাঁর পূর্ব পুরুষ এই উপমহাদেশে আগমন করেন এবং তাঁর পিতা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন। শায়খ আঁখি অল্প বয়সে দিল্লী গমন করেন এবং শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অকৃত্রিম ভক্তি এবং ধার্মিকতার দ্বারা তিনি সহজেই হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার খলিফা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন। কিন্তু পড়া-লেখায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। তাই নিযামুদ্দীন আউলিয়া তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "তিনি লেখা-পড়ার পারদর্শী নন, অথচ সূফীদের খিলাফাত লাভের জন্য বিদ্যাই প্রথম ধাপ।"[৪] তিনি বলতেন, "শিক্ষাহীন সূফী শয়তানের ভার স্বরূপ।"[৫] হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (রহ.) অন্যতম শিষ্য ফখরুদ্দীন জাররাদী আঁখি সিরাজের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ফখরুদ্দীন জাররাদী তাঁর নাম রাখেন 'উসমান' এবং মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে সর্ববিষয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দান করেন। তিনি মাওলানা রুকনুদ্দীনের অধীনেও শিক্ষা লাভ করেন এবং কাফিয়া মুফুস্সল, কুদুরী ও মাজমাউল বাহ্‌রাইন ইত্যাদি গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার ইন্তিকালের (১৩২৫খৃঃ) পরও তিনি কয়েক বছরকাল বিদ্যা-শিক্ষার কাজ অব্যাহত রাখেন এবং সমস্ত রকম জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন।[৬] 'সিয়ার আল আরিফীনে'র লেখক বলেন- "বিজ্ঞতা ও জ্ঞানে কেউই তাঁর (আঁখি সিরাজের) সমকক্ষ ছিলেন না। কিংবা কেউ তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে সাহস পর্যন্ত পেতেন না।"[৭]

তিনি হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (রহ.) (১২০৬-১২২৫ খৃঃ) একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁর পীর তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও পুর্ণ জ্ঞানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্নেহসিক্ত চিত্তে তাঁকে 'আয়না-এ-হিন্দুস্তান'(হিন্দুস্তানের আয়না) উপাধিতে ভূষিত করেন।[৮] তিনি পরে এ সব জ্ঞান গরিমার অধিকারী হলে পীর তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন এবং তাঁকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের আদেশ দেন।

১. আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪ইং পৃ. ১৯৮
২. আমীর খুরদ, সিয়ার -উল- আওয়ালিয়া (উর্দু),পৃ. - ২৮৭
৩. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৪. আমীর খুরদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
৫. গোলাম সরওয়ার, খাজিনাতুল আসফিয়া (১ম খন্ড), নেওয়াল কিশোর, লক্ষৌ, পৃ. ৩৫৮
৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৭. উদ্ধৃতঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৮. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের খলিফা নিযুক্তির পর আঁখি সিরাজ তাঁর পীরের নিকট বলেন যে, বাংলাদেশের শায়খ আলাউল হক অত্যন্ত জ্ঞানী এবং এ জন্যে তিনি শায়খ আলাউল হকের সম্মুখীন হতে দ্বিধাবোধ করছেন। শায়খ নিযামুদ্দীন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, শায়খ আলাউল হক তাঁর অনুগত শিষ্য হবে।[১] কার্যত ঠিক তাই হয়েছিল।

১৩২৫ খৃষ্টাব্দে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) ইন্তিকাল করেন। পীরের ইন্তিকালের চার বছর পর তিনি সাদুল্লাহপুর (লাখনৌতির অপর নাম) মহল্লায় আসেন এবং গৌড় ও পান্ডুয়ায় আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি তাঁর পূত চরিত্র, গভীর জ্ঞান ও মানবতা বোধ দ্বারা লাখনৌতির রাজ পরিবার, আমীর-উমারাহ্ এবং সকল শ্রেণীর লোকদেরকে আকৃষ্ট করেছিলেন। ফলে শায়খ আলাউল হক, সুলতান ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯-১৩৫৮) প্রমুখ তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। শায়খ আঁখি সিরাজের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের পূর্ণতা এতবেশী ছিল যে, হযরত শায়খ আলাউল হক (রহ.) তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য হয়ে অহর্নিশি তাঁর অনুগমন করেছেন এবং তাঁর ও শায়খের ভ্রমনকালে তাঁকে গরম খাবার পরিবেশন করার জন্য খাবারের পাত্রসহ একটি জ্বলন্ত উনুন সঙ্গে সঙ্গে রেখেছেন।[২]

আঁখি সিরাজ লাখনৌতিতে একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেটা ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানবিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। দিল্লীতে তাঁর পীর হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার গ্রন্থগার থেকে তিনি যে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ সঙ্গে করে এনেছিলেন তা দিয়ে তিনি লাখনৌতিতে একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন।[৩] তাঁর খানকাহ্তে অসহায়, দীন-দুঃখী, বৃদ্ধ ও দুঃস্থ মানুষ আশ্রয় লাভ করত এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও অনাথ আশ্রম হিসেবে এ খানকাহগুলোতে তাঁরা সেবাযত্ন পেত। তিনি একটি লঙ্গর খানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে গরীব, ক্ষুধার্ত, ভিক্ষুক ও সাধু ফকিরগণ সব সময় খাবার পেত। আঁখি সিরাজ তাঁর আল্লাহ্প্রেম মানবতাবোধ ও উদারতা গুণে সকলের এমনকি অমুসলিমদেরও অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এর ফলে বাংলাদেশে ইসলাম প্রসার ও সমঝোতাপূর্ণ পরিবেশ এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়।[৪]

কথিত আছে যে, হযরত আঁখি সিরাজ তাঁর পীর হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার নিকট থেকে আনিত আলখেল্লা (পোশাক) সমাধিস্ত করেন এবং সেই আলখেল্লার কবরের পাদদেশে তাঁকে সমাধিস্ত করার জন্য শিষ্যগণকে নির্দেশ দেন। তিনি ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর অসীয়ত অনুযায়ী সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৫] গৌড়ের সাগরদীঘি জলাশয়ের উত্তর-পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে এই সাধককে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ দু'টো শিলালিপি আজও তাঁর পরিচয় ঘোষণা করছে।[৬] স্থানীয়ভাবে এ দরবেশকে 'পুরানাপীর' (পুরাতন পীর) বা 'পীরানাপীর' (পীরদেরপীর) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে চিশতিয়া তরীকার সূফীদের পীর হিসেবে তিনি পীরানাপীর বা পীরদের

১. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
২. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৩. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০
৫. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৬. Dr. Ahmad Hasan Dani, op. cit. p. 56, 69.

Dhaka University Institutional Repository

পীর ছিলেন এবং প্রাথমিক যুগের পীর বা সূফী হিসেবে তিনি পুরানাপীর ছিলেন। সুতরাং পীরানাপীর বা পুরানাপীর উভয় উপাধিই তাঁর নামের প্রযোজ্য।[১] প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের দিন শায়খ আঁখি সিরাজের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয় এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদল আযহার উপলক্ষে এখানে একটি বিরাট মেলা বসে।[২]

শায়খ আলাউল হক (রহ.)
(১৩০১ - ১৩৯৮)

হযরত শায়খ আলাউল হক (রহ.) ছিলেন হযরত শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দীন ওসমান (রহ.) এর সবচেয়ে খ্যাতনামা শিষ্য ও খলিফা। তিনি লাখনৌতির একটি প্রতিপত্তিশালী পরিবারে ৭০১ হিজরী/১৩০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] সূফী জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাদিতে শায়খ আলাউল হক এবং তাঁর বংশের অন্যান্য সূফীদিগকে বরাবরই বাঙালীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে তাঁকে বা তাঁর বংশের অন্যান্য সূফীদিগকে যেভাবে বার বার বাঙালীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে মনে হয় বাংলাদেশ জন্ম না হলেও তাঁর জীবনের প্রধান অংশ বাংলাদেশেই অতিবাহিত হয়।[৪]

তিনি ছিলেন লাহোরের শায়খ আসাদের পুত্র। তাঁর পরিবার বিখ্যাত কুরাইশ বংশীয় সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) বংশধর।[৫] শায়খ আলাউল হক (রহ.) উচ্চ অভিজাত শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্য। তাঁর পিতা সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৭-১৩৯২) কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণও বাদ্‌শাহ্‌র উজীর ও আমীর-ওমারাহ্‌ ছিলেন । আযমখান নামে তাঁর একপুত্র পান্ডুয়া রাজ দরবারের উজীর ছিলেন।[৬] তিনি অত্যন্ত বিত্তশালী পরিবারের সন্তান হলেও পরবর্তী জীবনে সূফী জীবন পছন্দ করেন এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হন। আরও পরে তিনি শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দীন উসমানের (রহ.) শিষ্যত্ব বরণ করেন।

তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, জ্ঞানী ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ঐ যুগের আলিমগণ তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করতে সাহস পেতেন না। এমনকি আঁখি সিরাজও প্রথমে তাঁর সম্মুখীন হতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। বিখ্যাত দরবেশ শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) যখন তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, আলাউল হক তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করবেন। কেবল তখনই তিনি তাঁর পীরের খলিফারূপে বাংলায় আসতে সম্মত হয়েছিলেন।[৭]

শায়খ আলাউল হক (রহ.) যেহেতু ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ও অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাই তাঁর মনে নিজের সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা স্বভাবতই গড়ে উঠেছিল। তিনি 'গঞ্জেনবাত' বা মিষ্টান্ন ভান্ডার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। শায়খ নিযামুদ্দিন আউলিয়া তাঁর এ উপাধি গ্রহণ করাকে

১. আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২০০
২. Abed Ali Khan, op. cit. p. 90.
৩. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৪. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
৫. গোলাম সরওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮
৬. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৭. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। ফলে তাঁর অভিশাপে শায়খ আলাউল হক তাঁর বাকশক্তি হারান। শায়খ আঁখি সিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরেই তিনি বাকশক্তি ফিরে পান।[১] আলাউল হক শায়খ আঁখি সিরাজের আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্য বরণ করেন এবং সম্পদ, প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা পরিত্যাগ করে সেবা ও সংযমের পথ বেছে নেন। তিনি সর্বদা তাঁর পীরের অনুসরণ করতেন। এ সময় তিনি সর্বদা একটি জ্বলন্ত উনূন মাথায় বহন করতেন, যাতে চাওয়া মাত্রই তিনি তাঁর মুরশিদকে গরম খাবার পরিবেশ করতে পারেন। বার বার জ্বলন্ত উনূন বহনের ফলে তার মাথা ন্যাড়া হয়ে যায়।[২]

শায়খ আঁখি সিরাজের ইন্তিকালের (১৩৫৭ খৃ.) পর শায়খ আলাউল হক (রহ.) স্বীয় পীরের ধর্মীয় ব্রত অনুসরণ করে চলতেন এবং ইসলাম প্রচারের আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পাণ্ডুয়াতে একটি খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন যা ভক্ত, জ্ঞানী, ও আশ্রয়হীন অনাথদের আশ্রমে পরিণত হয়। তিনি এগুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্য উদার হস্তে দান করতেন। "বাস্তবিকই শায়খ আলাউল হক তাঁর আদর্শ জীবন ও মানবসেবামূলক কার্যাবলীর দ্বারা মানুষের মনে এতবেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, সুলতান সিকান্দার শাহ্ পর্যন্ত তাঁর প্রতিপত্তিতে শংকিত হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সুলতানের সঙ্গে শেখের মতানৈক্যতাও বিদ্যমান ছিল। ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭ খৃঃ) ও সিকান্দার শাহের আমলে রাষ্ট্রের উচ্চপদগুলোতে হিন্দুদের নিয়োগ করা হতো। শেখ আলাউল হক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে এভাবে হিন্দুদের নিয়োগ করা অসংগত বলে উল্লেখ করেন। জনসাধারণের উপর শেখের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সুলতান পূর্বেই ইর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন এবং রাজকার্যে তাঁর হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করেননি। ফলে সুলতান তাঁকে রাজধানী থেকে নির্বাসিত করেন। অতঃপর শেখ আলাউল হক সোনারগাঁয়ে বসবাস করেন। এখানেও তিনি খানকাহ্ ও লঙ্গর খানা স্থাপন করেন এবং ধর্ম ও জ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এমন কি সেই নির্বাসিত স্থানেও তিনি তাঁর সেবা ও নিষ্ঠার দ্বারা লোকদের চিত্ত জয় করতে পেরেছিলেন। সম্ভবত ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তিনি পাণ্ডুয়ায় ফিরে আসেন।"[৩]

এই মহান দরবেশের সুগভীর পান্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য পাণ্ডুয়া ঐ সময় ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর পুত্র শায়খ নূর কুতবুল আলম, জাহাঙ্গীর সিমনানী, শায়খ নাসিরুদ্দীন মানিকপুরী, শায়খ হোসাইন যুক্কারপোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। হিজরী ৮০০/১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে এই মহান দরবেশ ইহধাম ত্যাগ করেন।[৪] খান সাহেবের মতে, তিনি হিজরী ৭৮৬/ ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৫]

---

১. গোলাম সওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯
২. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৪. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৫. Abid Ali Khan, op. cit. p. 109.

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ নূর কুতবুল আলম (রহ.)
(মৃ.১৪১৫ - ১৬ খৃ.ঃ)

এই দরবেশ ছিলেন শায়খ আলাউল হক(রহ.) সুযোগ্য পুত্র ও সার্থক আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। তাঁর প্রকৃত নাম হযরত নুরুদ্দীন নুরুল হক। সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর তিনি উপাধ পান হযরত নূর কুতবুল আলম বা জগতের ধ্রুবতারা। পিতার মত তিনিও ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও বিদ্যাবত্তায় সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সহপাঠী ছিলেনএবং তাঁরা উভয়ে শায়খ হামিদ উদ্দিন নাগরীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। নূর কুতবুল আলম ও গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

পিতার তত্ত্বাবধানে ছোটবেলা থেকে তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। পুত্রকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান এবং কঠোর তপস্যা, নিষ্ঠা ও সংযমী জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য ৮ বছর ধরে পিতা পুত্রকে কৃচ্ছ্র সাধনার তালিম দিয়েছিলেন। খানকাহ্‌র ভিখারী, ফকীর, মুসাফির প্রমুখের বস্ত্রাদি তাঁকে ধৌত করতে হয়েছিল। তাদের অযু-গোসলের জন্য পানি গরম করা, খানকাহ্‌র মেঝে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা, এমনকি পায়খানা সাফ করা প্রভৃতি কাজ তাঁকে করতে হত।[১]

কথিত আছে যে একবার তিনি যখন একজন অসুস্থ ভিক্ষুক কে পায়খানায় যেতে সাহায্য করছিলেন তখন তার পরিধেয় বস্ত্র শরীর মল লেগে অপবিত্র হয়ে যায়। তাঁর পিতা এ সেবার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে লঙ্গর খানার জন্য জ্বালানী কাঠ বহন করার কাজে নিযুক্ত করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আযম খান পান্ডুয়া রাজদরবারের উজীর-এ-আযম ছিলেন । একদা তিনি নূর কুতবুল আলমকে এ অবস্থায় দেখে তাঁকে এ রকম নিচ কাজ পরিত্যাগ করে তাঁর নিকট আসার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দরবেশ এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে রাজ দরবারের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন অপেক্ষা খানকাহ্‌তে জ্বালানী কাঠ বহন করা শ্রেয়তর মনে করলেন। তিনি বলেছিলেন- "I have no necesiety of your wealth and grandeur which are perishable. To carry faggots for the monastery is better (than wealth), the post of dignitaries is for you."[২]

এমনি ধরনের কঠোর জীবন ও জনসেবার আদর্শ অনুসরণ করে নূর কুতবুল আলম তাকে পিতার যোগ্য আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীরূপে পরিগণিত হন। তিনি তাঁর পিতার আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শকে মূল্যবান'সম্পদ মনে করতেন এবং নানা উপায়ে তা সমৃদ্ধ করতেন। তিনি ধর্ম বিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করেন এবং সূফীবাদের জ্ঞান ও ব্যবহারিকতায় সমান পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি সূফী তরীকার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন এবং ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও জনহিতকর কার্যাবলীতে এক নব উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর সময়ে পান্ডুয়া এমন একটি প্রাণবন্ত ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয় যা এ উপমহাদেশে এর সমতুল্য খুবই বিরল ছিল। এই জ্ঞান কেন্দ্রের সুখ্যাতি ভারতের সকল স্থানে থেকে

১. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. p. 173.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থী ও শিষ্য আকৃষ্ট করে।[১] এ ভাবে তাঁর সুখ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শাসকদের চেয়েও তিনি জনসাধরণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তথাপি তিনি শাসকদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। তিনি বলতেন-"যে তার শাসককে শ্রদ্ধা করে, সে তাঁকে শ্রদ্ধা করে; আমরাও রাজা ও আমীর-ওমারাহ্‌কে সম্মান করি, যাতে আমাদের সন্তান -সন্ততিগণ আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারে"।[২] তিনি তাঁর এক সহ সাধককে একপত্রে লিখেছিলেন-"পয়গাম্বরের ঐতিহ্য ও বাণী এবং চিশতিয়া সূফী দরবেশগণের উপদেশ অনুসরণ করে তোমার উচিত লোকদের মন থেকে সন্দেহ দূর করা এবং রাজার অনুগত হতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া।"[৩]

শায়খ নূর কুতবুল আলম একজন সংসার ত্যাগ দরবেশ ছিলেন। সাধারণত তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু যখন এক মহাসংকটের দরুণ মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন এবং মুসলিমদেরকে রক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই দরবেশের খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখন বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ্ ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যাবহিত পরে কয়েকজন সুলতান পাণ্ডুয়ার সিংহসনে আরোহণ করলেও তাঁরা শক্তিহীন ছিলেন; প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় রাজা গণেশ নামক এক হিন্দু জমিদারের হাতে। গণেশ ইলিয়াসশাহী বংশের রাজাকে রাজ্যচূত করেন এবং গৌড়বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে দেন।[৪] অবশ্য তৎকালের মুসলমানদের উদারনীতি ও তাদের অনৈক্যের পরিণতিই রাজা গণেশকে এরূপ দূর্দান্ত করে তোলে। " সরকারী ক্ষেত্রে হিন্দুদেরকে বিশ্বস্ত ও দায়িত্ব পূর্ণ পদে উন্নীত করার যে নীতি ইলিয়াশাহী সুলতানগণ গ্রহণ করেন তারই ফলে পাণ্ডুয়ার মুসলমানদের মধ্যে এই বিভেদ ও অনৈক্য দেখা দেয়। একদল মুসলমান সুলতানদের এই নীতি পছন্দ করেননি এবং তারা রাষ্ট্রের ভাল-মন্দের প্রতি উদাসীনতার দরুণ পাণ্ডুয়ার রাজ দরবারের একজন হিন্দু কর্মচারী রাজা কংস (গনেশ) রাষ্ট্রীয় শাসন কার্যে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন এবং তিনি মুসলমানদের বিশেষ করে উলেমা ও শেখদের উপর অত্যাচার করেন। ফলে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ এক মহাদূর্দিনের সম্মুখীন হয়।[৫]

এমতবস্থায় শায়খ নূর কুতবুল আলম মুসলিম রাষ্ট্রের সংহতি বিধানের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসলমানদের ভিতরকার বিভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালান। এ সময় রাজাগণেশ পীর বদরুল ইসলামকে হত্যা করেন এবং মুসলমানদের উপর অধিকতর নির্যাতন শুরু করেন। এবার নূর কুতবুল

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
২. উদ্ধৃত ঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৩. উদ্ধৃতঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
৪. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, কলিকাতা, ১৯৬৬ইং, পৃ. ১১২
৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

আলম অধীর হয়ে উঠলেন এবং জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শাহ্ শার্কীকে চিঠি লিখে জানালেন যে, রাজাগণের পাপের শাস্তি বিধান করা দরকার।[১] মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীও অত্যাচারী রাজা কংসের (গণেশের) শাস্তি বিধানের জন্য ও বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে রক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে সুলতানের নিকট পত্র লেখেন।[২]

সুলতান ইবরাহীম শার্কী তাঁর আদেশানুসারে সৈন্যদল নিয়ে বাংলাদেশ অবরোধ করেন। ফলে রাজা গণেশ ভীত হয়ে বিপদ এড়ানোর জন্য বিনীতভাবে হযরত নূর কুতবুল আলমের মধ্যস্থতা কামনা করেন। তিনি তাঁর পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য অর্পন করে। তদনুযায়ী যদু মুসলমান হন এবং জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ উপাধি ধারন করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর নূর কুতবুল আলম সুলতান ইবরাহীম শার্কীকে তাঁর অভিযান পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। এর ফলে চরম সংকটের মুখ থেকে মুসলিম রাজ্য, সমাজ এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা পায়। এভাবে দরবেশ নূর কুতবুল আলম ত্রাণ কর্তা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

সুলতান ইবরাহীম শার্কী সসৈন্যে দেশে ফিরে যাবার পর রাজা গনেশ পুণরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তদীয় পুত্রকে শুদ্ধি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবার হিন্দুত্বে ফিরিয়ে আনেন। উপরন্তু মুসলিম পীর-দরবেশদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। এই যখন গৌড় পান্ডুয়ার রাজনৈতিক অবস্থা তখন হযরত নূর কুতবুল আলম ইন্তিকাল করেন। রাজাগণের হযরত নূর কুতুবল আলমের পুত্র শায়খ আনোয়ার ও দৌহিত্র শায়খ যাহিদকে অবরুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন। রাজা গণেশের নির্দেশে শায়খ আনোয়ার নিহত হন। একই বছর পুত্র যদুর হাতে রাজা গণেশও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র যদু পুণরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ উপাধি ধারন করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩] এভাবে একটি প্রভাবশালী হিন্দু পরিবার ইসলামে দীক্ষিত হয়। হযরত নূর কুতবুল আলমের মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে।[৪] তবে গ্রহণযোগ্য মতানুসারে তিনি ৮১৮ হিজরী/১৪১৫ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৫] পান্ডুয়ায় পিতার সমাধির পাশে তিনি সমাধিস্থ হন। পিতা ও পুত্রের এ মাযার 'ছোট দরগাহ' নামে পরিচিত। ছোট দরগাহ্ সংলগ্ন ভূ-সম্পত্তি হতে ছয়হাজার টাকা আয় হয় বলে একে 'শশ হাজারী স্টেট' বলা হয়। কুতবুল আলমের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের প্রতি তাঁর মহান সেবার জন্য তিনি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সূফী দরবেশ হিসেবে পরিগণিত হন। তার দরগাহ্ রাজা-বাদশাহ্ ও সকল শ্রেণীর লোকের তীর্থস্থান। তাঁর পুরোপরি বারই একটি সূফী পরিবার।

---

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
২. Dr. Hasan Askari, Begal Past and Present,op. cit. p. 32.
৩. গোলাম হুসায়ন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৪. তাজকিরাত আল আফতাব'-এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে খাজিনাতুল আসফিয়া'র লেখক উল্লেখ করেন যে, শায়খ ৮৫১ হিঃ / ১৪৪৭ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের সমকালীন একটি উৎকীর্ন লিপি থেকে জানা যায় যে, কুতবুল আলম ৮৩৫ হিঃ/ ১৪৫৯ খৃ. মৃত্যু বরণ করেন
৫. Abid Ali Khan, op. cit. p. 111.

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রে শায়খ নূর কুতবুল আলমের সুফী পরিবার

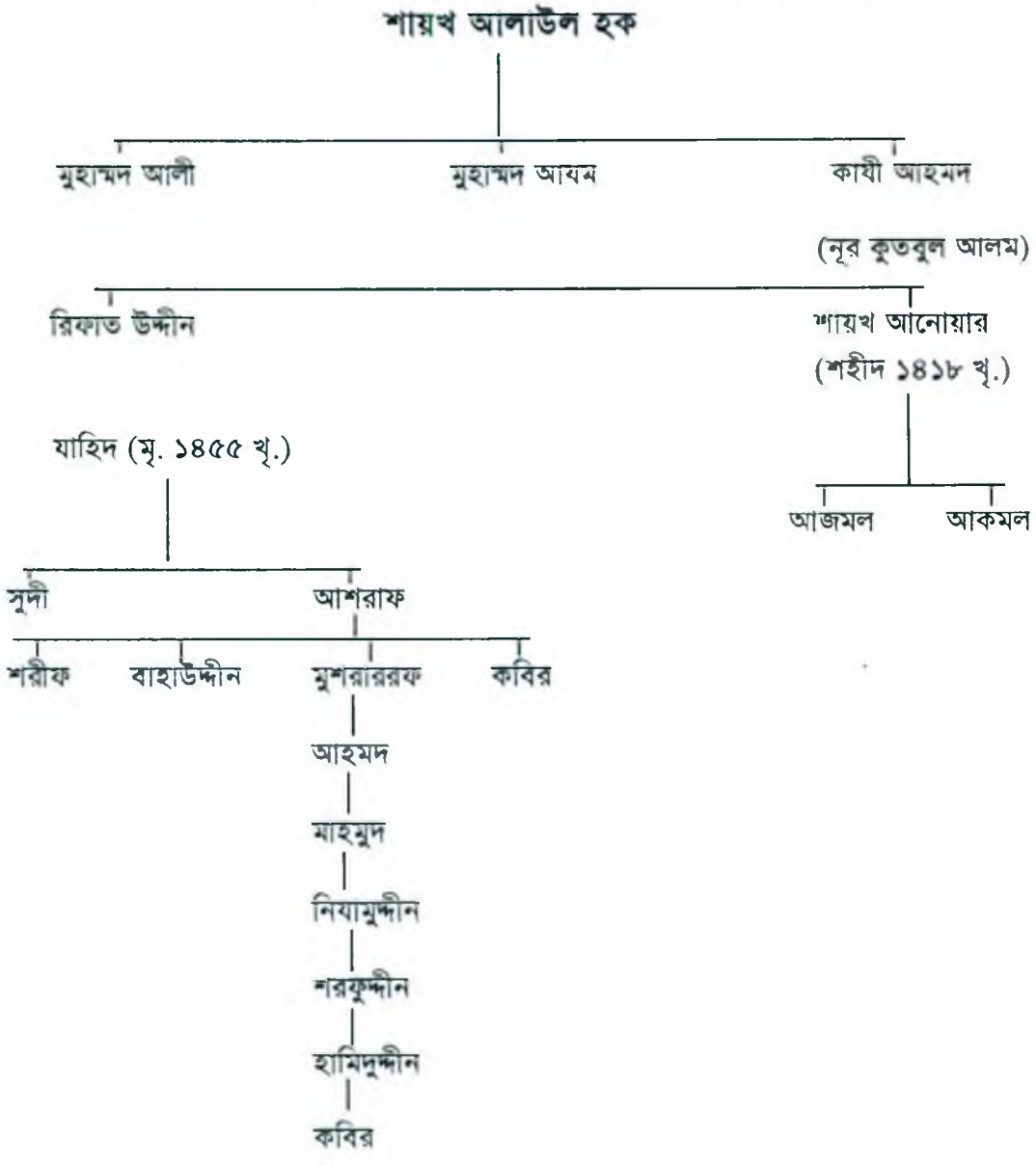

Dhaka University Institutional Repository

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রহ.)

বাংলার আধ্যাত্মিক জগতে মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রহ.) ছিলেন একজন খ্যাতনামা সূফী ও পন্ডিত। জানা যায় যে, তিনি মধ্য এশিয়ার সিমনানের রাজ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তরুণ বয়সেই তিনি ধনৈশ্বর্য বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে দরবেশী জীবন অবলম্বন করেন। তিনি কিভাবে সকল প্রকার পার্থিব মোহ ত্যাগ করে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার পথ বেছে নেন তা অবশ্য জানা যায় না। প্রথমে তিনি জন্মভূমি তাগ করে দিল্লীতে আসেন এবং সেখানে খ্যাতনামা সূফীদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ ইয়া মানেরীর (রহ.) শিষ্যত্ব গ্রহণের ব্যাকুল বাসনায় বিহারের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে জানতে পারলেন তিনি বেঁচে নেই। অতঃপর তিনি বাংলায় আগমন করে হযরত শায়খ আলাউল হকের (রহ.) শিষ্যত্ব বরণ করেন। এ জন্য জৌনপুরের সুলতান এই দরবেশকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন।[১]

মীর সিমনানী পান্ডুয়ায় ছয় বছর অবস্থান করে স্বীয় পীর আলাউল হকের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি খিরকাহ্ লাভ করেন এবং জৌনপুরের খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি জৌনপুরে 'কাচৌটাশরীফ' খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন।[২]

মীর সিমনানী বাংলাদেশকে খুবই পছন্দ করতেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু হযরত আলাউল হকের প্রতি খুবই ভালবাসা ছিল। জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শার্কীর কাছে লেখা এক পত্র থেকে তা জানা যায়। তাঁকে লিখিত সুলতানের একটি চিঠির জবাবে তিনি এ চিঠি লিখেছিলেন। সুলতান তাঁর চিঠিতে শায়খ নূর কুতবুল আলমের অনুরোধে তার অভিপ্রেত বাংলা অভিযানের বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি এও লিখেছিলেন-"------- সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কি সুন্দর এই বাংলাদেশ ! এখানে কত শত সূফী দরবেশ বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেছেন এবং এ দেশে তাঁদের বসবাস স্থাপন করেছেন।-----কেবল নগর নয় সারা বাংলাদেশে এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে এ সব দরবেশ পদার্পন করেননি ও বসতি স্থাপন করেননি।"[৩]

তিনি আরও বলেছেন-"-- এ সকল পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের পুত্র ও বংশধরগণ বিশেষকরে নূর কুতুব আলমের পুত্র ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ যদি আপনার সাহায্য ও সহযোগিতায় এবং আপনার সৈন্য বাহিনীর সাহস ও বীরত্বের মসীবর্ণ অবিশ্বাসীদের থাবা থেকে মুক্তি লাভ করে তবে সেটা হবে এক চমৎকার ব্যাপার। --------- আমি আলাই সম্প্রদায়ের একজন মনোকষ্টে পীড়িত দরবেশ, আপনার এক দৃঢ় সংকল্পের জন্য আপনাকে মোবারকবাদ জানাই এবং অবিশ্বাসীদের হাত থেকে বাংলার মুক্তি লাভের জন্য দোয়া করি। আমি ইতোমধ্যেই ন্যায় বিচারের আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছি। যেহেতু

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
২. Dr. Hasan Askari, op.cit.p. 34-36.
৩. Dr. Hasan Askari, op.cit.p. 36.

Dhaka University Institutional Repository

আপনার ও আপনার অভিজাত বর্গের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাকে মুক্ত করা ও ইসলামের স্বার্থকে রক্ষা করা সেহেতু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করবেন। সুলতানের দৃঢ় সংকল্প এবং বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত হযরত মাখদূমের পুত্রকে সাহায্য ও তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে হওয়ায় সেই প্রিয় পূর্ণ্যাত্মাকে অনুগ্রহ দেখাতে অবহেলা করা আপনার উচিত হবে না এবং তার সঙ্গে সাক্ষাত করা ও তাঁর সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হওয়া কখনোই আপনার উচিত হবে না।"[১]

মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর তাঁর বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং জৌন পূরের আধ্যাত্মিকব ও বুদ্ধি-বৃত্তিক জীবনের উন্নতিতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থরচনা করেন। এ সব গ্রন্থে তাঁর ইসলামী ধর্ম তত্ত্ব ও সূফীবাদ সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।[২] ভারতের উত্তর প্রদেশের কাচৌটাশরীফে তাঁর মাযার বিদ্যামান।

শায়খ বদরুল ইসলাম (রহ.)

হযরত শায়খ বদরুল ইসলাম (রহ.) হযরত নূর কুতবুল আলমের সমসাময়িক একজন মহান দরবেশ। গৌড় ও পান্ডুয়ায় তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্‌ মতে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তৎকালীন শাসক রাজা গণেশের রোষানলে পড়ে প্রাণ হারান। রিয়াজ উস সালাতীনের বর্ণনা মতে, শায়খ বদরুল ইসলাম একদিন রাজা গণেশকে অভিবাদন না করেই তিনি তার সামনে বসে পড়েন। তাঁর এহেন আচরণের জন্য তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কোন শিক্ষিত লোক বিধর্মীকে অভিবাদন করেনা। অন্য একদিন রাজা সংকীর্ণ প্রবেশ দ্বার বিশিষ্ট নিচু এক কক্ষে বসেছিলেন এবং শায়খকে তাঁর সামনে ডেকে পাঠান। শায়খ রাজার চাতুর্যপূর্ণ কৌশল বুঝতে পারেন। তাঁকে যাতে মাথা নত না করতে হয় সেজন্য তিনি প্রথমে ঘরের মধ্যে পা রেখে পরে ঘরে প্রবেশ করেন। দরবেশের এহেন আচরণে রাজা গণেশ রাগান্বিত হয়ে শায়খকে তাঁর ভাইদের সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবার নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ শায়খকে হত্যা করা হয় এবং অন্যান্য আলিম-ওলামাকে নৌকাযোগে নদীতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হয়।[৩]

মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্রে দু'জন সূফী দরবেশ হযরত বদ আলম ও বদর আলম যাহিদীর উল্লেখ আছে। বদর আলম যাহিদীকে শায়খ শরফুদ্দীন মানেরীর সমসাময়িক খাজা ফখরুদ্দীন যাহিদীর পুত্র শায়খ বদরুদ্দীন যাহিদীর সঙ্গে অভিন্ন ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা হয়। বিহারে তাঁর মাযার বিদ্যমান।[৪] মীর সিমনানীর পত্রে উল্লেখিত হযরত বদ আলম খুব সম্ভবত শায়খ বদরুল ইসলাম ছিলেন, যিনি রাজা গণেশের কোপানলে পড়ে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন।

---

১. Dr. Hasan Askari, op.cit.p. 36.
২. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৭
৩. গোলাম হুসায়ন সলীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৪. Dr. Hasan Askari, op.cit.p. 36.

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ হুসায়ন যুক্কার পোশ (রহ.)

পূর্ণিয়ার দরবেশ শায়খ হুসায়ন যুক্কার পোশ (রহ.) হযরত আলাউল হকের (রহ.) শিষ্য ও খলিফা ছিলেন। শায়খ হুসায়নের পিতার নাম বাবা কামাল এবং তাঁর মায়ের নাম কাকো। উভয়েই গয়া জেলার সূফী ছিলেন। তাঁর মায়ের জন্ম হয়েছিল একটি সূফী পরিবারে এবং তাঁর পিতার নাম ছিল সুলায়মান লঙ্গর যমিন ও মা ছিলেন বিবি হাদ্দা। বিবি হাদ্দা ছিলেন বিখ্যাত জেঠুলী দরবেশ মাখদূম শিহাবুদ্দীনের পীর জগজতের চার কন্যার অন্যতম।[১]

শায়খ হুসায়ন পাণ্ডুয়াতে মীর সিমনানীর সহপাঠী ছিলেন। শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর তিনি হযরত আলাউল হক (রহ.) কর্তৃক খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি পূর্ণিয়ায় অবস্থান করে সেখানে একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র পাণ্ডুয়াতে বসবাস করছিলেন এবং সেখানে রাজা গণেশ তাঁর পুত্রকে হত্যা করেন। মীর জাহাঙ্গীর সিমনানী শোকার্ত পিতাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একখানা পত্র লিখেন। যার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ঃ " যারা আল্লাহ্র পথে চলে তাদের বহু দূর্ভোগ পোহাতে হয়। তাদের বহু পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। --- আশা করা যায় যে, অতীতে সোহ্রাওয়ার্দীয়া ও রূহানীয়া দরবেশগণের রূহের আধ্যাত্মিক অনুগ্রহে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের রাজ্য হতভাগ্য অবিশ্বাসীদের হাত থেকে মুক্তি পাবে। সাহায্যের জন্য এদিক থেকে রাজকীয় সেনাবাহিনী পাঠানো হচ্ছে এবং অতি শীঘ্রই ফলাফল দৃষ্টিগোচর হবে। আমার মাখদূমযাদা (আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশকের পুত্র), আলাই ও খালিদিয়া বংশের বাগানের পুষ্পরাজি এ দরবেশের সাহায্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন।"[২]

শায়খ হুসায়ন যুক্কার পোশের মায়ার পূর্ণিয়ায় অবস্থিত । যুক্কার পোশ অর্থ ধূলি-ধূসরিত। সম্ভবত তিনি সহজ -সরল ও দরিদ্র জীবন-যাপন করতেন বলে তাকে এই উপাধি দেয়া হয়।

উলুগ -ই-আযম জাফর খান গাযী (রহ.)
(মৃ. ১৩১৪ খৃ.)

হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে উলুগ -ই- আযম জাফর খান গাযীর সমাধি বিদ্যমান। উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের সাথে এ দরবেশের নাম জড়িত রয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম উলুগ-ই-আযম হুমায়ুন জাফর খান বাহরাম ইৎসীন। মনে হয় তিনি লাখনৌতির সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউসের (১২৯১ - ১৩০০) অধীনস্থ একজন সেনাপতি ছিলেন।[৩]সুলতানের নির্দেশে তিনি বহু স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন। বরেন্দ্র ও রাঢ় এলাকায় তিনি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। দিনাজপুর জেলার দেবীকোটে প্রাপ্ত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি শিলালিপি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। উক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, জাফর খান গাযীর নির্দেশে মুলতানবাসী মালিক জিওন্দ কর্তৃক ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

১. Dr. Hasan Askari, op.cit.p. 37.

২. Dr. Hasan Askari, op.cit.p. 37.

৩. দ্রষ্টব্য ঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস, অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তার সমাধির গায়ে একটি উৎকীর্ণ শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজশাহের শাসনামলে ইসলামের ও রাজন্য বর্গের সাহায্যকারী ও বিশ্বাসীদের পৃষ্ঠপোষক খান জাহান জাফর খান বড় খান কর্তৃক 'দ্বার-আল-খায়রাত' নামে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করার হয়েছে।[১] ত্রিবেণীতে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে অন্য একটি শিলালিপিতে জাফর খানকে 'সিংহের সিংহ' বলা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি প্রতিটি অভিযানে ভারতের বিভিন্ন শহর দখল করেছেন এবং তিনি তাঁর তরবারি ও বর্শার সাহায্যে বিধর্মী বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস করেছেন।[২]

হুগলীর ছোট পাণ্ডুয়ায় জাফর খান গাযীর (রহ.) নির্মিত একটি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। মিনারটি ত্রিবেণী বিজয়ের পর সম্ভবত ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জাফর খান ইসলামের সেবায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি ইসলামের বিস্তারের জন্য লড়াই করেছেন। তাঁর মাযারের খাদিমগণ কর্তৃক সংরক্ষিত 'কুরসীনামা' মুসলমানদের জন্য এ মুজাহিদ দরবেশের সেবা ও ত্যাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাফর খান তাঁর ভাগ্নে শাহ সূফীকে সঙ্গে নিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলায় আগমন করেন। তিনি রাজা মান নৃপতিকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। কিন্তু তিনি হুগলীর রাজা ভূদেবের সঙ্গে একটি যুদ্ধে নিহত হন। জাফর খান গাযীর পুত্র উগয়ান খান অবশ্য রাজা ভূদেবকে পরাজিত করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন।[৩]

এসব থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামের বিজয়, ইসলামের বিস্তার ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এ লক্ষ্যে পৌছার জন্য তিনি বলিষ্ঠ হস্তে তরবারি ধারন করেন। উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে তিনি অসীম সাহসে ইসলাম প্রচারের পথে বৃহত্তম বাধাসমূহ দূরীভূত করে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। এই মুজাহিদ দরবেশ ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে ইন্তিকাল করেন। সেখানকার একটি প্রস্তর নির্মিত দেবালয়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বড় খান গাযী (রহ.) ও উগয়া খান গাযী (রহ.)

বড় খান গাযী ও উগয়াখান গাযী হলেন উলুগ-ই-আযম জাফর খান গাযীর (রহ.) দুই পুত্র। পিতার সমাধির সন্নিকটে পুত্র উগয়াখান ও বড় খান গাযীর সমাধি রয়েছে। যশোর, খুলনা ও চব্বিশ পরগণায় বড় খান গাযী সম্পর্কে বহু জনশ্রুতি রয়েছে। মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে এ মুজাহিদের সঙ্গে হিন্দু নৃপতিদের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত আছে। পাঁচালীকার আব্দুর রহীমের 'গাযী-কালু-চম্পাবতী' কাব্যে এবং 'কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে যে, যশোরের রাজা মুকুটরায় ও দক্ষিণ দেশের রাজা দক্ষিণারায়ের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে গাযী বড় খান (রহ.) জয় লাভ করেন। এ মুকুট রায়কে গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫০-১৩৯১) আমলের সামন্ত রাজা মুকুট রায় বলে অনেকে মনে করেন।[৪]

১. JASB, 1847, vol - xiv, p. 389.
২. Ahmad Hasan Dani, Inscription of Bengal , No-9
৩. JASB, তে উদ্ধৃত কুরসী নামা, op.cit, p. 398.
৪. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

উলুগ-ই-আযম জাফর খান গাযী (রহ.) এর ত্রিবেণী বিজয়ের পর দক্ষিণ অঞ্চলের প্রতিরোধ দূর্গ নস্যাৎ হয়ে যায়। তখন জাফর খান গাযীর (রহ.) পুত্র বড় খান গাযী এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং দক্ষিণ দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর এ অভিযান সাফল্যমন্ডিত হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। হুগলী রাজা ভুদেবের সঙ্গে যুদ্ধে জাফর খান গাযী নিহত হলে তদীয় পুত্র উগয়া খান রাজা ভূদেবকে পরাজিত করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন।[১]

হযরত শাহ সফি উদ্দীন (রহ.)

মুসলমান সুলতানদের রাজত্বকালে সম্ভবত ১২৯০ খৃষ্টাব্দে হযরত শাহ সফি উদ্দীন হুগলীর পান্ডুয়ায় আগমন করেন। জানা যায় তিনি সাথে করে একদল শক্তিশালী বাহিনী এনেছিলেন। তিনি ছিলেন উলুগ-ই-আযম জাফর খান গাযীর ভাগ্নে এবং শাহ বু-আলী কলন্দরের প্রধান শিষ্য। পান্ডুয়ায় প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে শাহ্ সফিউদ্দীনের পিতার নাম বরখুর্দার এবং তিনি ছিলেন দিল্লী রাজদরবারের একজন অভিজাত ব্যক্তি এবং সুলতান ফিরোজ শাহের ভগ্নিপতি। শাহ্ সফি উদ্দীন বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। কথিত আছে যে, ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের রাজা ভূদেবের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। একজন বালকের খাৎনা উপলক্ষে গরু জবাইকে কেন্দ্র করে রাজা ও দরবেশদের মধ্যে বিবাদের সুত্রপাত হয়। রাজা সে বালকটিকে হত্যা করেন। দরবেশ তাঁর মাতুল ফিরোজ শাহের নিকট সাহায্যের আবেদন জানালে সুলতান এ ধর্মযুদ্ধের জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। দরবেশ পানিপথে কর্ণালের বিখ্যাত দরবেশ বু-আলী কলন্দরের দোয়াও পেয়েছিলেন। যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন এবং হিন্দু রাজা পরাজিত হন। তবে শাহ্ সফিউদ্দীন যুদ্ধ ক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন। ডঃ এনামূলক হকের ভাষায়-"The Victorion muslim army entered the city triumphantly, drove off the Hindu inhabitants one and all, and demolished the temple of the Raja, on the site of which they built a mosque. Not for off from the mosque a lofty minaret was built, from the lot of which the Muwadhdhin (one who calls the muslims for prayer) used to call the believers to Prayer. With much eclat and pomp Shah Safiuddin was buried in the city of Pandua."[২]

হুগলী জেলার পান্ডুয়ায় হযরত শাহ সফিউদ্দীনের মাযার রয়েছে। সমাধিটি গ্রান্ড ট্রাংক রোডের পাশে অবস্থিত। অমীয় কুমার ব্যানার্জী বলেছেন-"South of the lower on the opposite side of the Grand Trank Road, it is astance or tomp of Shah Sufiuddin, a small white washed structure, which is kept in repair by subscription raised by the Mohammedan. It has us inscription."[৩]

---

১. JASB, 1847, vol - xiv, p. 389.

২. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. p. 195.

৩. Amiya Kumar Banerjee. West Bengal District Gazetteers. (Hogly), Calcutta, 1972, p. 708.

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ শাহ্ বদরুদ্দীন (রহ.)

সৈয়দ শাহ্ বদরুদ্দীন (রহ.) সম্ভবত ইরান দেশাগত ছিলেন। মহেশো নামক পরগণায় এই দরবেশের মাযার, মসজিদ, মিনার ও আস্তানা বিদ্যমান। এ জন্য তিনি 'মহেশোপীর' নামে পরিচিতি। জাফর খান গাযীর সমসাময়িককালে দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ নামক স্থানে এই দরবেশ তাঁর কতিপয় সহচর সহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। মেহতাবাদ এলাকায় তাঁর আগমন ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কে দিনাজপুর গেজেটিয়ারের যে বিবরণ রয়েছে তাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মহেশ রাজার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।[১] এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মহেশ রাজার সমসাময়িক ছিলেন।

স্থানীয় জনশ্রুতি হতে জানা যায় যে, পীর শাহ বদরুদ্দীন (রহ.) এর ব্যাপক সাফেল্যে রুষ্ট হয়ে স্থানীয় হিন্দু রাজা মহেশ তাঁর ও তাঁর দলবলের উপর অত্যাচার চালাতে থাকেন। ফলে দরবেশ গৌড়ের সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গৌড়ের সেনাবাহিনীর সহায়তার যুদ্ধে রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন।[২] পরে মৃত্যুর পর এ রাজ প্রসাদের মধ্যেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। মাখদূম গরীবুল ইসলাম তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁর কবরের পাশে তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যগণও কবরস্থ হন। পরে পীর বদরুদ্দীনের মাযারের একটি মসজিদও নির্মিত হয়।

সৈয়দ আব্বাস মক্কী (পীর গোরাচাঁদ)
(জ. ১২৬৫ খৃঃ)

চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলায় ইসলাম প্রচারে যাঁরা বিশেষভাবে জড়িত তাদের মধ্যে সৈয়দ আব্বাস মক্কী (র.) এর নাম জড়িত। সাধারণ্যে তিনি পীর গোরাচাঁদ নামে পরিচিত।[৩] তিনি ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে ভারতে আগমন করেন। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে আসেন। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক যখন বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য পুর্ব দিকে অভিযান পরিচালনা করেন তখন সম্ভবত সৈয়দ আব্বাস মক্কী (রহ.) তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন। পরে আর তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেননি। এখানেই তিনি বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর লাখনৌতি থেকে তিনি সাতগাঁও রাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, সৈয়দ আব্বাস মক্কী যখন চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন তখন স্থানীয় হিন্দু সামন্তরাজা চন্দ্রকেতুর সাথে তার লড়াই হয়। এ লড়াইয়ে তিনি তৎকালীন মুসলিম শাসক সম্ভবত মালিক ইজ্জুদ্দীন ইয়াহইয়ার সহায়তায় রাজা চন্দ্রকেতুকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ নামক আরও দু'জন স্থানীয় হিন্দু সামন্ত রাজার সাথে তাঁর বিরোধ বাধে। বকানন্দ তাঁর হাতে নিহত হলেও তিনি নিজে যুদ্ধে আহত হন। আহত অবস্থায় হাড়োয়ায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি ইন্তিকাল করেন। বশিরহাটের হাড়োয়ায় তাঁর মাযার বিদ্যমান । গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ্ এই দরবেশের মাযারের উপর এক সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন।[৪]

---

১. F.W. Strong, Dinajpur Gazetteer, 1972. p. 20.

২. দ্রষ্টব্য, মেহরাব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-৭১

৩. দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা, (২য় খন্ড), ঢাকা-১৩৭১ বাং, পৃ. ২৫৭-২৭৫

৪. ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দা রওশন আরা মক্কী (রহ.)
(১২৭৯-১৩৪২)

বাংলার দক্ষিণাংশ বিশেষত চব্বিশ পরগণা ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের সাথে সৈয়দা রওশন আরার নাম জড়িত। তিনি হযরত আব্বাস আলী মক্কীর (রহ.) কণিষ্ঠ ভগিনী। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বশির হাটের কাঠুলিয়া গ্রামে তার মাযার বিদ্যমান। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, তিনি ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ করিম উল্লাহ্ ও মা ছিলেন মেহেরুন্নেছা। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আব্বাস আলী (রহ.) দরবেশী জীবন যাপনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। রওশন আরা একজন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতি, বিদূষী ও ন্যায়পরায়ণ সাধিকা ছিলেন। তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের শাসনামলে ১৩১১ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূসহ শায়খ শাহ্ হাসানের সাথে দিল্লীতে আগমন করেন।[১]

শাহ্ হাসান ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর সাথে আগত ১৬৫ জন শিষ্যকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন যখন বাংলায় বিদ্রোহ দমনের জন্য অভিযান করেন (১৩২৪ খৃঃ) তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই ও ভ্রাতৃবধূসহ রওশন আরা এ অঞ্চলে আসেন। এঁরা তারাগুনিয়ায় বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন। রওশন আরা ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[২]

---

১. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

২. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. 236-37.

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশে সুফীগণের প্রভাব (১২০০-১৪০০ খৃঃ)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সূফী-দরবেশগণের প্রভাব

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় কোন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি এবং এদেশের নিজস্ব অধিবাসীদের অনার্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ বহুদিন ধরেই হয়েছিল। কিন্তু তাদের সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন ও সমাজ সৃষ্টি হয়নি। ছিল গ্রাম্য সভ্যতা; যেখানে আপনার ধারায়, আপন নিয়মে বহু বিচিত্র আচার-ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সমাজ চালু ছিল। এই গ্রাম্য সমাজের কর্তা ছিল বর্ণ হিন্দুগণ। হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য প্রচলিত ছিল। সেন আমলে কৌলিণ্য প্রথার সৃষ্টি হওয়ায় তা নূতন ও আদর্শ সমাজ সংগঠনের পথে প্রবল বাধা ও অন্তরায় ছিল। সেকালে হিন্দুদের অহংকার বোধ, জাত্যাভিমান ও বহিরাগত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং যুক্তিহীন আত্মসর্বস্বতা তাদের জীবনকে অধিকার করেছিল এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নির্বিচার চালিয়ে সর্ব সাধারণের উপর প্রভূত্ব করত। আল বেরুণীর ভাষায়-"----They are houghtly, foolishly vain self-concieted and stolid. They are by nature niggardly in communicating what they know and take the greatest possible care to withhold it from men of antoher caste among their people, still much more, of course, from any foreigner. According to their blief, there is no other country on the earth but theirs, no other race of man but theirs, and no created beings besides them have any knowledge or science what so ever."[১]

সর্বক্ষেত্রে সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণকে বঞ্চিত ও পদানত করে রাখার প্রচেষ্টা চলত। ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোরতার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ বরাবরই অবহেলিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের জনমানস ও চিন্তাধারায় যখন এমন একটা শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়, সমাজ সংস্কৃতির এই পরিবেশে আরব-পারস্য এবং মধ্য এশিয়া থেকে এসে মুসলমানগণ এ দেশ জয় করে নিয়েছেন, তাঁদের বিজয় অভিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক আগমন করে নব সমাজ গঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বাংলার জন মানস ও চিন্তার ক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ জনসমাজ মননে ও চিন্তায় মুসলিম সূফী-সাধক ও পীর-দরবেশগণের নিকট থেকে এক অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনাচরনের আদর্শ লাভ করল যা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব ও বিস্ময়কর। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম পীর ফকীরসহ ইসলামের মহিমা ও ঐশ্বর্য অনাড়ম্বরভাবে তুলে ধরায় এবং জনসাধারণের ব্যথা-বেদনা ও বিষাদের অংশ নিজেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করায় বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ অসঙ্কোচে ইসলাম বরণ করে। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়।

সূফী-দরবেশগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের কার্যাবলী শুধু তাঁদের খানকাহর চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁরা জনগণের মনের ও সমাজের উপরও প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আশরাফ সিমনানীর মতে-"In Short in the country of Bengal what to speak of the cities there is no town and no village where holy saints did not come and settle down."[২]

---

১. আল বেরুণী, ভারত বর্ষ, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩, উদ্ধৃত ঃ গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ইং পৃ. ১৯-২০

২. Prof : Hasan Askari, op. cit. p. 36

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচারের যুগে এ দেশে আগমনকারী পীর-দরবেশগণ নীতির ক্ষেত্রে প্রধানত দু'টিভাগে বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে একটি হল আবিদ এবং অপরটি হল মুমিন। আবিদ শ্রেণীর প্রচারকেরা ছিলেন নিরব সাধক এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন আলিম। তাঁরা অহিংস নীতির অনুসারী ছিলেন আর এই অহিংস নীতির মাধ্যমে ইসলামের মূল আদর্শ ও সৌন্দর্য প্রচার করে লোকদের তাঁরা আকৃষ্ট করতেন। কিন্তু মুমিন শ্রেণীর ইসলাম প্রচারকগণ ছিলেন তাঁদের বিপরীত। তাঁরা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ আলিম হয়েও ছিলেন অস্ত্রধারী যোদ্ধা । তাঁরা প্রয়োজনের সময় অমুসলিম শাসক অথবা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে এদেশে ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আমাদের দেশের ইতিহাসে এই শ্রেণীর ইসলাম প্রচারকগণ 'গাযী' হিসেবে অমর হয়ে আছেন।[১]

বিভিন্ন সময়ে দেশত্যাগী সূফী-দরবেশগণ এদেশে আসতেন এবং খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের চারপাশে শিষ্য জড়ো করে শিক্ষাদান করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। যে সকল সূফী এদেশে জন্মেছিলেন ও লালিত-পালিত হয়েছিলেন তারাও একই সাংস্কৃতিক বৃত্তিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এভাবে সূফীগণ মুসলিম সমাজে শাসক শ্রেণী ও আলিমগণের সঙ্গে আরও একটি শক্তির সংযোজন ঘটিয়েছিলেন।[২] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন-"বিভিন্ন সময় শত শত সূফী-দরবেশ ও তাঁদের অনুগামী শিষ্যরা বাংলায় আগমন করেন এবং বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে এমনকি প্রদেশের নিভৃততম কোনে ও ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ধর্মের শ্রী বৃদ্ধি সাধন করেন এবং অতীন্দ্রিয়বাদ ও স্বর্গীয় প্রেমের প্রসার সাধন করেন। এভাবে তাঁরা মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করেন। তাদের আদর্শ চরিত্র, অসামান্য নৈতিক বল এবং দুঃস্থ মানবতার জন্যে তাদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অমুসলমান জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের উদারতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য যা সূফী পুরুষগণ তৎকালীন আদর্শ অনুসন্ধানকারী ও সমাজের নির্যাতিত ও অধঃপতিত মানুষের নিকট তুলে ধরেছিলেন।"[৩] সুতরাং এই সকল আদর্শবান পুরুষের প্রচার কার্য অমুসলমান, বৌদ্ধ ও সমভাবে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণকে ইসলামের স্নিগ্ধ ছায়া তলে আকৃষ্ট করেছিল। তারা নিজেদের মুসলমান বলে আখ্যায়িত করত। আবার সেই সাথে তাঁদের কিছু ধর্মবিশ্বাস ও ক্রিয়া পদ্ধতি অটুট থেকে যেত। অবশ্য নাম বদলে যেত। এ রকম পরিবর্তনের কথাই শূণ্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্মা হযরত মুহাম্মদ (স.) রূপে এবং বিষ্ণু পয়গাম্বর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৪] বাংলায় সত্যপীর পূজার জনপ্রিয়তার মূলে ছিল এই ব্যাপক পরিবর্তন। সত্যপীর কোন নবী ছিলেন না, ওলীও ছিলেন না। সম্ভবত কল্পনা থেকেই তার উদ্ভব। তাকে কেন্দ্র করে পীরসুলভ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে নানা জায়গায় তাঁর দরগাহ দেখা যায় এবং বহু লোক গাঁথায় তাঁর নামের উল্লেখ শুনতে পাওয়া যায়।[৫]

সূফীগণের দরগাহ্গুলোর শুধু অবস্থান যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, সূফীগণ শুধু প্রধান শহরগুলোতেই জড়ো হননি পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম ও সিলেট[৬] থেকে পশ্চিমে মঙ্গলকোট ও পূর্ণিয়া এবং দক্ষিণে বাগেরহাট ও ছোট পাণ্ডুয়া থেকে উত্তরে কান্তাদুয়ার ও রংপুর পর্যন্ত সারাদেশে তাঁরা ছড়িয়েছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁরা জনসাধারণেকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং আজও শতশত

১. মেহরাব আলী, পীর চিহিল গাজী, দিনাজপুর, ১৯৬৮ইং, পৃ. ২
২. আব্দুল করিম, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ১৭৬
৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৪. সিসি.বানার্জি সম্পাদিত, রামাইপন্ডিত, শূন্য পুরাণ, কলিকতা, ১৩৩৫ বাং
৫. ড. আহমদ হাসান দানী, মাহে নও, ১৯৫৩ ফেব্রুয়ারী, পৃ. ৪
৬. আসামের কামরুপ জেলার হাজো তহসিলে গিয়াস উদ্দীনের সমাধি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সূফীগণ আরও পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন। (Assam District gazetteers. Kamrup. 1305. p.101).

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ তাদের দরগাহ্ ও সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসে।[১] এক কথায় বলা যায়, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর-ফকীর ও সূফীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দরবেশগণই বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত মশালবাহী। ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিধর্মীদের মধ্যে সত্য ধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য এই সব পীর-দরবেশ আরব ও মধ্য এশিয়ার দূর-দূরান্তর থেকে সুদূর বাংলায় আগমন করেন। ডঃ এনামুল হকের ভাষায় -"Infact, by the continued activities of the sufis or men imbued with the sufistic idias, Bengal was once so overflooded that the visible effect of that influence can still be marked in many beleifs. Practices, songs and out pourings of the Bengali hearts like the silt deposited on a paddy field after a flood-- From these things we can now only imagine, how vast and deep was the magnitude of the influence of the sufis on Bengal. [২]

এভাবে সর্বশ্রেণীর জনসমাজেই সূফী-দরবেশগণের প্রভাব ছিল অসীম। গলি থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁদের প্রভাব সমভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তৎকালীন সমাজে সূফীবাদ একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সমাজের উদ্ভব ও বিকাশে সূফীগণের অবদান যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন। বাংলায় সূফী-দরবেশগণের অপরিসীম প্রভাবকে নিম্নরূপ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন-

(ক) ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সূফী-দরবেশগণের প্রভাব
(খ) মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তারে সূফী-দরবেশগণের প্রভাব
(গ) শাসক শ্রেণীর উপর সূফী-দরবেশগণের প্রভাব
(ঘ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সূফী-দরবেশগণের প্রভাব
(ঙ) সমাজ জীবনে সূফী-দরবেশগণের প্রভাব

(ক) ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সূফী-দরবেশগণ অবদান

বাংলাদেশের সূফী-দরবেশগণের জীবন ও কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই তাদের আবাসস্থল ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর দৃশ্যস্থান রয়েছে। সর্বত্র তাঁরা তাঁদের চরিত্র ও কাজের প্রভাব রেখে গেছেন। নানাভাবে তাঁরা ইসলাম ও সমাজের সেবা করেন এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁরা এমনকি মুসলিম বিজেতা, সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের অপেক্ষা অধিক স্থায়ী অবদান রেখে যান। আরব, ইরান, ইরাক, মিসর, আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারতের যে সকল পীর দরবেশ আমাদের দেশে এসে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে -"The sufis or pirs played an important role in consolidating Muslim power and infusing culture among the masses. The biographical skecth of the sufis reveal that their activities were confined not only within the four walls of their khanqahs, rather they experted a great influence in the peoples mind and in the society. They come established khanqahs, imparted instructions, while some of them settled and died in this country --- their dargahs and tombs are visited and venerated by hundreds of poeple even today."[৩]

১. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
২. Dr. Md. Enamul Haq, op. cit. p.260-61.
৩. Amiya Kumar Banarjee, West Bengal District Gazeteers (Howrah) Culcutta, 1922. p. 128.

Dhaka University Institutional Repository

সূফী দরবেশগণ এদেশে আগমন করে কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় খানকাহ্ নির্মাণ করতেন, সেখানে তাঁর চতুস্পার্শ্বে ভক্ত ও শিষ্যগণ এসে উপস্থিতি হতেন।এতে শিষ্যদিগকে নানা রকমের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নির্দেশ দেয়া হত। সূফীগণ জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামের যে সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তুলে ধরলেন তা সম্পুর্ণ নতুন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল সাধু-দরশেগণের সাধুতা, নিষ্ঠা, নির্লিপ্ততা এদেশের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে শিষ্যগণ এসে সূফী-দরবেশগণের নিকট উপস্থিত হতেন, তাদের কেউ কেউ পীরের খানকাহ্র নিকটেই ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে বাস করতেন এবং সেখানেই তাদের ইন্তিকাল হত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দরগাহ্গুলোর দেখে মনে হয় আরব, পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশ থেকে আগত সূফী সাধকগণের চতুস্পার্শ্বে যে ভক্তগণ এসে উপস্থিত হতেন তারা কেবল বড় বড় শহর বন্দরেই খানকাহ প্রতিষ্ঠা করে বাস করতেন না তারা দেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল এমনকি তারও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করতেন। ড. আব্দুর রহিম তাই বলেছেন -"Hundreds of sufis came to Bengal in different times from the lands of Islam in western and central Asia as well as Northern India. They belonged to various orders particularly to the Chishtia and Suhrawardia. Though imported from outside, Bengal Proved to be most congenial field for the development of sufism . It spread throughout Bengal even to the remotest villages, so that khanqahs and shirines grew up in every nock and corner of the country. Sufism had prospered so much in the soil of Bengal that several new mystic orders developed on the basis of the teachings of some of the distinguished Bengali Sufis."।[১]

সূফীদের আদর্শ চরিত্র, অসাধারণ নৈতিক বল এবং দুঃস্থ মানবতার জন্যে তাঁদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অমুসলিম জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের উদারতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য যা সূফীসাধকগণ তৎকালীন আদর্শ অনুসন্ধানকারী ও সমাজের নির্যাতিত ও অধঃপতিত মানুষের নিকট তুলে ধরেছিলেন। সুতরাং এ সকল নিষ্ঠাবান আদর্শ সূফীপুরুষের প্রচারকার্য অমুসলিম, বৌদ্ধ ও সমভাবে সকল শ্রেণীর হিন্দুদেরকে ইসলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আকৃষ্ট করেছিল।[২]

হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও তাঁর অনুগামী শিষ্যগণের প্রচেষ্টায় উত্তর বঙ্গের মালদহ্ ও দিনাজপুর জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁরা পাণ্ডুয়া আগমন করলে বিপুল সংখ্যক লোক তাঁদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করে। শায়খ আঁখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হক, তদীয় পুত্র হযরত শায়খ নূর কুতবুল আলম প্রমুখ সূফীগণের প্রচেষ্টায় উত্তর বাংলায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটে। মুরদেশীয় পরিব্রাজক ইবনে বতুতা মতে, সিলেটের অধিবাসীগণ হযরত শাহ জালালের (রহ.) এর ধর্মীয় প্রচারকার্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। একটি লোক সঙ্গীতে উল্লেখ আছে, সিলেটে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান ছিল না। শাহ জালালই সর্বপ্রথম সেস্থানে আযান দেন অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেন।[৩] হযরত শাহ জালালের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সিকান্দার খান গাযী কর্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীহট্টে মুসলমান বিজয় হয়।[৪]হযরত শাহ জালাল (রহ.) ও তাঁর খলিফাগণের প্রচারের ফলেই

১. Dr. Mohammad Abdur Rahim, Social and Cultural History of Bengal, vo.-1. Karachi, 1963. p.76.

২. সি,সি, ব্যানার্জি সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.

৩. ড. এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৩৩৫ বাংলা, পৃ. ৯৮

৪. J.A. S. B. 1922. p. 413.

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট জেলা এবং পার্শ্ববর্তী ভু-ভাগে ইসলাম বিস্তৃত হয়। ইবনে বতুতা বলেন - "এই পাবর্ত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ তার হাতে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে। এ জন্য তিনি তাদের মধ্যে থেকে যান।"[১] উপরন্ত তাঁর অনেক খলিফাই ঢাকা, নোয়াখালী, কাছাড়, রংপুর ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। কথিত আছে যে, জেলা চব্বিশ পরগণার পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরাচাঁদ তাঁর খলিফা ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে সুন্দর বন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হন। তাঁর মাযার জেলা ২৪ পরগণার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে আছে।[২]

খুলনা ও যশোরে মুজাহিদ দরবেশ খানজাহান আলীর প্রচেষ্টায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। এই দুই জেলায় ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী আদর্শ প্রচারে তাঁর কর্মতৎপরতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তিনি এই অঞ্চলে তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের প্রেরণ করে ইসলাম প্রচারের সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, দূরদর্শিতা ও আদর্শ চরিত্র মাহাত্মে এ অঞ্চলের বিধর্মীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় ও অকৃত্রিম ভক্তে পরিণত হয়।[৩]

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চলে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে মুসলমানদের দ্বারা বির্জিত হয়। তথাপি এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান এটা কীভাবে সম্ভব হলো ? ড. আব্দুর রহিম বলেছেন - " বাস্তবিক এটা ছিল মুসলমান সূফী দরবেশগণের অমর কীর্তি, তাঁরা এই অমুসলমান অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে ইসলামের ধর্মবিশ্বাস লোকদের মধ্যে বিস্তার করেন। স্থানীয় জনপ্রভাব এই মহান দরবেশগণের কীর্তিরাজিতে উজ্জ্বল। ইতিহাস সম্মত সঠিক প্রমাণের অভাবে এই সব কিংবদন্তির অনেক বর্ণনাই হয়তো গ্রহণ করা কঠিন, তবুও এগুলোতে বাংলার বিভিন্ন এলাকার সূফী দরবেশগণের ব্যাপক ধর্ম প্রচার মূলক কার্যাবলীর প্রতিফলন দেখা যায়।"[৪]

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাবে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কবি কৃত্তিবাসের মতে, মুসলিম প্রভাব এতবেশী বৃদ্ধি পায় যে, সংমিশ্রণের ভয়ে পূর্ব বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ তাঁদের পৈতৃক ঘরবাড়ী ত্যাগ করেন। তিনি লিখেছেন যে-"তাঁর পূর্ব পুরুষ নরসিংহ ওঝা, যিনি সোনারগাঁয়ের দনুজমর্দন দেবের একজন সভাসদ ছিলেন, (ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে) তিনিও ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন।[৫]মুসলমানগণ সোনারগাঁও অঞ্চল জয় করেন ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাহলে কীভাবে সে সময় ঐ অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, সংমিশ্রণের দ্বারা ব্রাহ্মণরা তাদের জাত ও কৌলিণ্য হারাবার মতো অবস্থার সম্মুখীন হয় ? এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বিজয়ের বহু পূর্বেই পূর্ব বঙ্গে ইসলামের অগ্রগতি হয়েছিল। মনে হয় এই অগ্রগতির মূলে আরব বণিকগণ বা অন্যান্য ধর্ম প্রচারকগণ যারা চট্টগ্রাম ও উত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গে আগন করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের সপ্তদশকে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে খানকাহ্ ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল রহিমের মন্তব্য উল্লেখ করার মত।

---

১. ড. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ঢাকা-১৯৬৩ ইং, পৃ. ৯৯
৩. ড.কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৬১ইং, পৃ. ২০৩
৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৫. কৃত্তিবাস, রামায়ণের ভূমিকা আত্মকথা
"পূর্ব্বেতে আছিল শ্রীদনুজ মহারাজা
তার পাত্র আছিল নারসিং ওঝা॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গ ভোজো ভূঞে তিহ সুখের সংসার॥
বঙ্গ দেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গ দেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥"

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন-"Sonargaon was a lively seat of learning from the later year of the thirteenth century. It began under the propitious patronage of the renowned scholar Maulana Sharf-al-Din Abu Tawwama. Maulana Abu Tammana founded this seminary of advanced learning and devoted his life to teaching at his place. His renown as a scholar attracted sutdents from far and near."[১]

এই এলাকায় মুসলমানদের জন্য এমন একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায়, এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, শায়খ আবূ তাওয়ামার সোনারগাঁয়ে আগমনের পূর্ব থেকেই সেখানে মুসলিম অধিবাসী ছিল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে সোনারগাঁয়ে মুসলিম জনসংখ্যার অস্তিত্ব সূফী-দরবেশগণের প্রচারমূলক কার্যাবলীরই ফলশ্রুতি।

(খ) মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তারে সূফী-দরবেশগণের প্রভাব

ইসলামের প্রচার ও প্রসার ছাড়াও বাংলাদেশের মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তৃতি ও মুসলিম রাষ্ট্রের সংহতি বিধানে সূফী সাধকগণের অসামান্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী যখন বাংলার মুসলিম রাজক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করেন তখন তার অধিকৃত ভূ-খন্ডের বিস্তৃতি বেশি ছিল না। তাঁর অধিকৃত ভূ-খন্ডের সীমানা ছিল উত্তরে দেবকোট, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে তাঁর অধিকৃত বিহার প্রদেশ। এর মাঝখানে লাখনৌতি ছিল তার রাজধানী। পরবর্তী দুই শতাধিক বৎসরের মধ্যে মুসলিম শাসকগণ সমগ্র উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করতে সমর্থ হন। লক্ষণীয় বিষয় হল এ বিজয়ের কৃতিত্ব কেবলমাত্র শাসকগণের ছিল না, বরং এ বিজয়ের কৃতিত্ব অনেকাংশে সূফী-দরবেশগণেরও প্রাপ্য। কিংবদন্তি ও পরবর্তীকালের রচনাবলীতে কিছু কিছু সূফীদের স্থানীয় অমুসলিম রাজাদের বিরুদ্ধে হয় নিজেরাই অথবা মুসলিম শাসকগণের সহযোগিতায় যুদ্ধ করার কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সাধারণত এ সব বিবরণের প্রাসঙ্গিক দিক কল্পকাহিনী বলে মনে হলেও মূলবিষয় অর্থাৎ এ সব সংঘর্ষে সূফীদের অংশ গ্রহণকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়। ড. আব্দুল করিমে মতে, "সুফি বা সাধারণ মানুষ যাই হোক না কেন অন্তর্গামী মুসলমানদের সঙ্গে স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশের বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীদের সংঘর্ষকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এটা ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে শান্তিপূর্ণ কার্যাবলী, সরল জীবন এবং খোদাভক্তি দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের শান্ত বা প্রভাবিত করতে সুফিদের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল, তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে সুলতানদের সঙ্গে কোন কোন সুফির সহযোগিতার বিষয়টিও সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়া যায় না, কারণ তাঁরা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করাকে জিহাদ (ধর্ম যুদ্ধ) বলে মনে করতেন, যার অনুমোদন ইসলামী আইনে রয়েছে।"[২]

ক্ষেত্র বিশেষে কখনও কখনও সূফীগণ প্রতিকুল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন আবার যুদ্ধে তাঁরা শহীদও হয়েছেন। তাঁরা নিজেরাই ইসলামের স্বার্থে লড়াই করেছিলেন। সিলেট বিজয়ে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌র সেনাপতির সঙ্গে শাহ্ জালালের সহযোগিতা, চাটিগ্রাম বিজয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্‌র সঙ্গে শাহ্ ইসমাইল গাজীর সহযোগিতাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা যায়। অন্য দিকে আবার দেখা যায় যে বাস্তবে সৈনিক বা বিজয়ীদের (সম্ভবত তাদের মৃত্যুর পর) দরবেশ আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের সমাধি পবিত্র স্থান বা দরগাহ্‌র মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন খুলনার বাগেরহাটের

১. Dr. Mohammad Abdur Rahim, op.cit. p. 289.

২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

খানজাহান আলীর দরগাহ্ । তিনি ছিলেন নাসির উদ্দীন মাহ্মুদ শাহ্র আমলের (১৪৪২ - ১৪৫৯ খৃ.) একজন কর্মচারী ও ঐ অঞ্চলের বিজেতা।[১] রুকনুদ্দীন কাইকাউস (১২৯১-১৩০১ খৃ.) এবং শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্র আমলে (১৩০১- ১৩২২ খৃ.) জাফর খান গাজী ত্রিবেণী অঞ্চল জয় করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি ঐ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত দরবেশ হিসেবে পরিচিত।[২] দরবেশগণের কেউ কেউ বঙ্গ দেশে ধর্মের শাসন সীমা বিস্তৃত করতে এবং ছোট ছোট হিন্দু রাজা ও জমিদারদের এলাকায় বসবাসকারী মুসলমান প্রজাদের দুঃখ-দূদর্শা মোচন করতে মুসলমান শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের সঙ্গে যোগদান করতেন। মুসলমান সৈন্যদলে সূফী-দরবেশগণের উপস্থিতির ফলে সৈন্যদের মধ্যে বিপুল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের সঞ্চয় হয়। ফলে নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে মুসলমান সৈন্যরা অমুসলমান সেনাদের উপর বিজয়ী হয়।[৩] প্রাথমিক কয়েকজন সূফী কে ইসলামের সৈনিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁদের মধ্যে ঢাকার রামপালের বাবা আদম শহীদ[৪] রাজশাহী তুর্কান শহীদ,[৫] শাহযাদপুরের মাখদূম শাহ্ দৌলা শহীদ,[৬]মহাস্থানের গাযী শাহ্ সুলতান মাহী সাওয়ার[৭]এবং রাজশাহীর মাখদূম রূপোশ[৮]এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের আগমন তারিখ নির্ধারণ করা না গেলেও কিংবদন্তি হতে মনে হয় যে, তারা তদানীন্তন মুসলিম সীমান্ত অঞ্চলে অমুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ত্রিবেণী শাহ সফি উদ্দীন, সিলেটের শাহ জালাল এবং চট্টগ্রামের বদরশাহ্র মত অন্যান্যরা নিশ্চিতভাবেই সে সব অঞ্চল জয়ের জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। শাহ্ ইসমাইল গাযীও মুসলিম সুলতানের সেনাপতি হিসেবে মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। একটি জনপ্রবাদ অনুযায়ী একজন হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন সূফী-দরবেশ শাহ্ মাহমুদ গজনবী। বাংলার বিভিন্ন অংশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের সূফী-দরবেশগণের এ রকম আরও বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তাঁরা জিহাদ ও পরবর্তী জগতের শহীদের মর্যাদা লাভের চেতনায়ই অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলেন। স্যার হ্যামিল্টন গীবের বরাত দিয়ে ডঃ আব্দুল করিম বলেছেন-"পীর গাজী বা ধর্মযোদ্ধা এবং চতুর্দশ শতাব্দীর সুফিদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, আরবি রিবাত শব্দটি আদিতে মুসলমান সীমান্ত বরাবর যুদ্ধরত গাজীতে পরিপূর্ণ দুর্গ বা সুরক্ষিত সীমান্ত (আক্ষরিক অর্থে ক্ষুদ্র ফাঁড়ি) বুঝাত। পরে এটা সুফিদের কাছে ধর্মীয় জীবন-যাপনের জন্য ভক্তদের একত্রিত হওয়ার স্থান অর্থে দেখা দেয়। (ফার্সি খানকাহ্র সমর্থক) এ বিকাশ কাকতালীয় নয়, কারণ ইসলামের ইতিহাসে প্রাথমিক যুগে গাজীদের যোদ্ধা জীবন ইসলামের অভ্যন্তরে তপস্যাও আধ্যাত্মবাদী আন্দোলনের উদ্ভবের সঙ্গে সাময়িকভাবে বিশেষ গিয়েছিলেন। গীব লিখেছেন যে, মুসলমানদের প্রাথমিক কঠোর তপশ্চর্যা নরকের ভয় দ্বারা প্রভাবিত ছিল। জিহাদে মৃত্যুবরণই স্বর্গের একমাত্র নিশ্চিত ছাড়পত্র হওয়ায় প্রাথমিক যুগে এমন হয়েছিল যে, তপবাদীরা সীমান্ত যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন। রিবাতের মত জিহাদ শব্দটিতেও এ বিকাশের প্রতিফল ঘটেছে। প্রাথমিক সূফীগণ জাগতিক প্রলোভনের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক যুদ্ধকে বুঝাতেও শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ইসলামের সীমান্ত স্থিতিশীল হয়ে গেলে সুফিরা ক্রশম সীমান্ত যুদ্ধ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন।[৯]

১. J.A.S.B. 1867. p. 135.
২. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত,পৃ. ১২১-২২
৪. JASB. vol. LVII. pp. 18-19
* জে এন গুপ্ত, বিক্রমপুর ইতিহাস, পৃ. ৪৬
৫. দ্রষ্টব্য ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, সূফী বাদ ও আমাদের সমাজ, পৃ. ১৭০-৭১
৬. JASB. vol. iii. 1904, pp. 260 - 67.
৭. ড. এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ১৪০ - ৪১
৮. দ্রষ্টব্য. সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, পৃ. ১৭১- ৭২
৯. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮ - ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

(গ) শাসন কর্তৃপক্ষের উপর সূফী-দরবেশগণের প্রভাব

বাংলাদেশের সূফী-সাধকগণ বিভিন্নভাবে শাসন কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। তাঁরা অনেক সময় এ দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতেন এবং কখনও কখনও বাদশাহ্‌দের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের উপর তাঁদের উপর প্রভাব খাটাতেন। ইসলামে যেহেতু পেশাদার ধর্ম প্রচারকদের কোন ব্যবস্থা নেই সেহেতু ধর্মীয় কর্তব্যবোধের তাগিদেই দরবেশগণ দেশের সর্বত্র ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তারা ইসলামের জন্য মানব কল্যাণমূলক কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের নিকট তাঁরা পুণ্যাত্মা হিসেবে প্রতিভাত হতেন। মানব সেবাকেই তারা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেম রূপে বিবেচনা করে থাকেন। মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী বলেছেন-"মানুষের চিত্ত জয় করাই মহোত্তম তীর্থযাত্রা এবং একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও শ্রেয়ঃ। কাবা তো কেবল ইব্রাহিমের গৃহ কিন্তু হৃদয়ই হচ্ছে আল্লাহ্‌র একমাত্র বাস।"[১] ধর্ম প্রচার ও মানবকল্যাণকর কার্যাবলীর এই সমুদয় আদর্শ নিয়েই তাঁরা ইসলাম প্রচার করতেন। "বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলমান বিজেতা এবং শাসকগণও কৃতিত্বের অংশীদার। এ ব্যাপারে তাঁদের কৃতিত্ব সূফী-দরবেশদের তুলনায় ততটা তাৎপর্য পূর্ণ না হলেও উল্লেখযোগ্য। বহুক্ষেত্রে তাদের কার্যাবলী সেই সব মহান আধ্যাত্মিক সাধকদের কার্যের পরিপুরক ছিল। পীর-দরবেশ দের ধর্মীয় কার্যাবলী বাংলার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয়ে এবং প্রদেশে মুসলমান শাসন সংহত করণে সাহায্য করেছে; মুসলিম বিজেতা ও শাসনকর্তাগণ তাদের মহান ব্রতের অগ্রগতির জন্য নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন। ধর্মান্তরিত লোক সংগ্রহে এবং ধর্মের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ সৃষ্টিতে বাস্তবিকই রাজকীয় শক্তির সহযোগিতা ও সমর্থন মর্ধীয় নেতাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছিল। ধর্মের প্রতি শাসনকর্তাগণ নিজেরা অনুরক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতই তাঁরা তাঁদের নিজনিজ এলাকায় এর উন্নতি বিধান করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে মুসলমান সম্প্রদায় বাংলাদেশে শক্তিশালী থাকলে তা প্রদেশে মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে একটা সমর্থনের উৎস হবে এবং একে শক্তি জোগাবে। সুতরাং তারা উলামা ও পীর-দরবেশগণকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন এবং ইসলামের উন্নতিকল্পে তাদেরকে সমর্থন দান করতেন।"[২] অনেক স্থলে সূফীগণ বংশ পরম্পরায় ইসলাম প্রচারে জান-মাল কুরবান করাকে জীবনের পরম পাওনা বলে মনে করতেন। তবে বহু স্থানে তাদের নিজেদের জীবিকা বা পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের চিন্তা করতে হত না। মুসলিম শাসক ও সুলতানগণ স্বেচ্ছায় সে ভার বহন করতেন। সূফীদের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে সুলতানগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, ও খানকাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় উপদেশ দান, শিক্ষা প্রচার ও সূফী বিদ্যা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করেন। সুলতানগণের ন্যায় তাদের আমীর উমারাও সূফী-দরবেশ প্রিয় ছিলেন এবং বহু স্থানে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ্‌ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী শায়খদের জন্য অনেক খানকাহ্‌ নির্মাণ করেন এবং তাঁর সহচরবৃন্দও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।[৩]

১. উদ্ধৃত ঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত - পৃ. ৬৯
২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৩. তাবাকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

মিনহাজের মতে, গিয়াস উদ্দিন আওয়াজ খিলজী পীর-দরবেশ দের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সূফী-দরবেশগণকে বৃত্তি ও ভাতাদানের ব্যাপারে আওয়াজ খুব উদার ছিলন। যেমন-তাঁর শাসনামলে খ্যাতনামা আলিম ও ধর্ম প্রচারক মাওলানা জালালুদ্দীন গজনবী লক্ষণাবতীতে আগমন করেন। আওয়াজ খিলজী তাঁকে দরবার কক্ষে একটি ভাষণ দানের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। বক্তৃতা শেষে তিনি তাকে প্রায় দু'হাজার তংকা উপহার দেন এবং আমির, মালিক, মন্ত্রী ও অনান্যদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা উদারভাবে উপহার দিয়ে মাওলানাকে সম্মানিত করেন। এভাবে মাওলানা তিন হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লাভ করেন। মিনহাজের ভাষায়- "লক্ষণাবতী থেকে মাওলানা স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালে আরও অতিরীক্ত পাঁচ হাজার মুদ্রা উপহার হিসেবে সংগৃহীত হয়। এভাবে উদার প্রকৃতির এই খ্যাতনামা সুলতানের দৃষ্টান্তধর্মী ধর্মানুরাগের ফলে সেই ইমাম ও ইমামের পুত্র মাওলানা জালালুদ্দীন দশ হাজার মুদ্রা অর্জন করেন।"[১]

সুলতান বলবনের সময়ে, বাংলা শাসনকর্তা মুগীস উদ্দিন তুগ্রিল পীর-দরবেশগণের প্রতি এত বেশী অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের দরবেশগণকে তিন মণ স্বর্ণ দান করেন।[২] ইবনে বতুতার মতে-ফকির ও সূফী-দরবেশগণের প্রতি ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্‌র গভীর ভক্তি ছিল। তিনি বলেন, "ফকিরদের প্রতি ফখরুদ্দীনের এতবেশী ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি সৈয়দানা নামে একজন কলন্দর দরবেশকে সাদকাওয়ানে (চট্টগ্রামে) তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তিনি ফকিরদের ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করেন এবং ঐ ভ্রমণকালে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন।[৩] সুলতান ফখরুদ্দীন নির্দেশ দেন যে, নদী পথে ফকিরদের নিকট থেকে কোনরূপ ভাড়া নেয়া হবে না এবং যাদের নিকট কোন কিছুই নেই তাদেরকে ভ্রমণপথে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ্‌ করতে হবে। যখন কোন ফকির গ্রামে আগমন করেন, তখন তাঁকে দিনার দেয়া হবে।[৪]

রাষ্ট্র ও সুলতানদের প্রতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূফীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিভিন্ন রকম। সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তাঁরা সুলতান ও যুবরাজদের নিকট হতে উচ্চ পদ ও ধনদৌলত গ্রহণ করতেন। অপর দিকে চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ দরবার ও সুলতানদের নিকট থেকে দূরে থাকতেন এবং তাদের প্রতি উদাসীন ছিলেন। রাষ্ট্র প্রদত্ত কোন উপহার বা উচ্চপদ গ্রহণ করতেন না। সে যাই হোক, দিল্লীর সুলতানগণ সূফীদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কোন সূফী দরবেশ দিল্লী আগমন করলে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে রাজধানীর বাইরে চলে আসতেন। বলবন এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মত শক্তিশালী সুলতানগণও সমসাময়িক দরবেশগণের প্রতি অনুগত ছিলেন।[৫]

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ পীর-দরবেশগণকে খুব সম্মান করতেন। গোরক্ষপুর অঞ্চল বিজয়কালে তিনি বাহ্‌রাইনে অবস্থিত শায়খ মাসউদ গাযীর মাযার যিয়ারত করেন। সে সময় তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি তিনি দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন তাহলে তিনি শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ যিয়ারত করবেন এবং এই বিখ্যাত দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যখন সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌ সুলতান ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলকের সৈন্য বাহিনী কর্তৃক 'একডালা' দূর্গে অবরুদ্ধ হন, সে

১. তাবাকাত -ই- নাসিরী, পৃ. ১৫৮
২. জিয়াউদ্দীন বারণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৩. N.K. Battasali Ibn Battuta, Coins and Chronology, etc. P. 136 - 40.
৪. N.K. Battasali, op. cit. p. 140.
৫. K.A. Nizami, Some Aspects of Religion and Palitics in India in the thirteenth Century. p. 240 - 48.

Dhaka University Institutional Repository

সময় পাণ্ডুয়ায় শায়খ রাজা বিয়াবাণী মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ্ এই দরবেশের খুব অনুরক্ত ছিলেন। দরবেশের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইলিয়াস শাহ্ ফকিরের ছদ্মবেশে 'একডালা' দূর্গ থেকে বের হয়ে আসেনএবং নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি প্রিয় শায়খের জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন।[১]

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ সূফীদেরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। তিনি তাঁর বাল্য বন্ধু শায়খ নূর কুতবুল আলমকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতেন। জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ সূফী দরবেশগণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সোনার গাঁয়ে নির্বাসিত দরবেশ শায়খ যাহিদকে পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রায়ই তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন। বাংলার আফগান শাসক সুলায়মান কররানী ১৫০ জন শায়খ ও আলিমের সঙ্গে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় কাটিয়ে দিতেন।

মুসলমান সভাসদবর্গ ও কর্মচারীগণ শায়খদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে শাসন কর্তা ও সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। পীর দরবেশগণের মাযার যিয়ারতের ব্রত গ্রহণ করা তাদের মধ্যে খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। তাঁরা পীর-দরবেশদের মাযারে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন এবং তাদের দরগাহ্ ও লঙ্গরখানা সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাখেরাজ জমি ইত্যাদির সংস্থান করতেন।

প্রথম যুগের মুসলমান শাসকগণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। তাদের কেউ কেউ শরীআতী শাসন কায়িমের জন্য বেশ সচেতন ছিলেন। ইসলামী আইনের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধার ফলে একজন সামান্য নারী বা পুরুষ এমনকি একজন শক্তিশালী সুলতানের বিরুদ্ধেও নালিশ করতে পারত এবং অধিনস্থ কর্মচারী কাযী সুলতানকে পর্যন্ত একজন সাধারণ আসামীরূপে বিচারালয়ে ডেকে পাঠাতে পারতেন। কথিত আছে যে, একদা সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ যখন তীর নিক্ষেপের অভ্যাস করছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে একটি তীর এক বিধবা মহিলার পুত্রের শরীরে বিদ্ধ হলে সে মারা যায়। পুত্রহারা মা কাযীর দরবারে সুলতানের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করে। কাযী সুলতানকে ডেকে পাঠালে সুলতান একজন সাধারণ আসামীর মত কাযীর দরবারে উপস্থিত হন। কাযী সাধারণ অপরাধীর মতই সুলতানের বিচার করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এতে সন্তানহারা মা সন্তুষ্ট হয়ে আইনানুমোদিত কিছু স্বর্ণ গ্রহণ করে সে সুলতানকে ক্ষমা করে দেয়। শরীআতের অনুশাসন বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের জন্য সুলতান কাযীর প্রশংসা করেন এবং তাঁকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করেন।[২]

বাংলার মুসলিম শাসকগণ তাদের ধর্মনিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব এবং শরীআতের অনুশাসনের প্রতি বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ধর্মীয় চরিত্রের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। সুলতান ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতেও নেতৃত্ব দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতেন। তারা মক্কা মদীনার পবিত্র শহরগুলোতে নিয়মিতভাবে উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করতেন এবং হজ্জ পালনের জন্য লোকদেরকে সুযোগ-সুবিধা দান করতেন। আয়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরীর শিষ্য মুযাফফর শামস বলখীর অনুরোধে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ সূফীদের হজ্জের জন্য কয়েকখানি জাহাজের ব্যবস্থা করতেন। এ সব জাহাজ হজ্জযাত্রীদেরকে চট্টগ্রাম থেকে আরবে নিয়ে যেত। সুলতানের নিকট একটি পত্রে মুযাফফর শামস লিখেন-"এখন হজ্জের মৌসুম আসছে; মক্কায় যাবার উদ্দেশ্যে গরীব -দরবেশগণের একটি দল আমার নিকট জমায়েত

১. গোলাম হুমায়ন সলীম, রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃ. ৯৭.

২. গোলাম হুমায়ন সলীম,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-৮

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে; তাদেরকে প্রথম জাহাজেই জায়গা দানের নির্দেশ দিয়ে চাটগাঁয়ের কর্মচারীদের নিকট অনুগ্রহ পূর্বক একটি ফরমান জারি করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।"[১]

মুসলমান শাসকগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলাতে তাঁদের ধর্মীয় আবেগ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। আমির-উমারা, রাজকর্মচারীগণ এবং এমনিক অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ সুলতানদের এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেন। অসংখ্য মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বহু শহর ও গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে।

১৩৬৪-৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুলতান সিকান্দার শাহ কর্তৃক পান্ডুয়ার আদিনায় নির্মিত বিরাট মসজিদটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাড়ে সাতান্ন ফুট দীর্ঘ এবং দুইশত সাড়ে পঁচাশি ফুট প্রস্ত। বিশাল চিত্তাকর্ষক মসজিদটি এ উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ভবন। আদিনা মসজিদটি সুলতান সিকান্দার শাহের আবেগের মূর্ত প্রতীক এবং বিরাট জামাতের নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদের সংহতির জন্য তার আগ্রহের বাহ্যিক প্রকাশ।[২]

মুসলমান শাসক ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অনেকেই যেমন ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তেমনি তাঁরা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহীও ছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্[৩] ও শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্ এদের প্রত্যেকের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল। একটি উৎকীর্ণ লিপি সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ্ শাহকে এ যুগের একজন বড় আলিমরূপে উল্লেখ করে। তিনি কুরআনের ব্যাখ্যায় পান্ডিত্য প্রদর্শন করেন এবং ধর্মীয় জ্ঞানে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করেন।[৪]মুসলমান শাসক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ মুসলমানদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও এদের উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। মিনহাজ বলেন, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার লক্ষণাবতীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৫] সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে কাযী আল নাসির মুহাম্মদ ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।[৬] জাফর খান কর্তৃক ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে আর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি 'দারুল খায়রাত' নামে পরিচিত হয়।[৭]

সুতরাং দেখা যায় যে, মুসলমান শাসকদের প্রতি সূফী-দরবেশগণের ব্যাপক প্রভাব ছিল। তাঁরা দরবেশগণের ভরণ-পোষণের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি দান করতেন এবং তাঁদের কার্যকলাপে সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধার জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ প্রভৃতি নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করতেন। এ সব মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা নিয়ে এক একটা বিশালায়তন ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত, যেখানে শিক্ষার্থী ও দুঃস্থ মানুষের জন্য থাকত, শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা, থাকত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আয়োজন। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় যখন সূফী দরবেশগণ ছড়িয়ে পড়লেন এ সব মানব কল্যাণ মুখী প্রতিষ্ঠানেও তখন সারাদেশ ছেয়ে গেল। কোথাও বিশালায়তন এ সব বহুমুখী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে রূপ নিত, কোথাও তা হত মহাবিদ্যালয়ের অনুরূপ।[৮]

---

১. গোলাম আলী আযাদ, খাজিনাহ্ -ই-আমিরাহ্ কানপুর, ১৯০০ ইং পৃ. ১৮৪
২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৩. Inscription in JASB. 1870. p. 290.
৪. J.A.S.B. 1873, p. 282-286.
৫. তবাকাতে নাসিরী, পৃ. ১৫১
৬. .Inscriptionin in Epigraphia Indo- Maslemica, 1917. p. 13.
৭. Inscription. JASB. 1874- p. 303.
৮. আসকার ইবনে শাইখ, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ইং, পৃ. ২২৪ - ২৫

Dhaka University Institutional Repository

এসব প্রতিষ্ঠান বংশ পরম্পরায় সূফী দরবেশগণের প্রচারে কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তাঁদের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় ইসলাম সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং সুলতানদের দরবেশ ও আলিম প্রীতিই এদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম বিস্তৃতির প্রধান কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেছেন-"যে সকল কারণে দরবেশগণের এহেন প্রভাব সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে মুসলমান নরপতিদের দরবেশ প্রীতিই প্রধান। মুসলমান রাজত্বের সময় এই দেশের কোন পেশাধারী ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু বিদেশী ও দেশী দরবেশ সম্প্রদায় এবং 'মৌলানা' ও 'মৌলভী' আখ্যাধারী উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানগণ, মুসলমান রাজত্বের এই অভাবপূর্ণ করিয়াছিলেন। --- বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান সুলতান এক একজন মহাদরবেশ ভক্ত বা শিক্ষাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গীয় দরবেশগণ ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই দেশীয় মুসলমান নরপতিদের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ফলে তাহারই জন্য এই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক শাসন ও ব্যবস্থায় তাহাদের যেমন হাতছিল তেমন ভারতের আর কোন প্রদেশে ছিল কিনা তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। ------ মুসলমান বাদশাহ্ ও দেশের আমির-উমরাগণ ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা দেশে যে সকল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এক একটি বংশ পম্পরাগত প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হইয়া গেল। যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই আশ্রমগুলি হইতে চতুপার্শ্ববর্তী স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচারিতও হইয়াছে। এইরূপভাবে সংস্কার মুক্ত ও উদার দরবেশগণের প্রচারের ফলে দেশের সর্বত্র ইসলামের মত একটি বিদেশীয় চিন্তাধারা ও ধর্ম পদ্ধতি বাংলার ঘরে ঘরে আবর, পারস্য, সমরকন্দ ও বোখারার প্রতিধ্বণী তুলিয়াছিল।"[১]

সুতরাং দেখা যায় যে, বাংলায় সুলতান ও সূফীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এর ভিন্নতর চিত্রও পাওয়া যায়। এমনও দেখা যায় যে সূফীগণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সুলতানদের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণকে তারা প্রভাবিত করতে চেস্টা করেছিলেন। আবার মাঝেমাঝে সুলতানগণও কোন কোন সূফীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সর্ব প্রথম এর শিকার হন শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা। সাধারণ লোক থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বস্তরের লোকজন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হওয়ায় সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন শংকিত হয়ে পড়েন এবং রাজ্য কেড়ে নেয়ার ভয়ে আবূ তাওয়ামাকে সোনার গাঁয়ে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেন।[২]

সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-৯২ খৃ.) শায়খ আলাউল হককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও এক পর্যায়ে তার শ্রদ্ধেয় শায়খকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন। কেন তিনি নির্বাসনের শিকার হলেন ? কারো মতে, দরবেশের বদান্যতা ও জনপ্রিয়তায় ইর্ষান্বিত বা শঙ্কাগ্রস্ত হয়েই সুলতান তাঁকে নির্বাসনে পাঠান।[৩]

তবে এটাকে যথেষ্ট কারণ বলে মনে হয় না। ড. আব্দুল করিম যুক্তি দিয়ে বলেছেন -"গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক মতভেদ বিশেষ করে অমুসলিম কর্মচারীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ বিষয়ে মতভেদই নির্বাসনের প্রকৃত কারণ।"[৪] কেননা এরূপ নীতির ফলেই সাময়িকভাবে হলেও রাজা গণেশের গৌড়ের সিংহাসন দখল করা সম্ভব হয়েছিল। সুলতান সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্কে (১৩৯২-১৪১০ খৃ.) বিহারের সূফী মাওলানা মুযাফফর শামস বলখী যে সকল পত্রাদি লেখেন তাতে

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৩. শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, আখবারুল আখিয়ার, দিল্লী হি. ১৩৩২, পৃ. ১৪৩
৪. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। পত্রের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন-" ------ সংক্ষেপে বলতে গেলে কুরআন মাজীদের তাফসীরকারগণ বলেন যে, মুমিনগণের কখনও উচিত নয় যে অমুসলিম ও অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ এবং মন্ত্রণা দাতারূপে গ্রহণ করে।[১] এ সব থেকে মনে হয় সুলতান সিকান্দার শাহ্, সুলতান ইলিয়াস শাহ্ ও তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ রাজনৈতিক সুবিধা হিসেবে অনুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতেন এবং সম্ভবতঃ সুলতান সিকান্দার শাহের সঙ্গে শায়খ আলাউল হকের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যই তার নির্বাসন দন্ডের কারণ। তাই ড.আব্দুর রহিম যথার্থই বলেছেন-"সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামী নীতির সমর্থক ছিলেন। সাধারণত তাঁরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের দিনে তাঁরা কখনও নির্বিকার থাকেননি। বাংলায় ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ রাজ কার্যে অধিক সংখ্যায় হিন্দুদের নিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদও তাদের উপর ন্যাস্ত করেন। এ ধরনের জাতীয় নীতি অনুসরণ করে তাঁরা উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিলেন।-----কিন্তু ঐ সময়ের দরবেশ ও উলেমা রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ অসমীচীন মনে করেন। শেখ আলাউল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে এ ধরনের নীতি অনুসরণের মধ্যে বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্যে বিপদের সম্ভাবনা নিহিত আছে। সেজন্য শেখ আলাউল হক সুলতান সিকান্দার শাহের নিকট এ সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু সুলতান তাঁর কথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেননি। উপরন্তু পান্ডুয়া অধিবাসীদের উপর শেখের বিরাট প্রভাবে শংকিত হয়ে তিনি তাঁকে সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত করেন। পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে শেখ আলাউল হক রাষ্ট্রীয় নীতির পর্যালোচনায় সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ছিলেন। যদি সুলতান সিকান্দার শাহ্ শেখের পরামর্শ গ্রহণ করতেন তাহলে রাজা কংসের মাধ্যমে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন মুসলমানদেরকে যে দূর্ভোগ ভোগ করতে হয় এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ যে বিপদের সম্মুখিন হয় তা শুরুতেই এড়ান যেত।"[২] হিন্দুদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করার মত নির্বূদ্ধিতায় সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে পরামর্শ দেয়া শায়খ তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু সুলতান সেদিকে কর্ণপাত করেননি। ফলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের খুব দুর্ভোগে পড়তে হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্র এক মহাবিপদে পতিত হয়। হযরত নূর কুতবুল আলমের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে মুসলিম রাষ্ট্র এই বিপদ থেকে মুক্তি পায়। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানগণ হয়ত এ রকম উদারনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এর ফলে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান এবং উলামা-দরবেশেগণের উপর তাঁর অকথ্য উৎপীড়ন নির্যাতনে বিচলিত হয়ে শায়খ নূর কুতবুল আলম রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি এই সংকটাপন্ন অবস্থা হতে মুসলমান ও মুসলিম রাষ্ট্রকে উদ্ধারের জন্য জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শার্কীকে অভিযানের জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি সৈয়দ সিমনানীকেও ইবরাহীম শার্কীর নিকট পত্র লিখে বঙ্গীয় মুসলিমদের সাহায্যের জন্য আসতে অনুরোধ করার জন্য বলেন। ফলে ঘটনাক্রমে মুসলিম বাংলার পুণরুদ্ধার সম্ভব হয়।[৩] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ প্রসঙ্গে বলেছেন-"The saints also saved the Muslim states and Society in times of crisis. Traditions have preserved a few instances where the saints stood for the as the guardians of the muslims in theirs misfartunes and calamities. By their great spiritual and moral force they stopped

১. Journal of the Bihar reaserch society, part-42, vol-ii,1956, p. 8.
২. Dr. Mohammad Abdur Rahim, op. cit. p. 143.
৩. Prot. Hasan Askari, op.cit. pp. 35-36.

Dhaka University Institutional Repository

persecution of the Hindu chiefs or the muslims of their territories. To save the muslims they even took up arms where moral persecution was of no avail. Hajrat Nur Qutb Alam saved the Muslim state and society in Bengal from a great catastrophe.--- At this crisis, Nur Qutb Alam, who led the life of a holy man. could not remain indifferent to the fate of the muslim community and state. He exerted himself to close the differences of the muslims and unites them to a common cause. The saints stood as champions of Islamic policy in the administration of the muslim state in Bengal."[১]

সুতরাং দেখা যায় যে বাংলার সূফী সাধকগণ কেবল ইসলামই প্রচার করেননি। ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণে দেশের রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে রাজনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপও করেছেন। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রে সংহতি রক্ষা পায়। তাই ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন-"বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের সংহতির ক্ষেত্রেও সূফী দরবেশগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিকই মুসলমান সেনাপতিদের সামরিক ও ভৌগোলিক বিজয়ের সঙ্গে সূফী-দরবেশগণ ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারী ও শিষ্য সংগ্রহ করে নৈতিক বিজয় যুক্ত করেন এবং এভাবে একটি অমুসলিম দেশে মুসলিম রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও শক্তির উৎস প্রদান করেন। সাধু দরবেশগণের নিরব সাধনা ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র সামান্য সংখ্যক সৈন্যদের উপর নির্ভর করে বিপুল সংখ্যক ভিন্ন ধর্মীয় অধিবাসীদের উপর প্রভূত্ব বজায় রাখা মুসলমান শাসকদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াত।"[২]

(গ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সূফীগণের অবদান

বিদেশ থেকে আগত সূফী-দরবেশগণের মধ্যে অনেকে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী আলিম ছিলেন। সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশে প্রথম আগমনকাল থেকেই লোকদের শিক্ষাদানের দিকে মনসংযোগ করেন। সেজন্য খানকাহ্‌র সঙ্গে তাঁরা মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারা গণশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্‌গুলো ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানের কেন্দ্র। এসব শিক্ষা কেন্দ্র চতুর্দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। কিছু সংখ্যক ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যায় যেগুলি সূফী-দরবেশগণের খানকায় গড়ে উঠেছিল এবং এগুলোর বিচ্ছুরিত জ্ঞানালোকে বাংলা ও উত্তর ভারত আলোকিত হয়েছিল। এ শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত ছিল।

কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী (মৃ.১২১৮ খৃ.) বঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম যুগের একজন খ্যাতনামা পন্ডিত। তিনি ছিলেন আলী মর্দান খিলজীর (১২১০-১৩ খৃ.) রাজত্বকালে লক্ষণাবতীর কাযী তাঁকে সমরকন্দে বিখ্যাত হানাফী আইনজ্ঞ ও সূফী কাযী রুকনুদ্দীন আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলীর সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। ব্লকম্যানের মতে,"তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতী বা গৌড়ের কাযী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন 'কিতাবুল ইরশাদের' লেখক এবং 'আল খিলাফি ওয়াল জাদাল' (দার্শনিক বিরোধিতা) বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১২১৯ খৃষ্টাব্দে বুখারায় মৃত্যুবরণ করেন।"[৩]

কামরূপের ভোজর ব্রাহ্মণ নামে একজন যোগী লক্ষণাবতী আসেন এবং তার সাথে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় পরাস্ত হন। ইসলামের উচ্চতর আদর্শ অনুধাবনে করে এই হিন্দু যোগী ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে এতবেশী পারদর্শীতা

1. Dr. Mohammad Abdur Rahim, op. cit. p. 142.
২. Dr. Mohammad Abdur Rahim, op. cit. p. 142-43
৩. Historical Socity. Journal. 1953. vol-i, p. 86.

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করেন যে, মুসলিম ধর্মবেত্তাগণ তাঁকে মুফতীর মর্যাদা দেন এবং ধর্ম বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার অনুমতিও প্রদান করেন। তিনি কাযী রুকনুদ্দীনকে 'অমৃত কান্ড' নামক একখানা গ্রন্থ উপহার দেন, যা হিন্দু মরমীবাদের উপর লিখিত। এই যোগীর সহযোগীয় কাযী রুকনুদ্দীন 'অমৃতকান্ড'[১] গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি নিজেও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন অভ্যাস করেন।[২]

পরবর্তীকালে অম্ভাহ্নাথ নামে আরেক জন ব্রাহ্মণযোগীর সহায়তায় জনৈক অজ্ঞাত নামা[৩]লোক কর্তৃক 'অমৃতকান্ড' পুণরায় আরবীতে অনূদিত হয়। এ যোগী ও ভোজর ব্রাহ্মণের ন্যায় কামরূপের অধিবাসী ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন-"মরমীবাদ সম্পর্কিত এই সংস্কৃত পুস্তকের আরবি ও ফারসী অনুবাদ মুসলিম বাংলার সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাস্তবিকই এটি আরবি ও ফারসি সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানদের একটি মূল্যবান অবদান। এর থেকে তাদের আরবি ও ফারসি ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় এই অনুবাদ কার্যের মধ্যে অন্য জাতির জ্ঞানের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু মরমিয়া চিন্তাধারা যে মুসলিম সূফীবাদে সঞ্চারিত হয়েছে। অমৃতকান্ডের অনুবাদের দ্বারা তা প্রকাশ পেয়েছে। এই সংস্কৃতি গ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে যে ঘটনাটি জড়িত আছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু ঋষি ও দার্শনিকগণ ইসলামের মহান আদর্শ বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর ফলে তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। দু'জন ব্রাহ্মণ যোগী ও পন্ডিতের ইসলাম গ্রহণ-এই সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।"[৪]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের খ্যাতনামা পন্ডিত ও দরবেশ হলেন শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা ইসলামী শিক্ষা ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার বুৎপত্তি ছিল। তিনি সোনারগাঁয়ে একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন্। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল তৎকালের এক বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি উত্তর ভারত থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে এসে সমবেত হতেন। আবূ তাওয়ামা 'মাকামাত' নামে তাসাওউফ বা ইসলামী মরমীবাদের উপর একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী শিক্ষিত মহলে মাকামাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। এই গ্রন্থের চাহিদা লাহোরের মত সুদূর অঞ্চলে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে।[৫] সোনারগাঁও থেকে ফিক্হ শাস্ত্রের উপর লিখিত 'নাম-ই-হক' গ্রন্থটি সমগ্র উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে স্বীকৃত।

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা খ্যাতনামা শিষ্য ও জামাতা মাখদূম শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী কর্তৃক ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাসাওউফের উপর বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল।[৬] শায়খ মুনায়রী এসব গ্রন্থ সোনারগাঁয়ের শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকের নিকট থেকে অর্জিত মূল্যবান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন।[৭]

শায়খ আলাউল হকের শিষ্য সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সীমনানী ছিলেন বাংলার আর এক মূল্যবান সৃষ্টি। তাঁর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ফার্সী ভাষায় সূফীবাদ সংক্রান্ত বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ 'লাতাইফ-ই-আশরাফী' সংকলন করেন তারই শিষ্য হাজী গরীব ইয়েমেনী। তাঁর মাকতুবাত

১. অমৃত কান্ড, এর আরবী নাম করণ করা হয়েছে 'কিতাবু মারা আতুল মাআনী ফী ইদারাকিল ইলমুল ইনসানী' অর্থাৎ মানব জগতের পরিশুদ্ধির গুপ্ত বা গুঢ়ার্থের আয়না।

২. Jaournal of Pakistan Historical Society, op. cit. p. 46.

৩. ব্লকম্যানের মতে, এই অজ্ঞাতনামা লোকটি দামেস্কের বিখ্যাত দার্শনিক ইবনুল আরাবী

৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-৫৪

৫. JASB. 1923. pp. 274. - 77.

৬. দ্রষ্টব্য, পূর্ববর্তী ৬ষ্ঠ অধ্যায়

৭. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও মুহাম্মদ আবুল বাসার, 'শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহ্ইয়া মুনায়রীঃ জীবন ও কর্ম,'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ষষ্ঠদশ খন্ড, ১ম সংখ্যা, আষাড়-১৪০৫, পৃ. ২১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

(চিঠি-পত্র) সংকলন করেন আব্দুর রাজ্জাক ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে। এতে তাঁর সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ব ও মরমীবিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] চতুর্দশ শতকের প্রথমে 'কামাল-ই-করিম' রচিত 'মাজমু-ই-খানি ফী আয়নাল মাআনী' নামে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর একখানী গ্রন্থ আরবী ভাষায় সংকলিত হয়।

হযরত আবূ তাওয়ামা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁয়ের মত আরও অনেক উঁচু মানের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লক্ষণাবর্তীতেম, বর্তমান রাজশাহী জেলার মাহীসুনে, সাতগাঁও-এ,নগোর-এ, মান্দারণে, পাণ্ডুয়ায়, বাঘায়, রংপুরে ও চট্টগ্রামে।[২] শায়খ আঁখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হক এবং নূর কুতুব আলম এরা সকলেই তাদের বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তারেই নয়, সাধারণ শিক্ষা বিস্তারেও সমান আগ্রহী ছিলেন। নূর কুতুব আলম একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং পরবর্তী সময়ে সুলতান হোসেন শাহ্ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। এই খ্যাতনামা সূফী পুরুষ ও পন্ডিতদের খ্যাতি উত্তর ভারত ও বাংলায় সর্বত্র থেকে শিষ্য ও শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করে। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, শেখ নাসির উদ্দীন মানিকপুরী, শেখ হোসেন যুক্কারপোশ এবং উত্তর ভারতের আরও অনেকে শেখ আলাউল হকের নিকট তাঁর পাণ্ডুয়া শিক্ষাকেন্দ্রে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। হুশামুদ্দীন মানিকপুরী, শেখ কাকো ও অন্যান্যরা হযরত নূর কুতুব আলমের যে সামান্য কয়েকটি পত্র পাওয়া গেছে তাতে তাঁর ইসলামী মরমীবাদ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। এ সব পত্রাদির কিছু সংখ্যক দরবেশ, উলেমা ও শিষ্যদের নিকট লিখিত হয়েছিল।[৩] তাঁর রচিত 'আনিসুল গুরাবা' হাদীসের ব্যাখ্যাসহ একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এতে তাঁর কুরআন, ইসলামী শিক্ষা ও ফারসী ভাষায় গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের পরিচয় মেলে। নূর কুতুব আলম ফারসী ভাষায় একজন ভাল কবিও ছিলেন। তাঁর কিছু কিছু কবিতা 'সুবহ-ই-গুলশানে' প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

এ সময়ে মুসলমানদের সাহিত্যিক প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করে ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন-"এ সময়ে মুসলমানদের উদ্যোগে বাংলাপদ্যে কয়েকখানা ধর্মীয় ও সূফীবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এই সব গ্রন্থকারদের আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা ও ইসলামী বিষয়াদিতে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়ায়। গ্রন্থকারগণ কুরআন, হাদিস এবং ধর্মীয় ও মরমীবিষয়ক গ্রন্থগুলোকে তাদের সংকলনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকেরা যাতে সহজে বুঝতে পারে তার জন্য ধর্মীয় বিষয়াদি তারা বাংলায় লিখেন। তাদের লেখার প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকারগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলিম সমাজে বিভিন্ন রকম মিশ্র ভাবধারার অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্যে ইসলামী ভাবধারা জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। ইসলামের বিধি ব্যবস্থা সঠিকভাবে তুলে ধরে মুসলমানদের সংহতি বজায় রাখা এবং তাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করার ব্রত তারা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রচনায় এটাও প্রতিফলিত হয়েছে যে, সমসাময়িক মুসলিম সমাজ রক্ষাণশীল ছিল এবং সমাজে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ধর্মীয় বিষয়াদি কেবলমাত্র আরবী ও ফারসী ভাষাতেই লিখিত হতে পারে। কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ও কবি অবশ্য সমাজের এই ধরনের রক্ষণশীলতা পরিহার করে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে বাংলায় ধর্মীয় বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করার চিন্তা করেন। প্রতিভাশালী কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর যিনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১০৮৯-১৪০৯ খৃ.) রাজত্বকালে আর্ভিভূত হয়েছিলেন তিনি এ ভাবধারারই রূপদান করেছেন। তিনি তাঁর 'ইউসুফ-জুলেখা' নামক গ্রন্থে বলেন যে, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্মীয় বিষয় বাংলায় লিখলে অপরাধ

১. Prof. Hasan Askari, op. cit. p. 38.

২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১- ৭২

৩. Prof. Hasan Askari, op. cit. p. 38.

৪. S. Hoassain, East Bengal Culture, p. 12. হতে উদ্ধৃত, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬.

Dhaka University Institutional Repository

হয়-এরকম চিন্তা করার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। তিনি বরং বাংলায় ধর্মের বিষয় লেখা পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। কেননা, এর ফলে মুসলমানদের অতীতের মহান ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশিত হবে। মুসলমানদের প্রতি সেবার স্পৃহা নিয়েই শাহ মুহাম্মদ সগীর সাধারণ মুসলমানের ভাষা বাংলায় তার স্মরণীয় গ্রন্থ 'ইউসুফ-জুলেখা' রচনা করেন।"[১]

বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল। শিক্ষাকে ধর্মীয় কর্তব্য ও সামাজিক সম্মানের বিষয়রূপে বিবেচনা করা হত। মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মক্তব্যেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত। এ সকল মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকের বাড়ীর নিকটবর্তী ছিল। ফলে প্রত্যেক শহর এমনকি গ্রামেও প্রাথমিক শিক্ষায়তন বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মক্তবের ব্যয়ভার হয়ত রাষ্ট্র থেকে নয়ত স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের জমিদান ইত্যাদি থেকে বহন করা হত। হিন্দু এলাকায় ক্ষুদ্র মুসলমান পাড়ায় মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য মক্তব ছিল। কবি মুকুন্দ রামের মতে,"মুসলিম মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সমস্ত মুসলমান ছেলে-মেয়েকে ধর্মপ্রাণ মৌলভীগণ শিক্ষা দিতেন।"[২]মুসলমানদের বিশেষত উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চারবছর চারমাস এবং চারদিন বয়সে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা শুরু করার সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহখানি' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত ছিল। একজন জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বিশেষ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকের নিকট শিশু তার প্রথম পাঠ গ্রহণ করত এবং শিক্ষক পবিত্র কুরআন থেকে নির্বাচিত একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং শিশু তা পুণরাবৃত্তি করত।[৩]

ধর্মীয় শিক্ষাদান ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান শিশু সন্তানকে ধর্মের মূলনীতি সমূহ ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হত। ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও মক্তবে পড়ান হত। এইচ. জি. রলিনসনের মতে-" এখানে মক্তবে সে (শিশু) কলেমা বা ধর্মবিশ্বাস ও কুরআন থেকে কিছু আয়াত মুখস্ত করত-যা তা দৈনন্দিন প্রার্থনায় প্রয়োজন হত। কুরআন মুখস্ত করার একটি সাধারণ রীতি ও প্রচলিত ছিল। এরই সঙ্গে পয়গাম্বরের বাণী, ফারসী ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়া হত। সুচারু লিখন পদ্ধতির চর্চা করা হত এবং বালক শিল্প কলার শিক্ষার জন্য আগ্রহী হলে তাকে একজন শিক্ষকের কাছে শিক্ষানবিশীর জন্য প্রেরণ করা হত।"[৪]

মাধ্যমিক শিক্ষা ও পাঠক্রমে সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করে ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন-"মাদ্রাসাসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা দান করা হত। উৎকীর্ণ লিপি ও দলিল-পত্রাদিতে কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রদেশের (বঙ্গে) বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বেশির ভাগ শহর ও গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান এলাকা সমূহে মুসলমান অধিবাসীদের শিক্ষাগত প্রয়োজন মিটাবার জন্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। বহু মসজিদ ও ইমারত বাড়ী মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।----------সরকার ও অবস্থাশালী ব্যক্তিরা মাদ্রাসা ও মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে উদারভাবে লাখেরাজ জমি দান করেছেন। কাজী নাসিরুদ্দীন ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে সুব্যবস্থা করেছিলেন। বাঘার মাদ্রাসার জন্য ৪২টি গ্রাম

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬.

২. মুকুন্দরাম, চন্ডিদাস মঙ্গলকাব্য, পৃ. ৩৩৪, সেখানে বলা হয়েছ - "যতশিশু মুসলমান তুলিলা মক্তব্য স্থান, মকুদুম পড়ায় পাঠনা।"

৩. K.M. Ashraf, life and Condition of the People of Hindustan, p. 189

৪. H.G. Rawlinson, India, etc, p. 372

Dhaka University Institutional Repository

দান করা হয়েছিল। শিক্ষা ছাড়াও ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান, কাপড়-চোপড়, তেল, প্রসাধনী দ্রব্যাদি এবং মুলগ্রন্থ ব্যবহারের প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপি নকল করার জন্যে দরকারী জিনিসপত্র সবকিছু পেত। কুরআন, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়াদি মাধ্যমিক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান যেমন- যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং অন্যান্য বিষয়ও মাদ্রাসায় পড়ান হতো।"[১] পাঠ্য তালিকার কথা বলতে গিয়ে আবুর ফজর লিখেছেন-"প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি, পরিমাপশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা, গার্হস্থ্যবিদ্যা, সরকারী আইন কানুন, চিকিৎসাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞানসমূহ ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিত; এসবগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়ই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ব করা যেতে পারে।"[২]

শিক্ষার জন্য এ সকল বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন সূফী দরবেশগণ। মাদ্রাসার বাইরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সদৃশ একাডেমীও ছিল। ড. মুহাম্মদ মোহর আলী বলেছেন-"Apart from the Madrasas and perhapes more important in their scope and influence were the 'academics' or 'Seminaries' that grew up at a number of places-------. One of the earlist of such centres of learnings was organized by Makhdum Jalal Tabrizi at Deatola, about 15 miles north of Pandua ----------. Another centre of Higher education which came into being early in the Muslim period was at Gangarampur, Dinajpur at the instance of Shaikh Ata who was also leader of a Muslim Settlement there ---- parallel to and in some ways outshining these were the Seminary organized at Pandua by shaikh Ala-ul-Haq."[৩]

(ঙ) সমাজ জীবনে সূফীগণের প্রভাব

সমাজ জীবনে সূফী দরবেশগণ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যে সব অঞ্চলে সূফী দরবেশগণের খানকাহ্ বা ধর্ম প্রচার কেন্দ্র থাকত লোকজন সেখানে যতায়াত করত। তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা, জ্ঞান ও অসাধারণ কার্যাবলীর সাথে পরিচিত হত। তারা সমাজে বিভিন্ন স্তরের অধ্যাত্মবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে আদর্শরূপে তুলে ধরেন। তারা সঠিকভাবে আধ্যাত্মিকতার পরিমন্ডলে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন এবং ইহজগতের প্রতি একটা অনীহা ভাব প্রদর্শন করেন। তাঁরা ধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গি জনসমাজে তুলে ধরেন। ফলে সাধারণ লোকজন তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হত। দলে দলে তারা আসত দরবেশগণের দোয়া নিতে। এভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে ভাব বিনিময় ও পারস্পারিক আদান -প্রদানের ফলে এদেশের সাধারণ মানুষ পীর-দরবেশগণের নিকট হতে আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করেন। পূর্ব বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর দরবেশগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এঁরাই বাংলাদেশের ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত মশালবাহী। ইসলামের মহান আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে বিধর্মীদের মধ্যে সত্যধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্যই এসব পীর দরবেশ আরব ও মধ্য এশিয়ায় দূর-দুরান্তর থেকে সুদূর বাংলায় আগমন করেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের ভাষায় - "In fact, by the continued activities of the sufis or men inbued with

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪ - ৭৫

২. আইন-ই-আকবরী (অনু. ব্লকম্যান), ১ম খন্ড, পৃ. ২৮৮

৩. Dr. Mohammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. IB. Riyath, 1985. pp. 832- 36.

Dhaka University Institutional Repository

the sufistic idias Bengal was once so over flooded that the visible effect of that influence can still be marked in many beliefs, practices, Songs and out pouring of the Bengali hearts like the silt deposited on a paddy field after a flood. --- From these things, we can now only imagine. How vast and deep was the magnitude of the influence of the sufis on Bengal .''[১]

সূফী-দরবেশগণের খানকাহ্সমূহ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এখানেই স্রষ্টাসন্ধানী মানুষেরা তাদের মনের শান্তি খুঁজে পেত এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সকল আকাংখা পরিতৃপ্ত হত। খানকাহ্গুলো ছিল একাধারে চিকিৎসাকেন্দ্র এবং আশ্রয় স্থান, যেখানে দুঃস্থ, বদ্ধ উন্মাদ এবং রুগ্নব্যক্তি সরাসরি আশ্রয় লাভ করত। তারা শায়খ ও তদীয় শিষ্যদের নিকট হতে চিকিৎসা, সেবা ও যত্ন লাভ করত। প্রতিটি খানকাহ্র সঙ্গে একটি করে লঙ্গরখানা বা বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকত- যেখানে থেকে গরীব ও অভুক্ত লোকদের খাবার দেয়া হত, লঙ্গরখানার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিষয় সম্পত্তি ও দান করা হত। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ও পান্ডুয়ার বিখ্যাত সূফী-দরবেশগণের প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্সমূহের বিরাট আয়ের লাখেরাজ জমি ছিল। এভাবে সাধু-দরবেশগণের খানকাহ্ ও লঙ্গরখানাগুলো দুঃস্থ বিপন্ন মানুষের নিকট এক মহামুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বিনা খরচে খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সাধু দরবেশগণ দেশের দীন-দুঃখী ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে এবং তাদের অনুভূতি ও আশা-আকাংখা বুঝতে সক্ষম হন।[২]

জনসাধারণ ভাবত যে তাঁরা ছিলেন অতিমানবীয় ক্ষমতার অধিকারী। সূফী-দরবেশগণের অন্তর ঐশী জ্যোতিপ্রাপ্ত ও ঐশী প্রেরণার উদ্বুদ্ধ; তাদের প্রার্থনা বিফল হয় না। সুতরাং তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, মৃতকে জীবন দান করেন, ইচ্ছা করলে জীবিতদের প্রাণ হরণ করতে পারেন, দরিদ্রকে অঢেল সম্পদ দান করতে পারেন, শারীরিক ও মানসিক সবরকম ব্যাধি নিরাময় করতে পারেন। একই সময় তারা বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছু জানেন। অলী-দরবেশগণ পরকালে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে পাপীকেও নাজাত দিতে পারেন। তাই তারা সকল শ্রেণীর লোকের পরম নির্ভর । তাঁদের খানকাহ্ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের নিরাপদ আশ্রয়। দেশী-বিদেশী, ধনী-দরিদ্র, আর্ত-পীড়িত, পথিক-আগন্তুক সকলের জন্য তাঁদের খানকাহ্ অবারিত দ্বার। তাঁদের লঙ্গরখানায় সবার জন্য ভোজ্য ও পানীয় সর্বদা মজুদ ও সহজলভ্য থাকত। এ জন্যই সূফীদের দরগাহ্গুলোকে দুনিয়ার বিশ্রাম দানকারী অট্টালিকারূপে বিবেচনা করা হত যেখানে জনসাধারণের আশা পুরণ ঘটে।[৩]

ডঃ এনামুল হকের ভাষায় -জনসাধারণ তাঁদের সম্পর্কে মনে মনে এই ধারণা পোষন করত যে তারা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষ; অলৌকিক ক্ষমাতাবলে তাঁরা পীড়িত ও তাপিতকে সবল ও নিরাময় করতে পারেন; শোকাতুরকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে তার মনের ক্লেদ ও গ্লানী মুহূর্তের মধ্যে মুছে দিতে পারেন। শুধু তাই নয় মৃত্য ব্যক্তিকে প্রাণ স্পন্দনে সঞ্জীবিত করতে পারেন এবং ভূত ভবিষ্যত সম্পর্কেও সবকথা অভ্রান্তরূপে বলতে পারেন। তাদেরকে জিতেন্দ্রীয়, ভোগ-বিলাস বিমুখ ও সংসার বিরাগী দেখে মানুষ তাদেরকে কখনও কখনও অতিমানব বা দেবতারূপে ভুল করেছে। এদের কর্মের দিক সম্পর্কে আলোচনা করলে ভক্তি ভরে মস্তক আপনা আপনি বিনত হয়ে পড়ে। সংসারের সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করে কর্ম ও সাধনার জন্য তাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।[৪]

---

১. Dr. Md. Enamnul Haq, op. cit. p. 260 - 61.

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৩. Abid Ali Khan, op. cit. p. 104.

৪. Dr. Md. Enamul Haq. op.cit. p. 262

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা (দরবেশগণ) বাংলাদেশের দুঃস্থ, নিপীড়িত ও নির্যাতিত ও ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখে প্রাণ খুলে কেঁদেছিলেন; তাদের নিরাশ ও মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করে ও ব্যথিত হৃদয়ে সহানুভূতি দান করে এদেশের প্রাণ, মন, আত্মাকে হরণ করেছিলেন। তারা জাতির কথা চিন্তা করেন নি, সমাজের কথা ভাবেননি যেখানেই মানুষের পতন হয়েছে, যেখানে মানুষের করুণ বিলাপ ও আর্তনাদ ধ্বণিত হয়ে উঠেছে , সেখানে মান-অপমানের কথা ভুলে গিয়ে তারা মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে স্থান দিয়েছেন। সমাজ জীবনে দরবেশগণ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়েছেন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়েছেন, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে বসে তাদের সেবা শুশ্রুষা করেছেন; মৃত্যুর পরেও কাঁধে করে কবর দিয়েছেন। এদের সংস্পর্শে এসে পাপী পাপাচরণ ত্যাগ করে সাধু হয়েছে; সংসারী পরোপকারে আত্ম বিলিয়ে দিয়েছে; বস্তুতপক্ষে তাঁদের দেখলে সত্যই মনে হত যে, তাঁরা 'শান্তির দূত'। তাই মানুষ সূফী দরবেশগণের পেছনে পেছনে ছুটে চলত। এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, বাংলাদেশের সমাজ জীবনে পূণ্যশ্লোক এই সাধকের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল গভীর।[১]

সূফী-দরবেশগণের খানকাহ্গুলো হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকল মতের লোকদের মিলন কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্রগুলো অবারিত প্রতিষ্ঠান ও খোলাখুলি আলোচনার স্থানে পরিণত হয়। এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ সব প্রতিষ্ঠান একটা উদারনৈতিক ও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ একে অন্যের নিকটতর হয় এবং একে অন্যের মতকে বুঝতে পারে। এই উদার পরিবেশে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক মতবাদ 'সত্যপীর' পূজার উদ্ভব হয় এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

সূফী-দরবেশগণের সততা ও ব্যক্তিত্ব তাঁদের মানবতা ও সেবা, প্রীতি ও উদারতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর হিন্দুকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাদের অনেকেই দরবেশগণের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে সূফী-দরবেশগণ এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, দেশের শাসক ও সুলতানগণ যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন এরা সেখানে আশাতীতরূপে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। এক কথায় বলা যায়, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা প্রণালী দৃঢ় চরিত্র বল ও গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্য এরা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁদের জীবনে ইসলামের সনাতন আদর্শ এমন অকৃত্রিমভাবে প্রকটিত হতে দেখে এদেশের মানুষ অতি সহজেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবার অনেকেই নিজেদের ঐতিহ্যগত ধর্ম বিশ্বাসকেই রক্ষা করে আসছিল। তথাপি তারা সূফী-দরবেশগণের একান্ত ভক্ত হয়ে উঠে এবং তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানায়। তারা পীর পূজা শুরু করে এবং তাদের অন্তরাকাংখা পূর্ণ করার মানসে পীরের আর্শীবাদ কামনা করে। এমনকি বহু শতাব্দীব্যাপী হিন্দুরা ভক্তির সঙ্গে সূফী-দরবেশগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে এবং এবং তাঁদের আশীর্বাদ লাভের আশায় মাযার শরীফ পরিদর্শন করছে।[২]

বিদেশাগত সূফী-দরবেশগণ যখন বাংলায় আগমন করেন তখন বাংলায় সর্বত্র উৎকট তান্ত্রিক গুরুবাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। কালীসেবী সুরাপায়ী তান্ত্রিকতাবাদের বীভৎস নরবলীর ভয়ে যখন সারাদেশ আতংকগ্রস্ত সে সময়ই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অলী -দরবেশগণ এদেশে আগমন করেন।

১. ড. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

তা*াদের নিকট তান্ত্রিকদের মারণ, উচাটন ও বশীকরণ সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র নিস্ফল প্রমাণিত হয়। তান্ত্রিক গুরুগণ দরবেশগণের নিকট পরাজিত হয়ে হয় ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। গুরু পরাজয়ে স্থানীয় লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ফলে তান্ত্রিক শক্তি বিলুপ্ত হয়।[১]

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল সূফী-দরবেশগণ ঐ দেশে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে প্রধানত দেশীয় ভাষা বাংলা ব্যবহার করেছেন। অমুসলিম জনসাধারণ আরবী ফারসী ভাষা বুঝতে না পারার কারণে পীর দরবেশগণ এদেশের লোকজনের আঞ্চলিক ভাষায় আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতেন। আবার কুরআন, হাদীসের বিষয়বস্তু আরবী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নবদীক্ষিতদের মধ্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে সূফী-দরবেশগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। ফলে বাংলা ভাষার ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিমের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য-"The teaching and preaching of Islam to the common people gave impetus to the Bengali language. The sufis and mystics preached the religion in local language, the dialect of the people, because it was through this medium that they could come in direct contact with them. Many literate muslims felt that the converted muslims in general did not understand Arabic and parsian and hence they were not properly acquinted with the teachings of Islam . They thought it their only to write books appertaining to Islamic sociology and religion in Bengali, so that the common muslims might understand them and regulate their life in accordance with the teachings of their religion."[২]

মুসলমান পীর-দরবেশগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও জনহিতকর কার্যাবলীর দ্বারা হিন্দু জনগণের মনে গভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত 'শেক শুভোদয়ার' লেখক হলায়ুধ মিশ্র শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজীর প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেন। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের আশায় তারা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করত ও তাঁর পবিত্র নামে তাদের বিষয় সম্পত্তি অর্ধেক উৎসর্গ করত। মাধবী নাম্নী এক মহিলার মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীকে শায়খ পুণরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থেকে ছিল।[৩] সপ্তদশ শতকের হিন্দু কবি ক্ষেমানন্দ তাঁর 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের পীর-দরবেশগণের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে প্রশংসা কীর্তন করেছেন।[৪] হিন্দু কবি বিদ্যাপতি মহান তাপস খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, জাফর খাঁ গাযী, বড় খাঁ গাযী ও ইসমাইল গাযীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর কাব্য 'সত্যপীর পাঁচালী' মুসলমান পীর-দরবেশ সত্যপীরের আদেশে রচনা করেন।[৫]

বাংলাদেশের সূফী-দরবেশগণ উত্তর ভারতের সূফীদের অনুকরণে খানকাহ্ পরিচালনা করতেন। শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে এসে সেখানে একটি খানকাহ্ ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর খানকাহ্‌তে অগণিত লোকজন প্রতিপালিত হত। তাঁদের খানা খেতে সময় লাগত। ফলে তাঁর প্রধান শিষ্য শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে খাওয়া বন্ধ করে দেন। কারণ তাতে তাঁর সময় নষ্ট হত; লেখা-পড়ার ব্যাঘাত ঘটত।[৬] সিলেটের হযরত শাহ্‌জালালের আস্তানায় বহু লোকের

১. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
২. Dr. Md. Abdur Rahi, op. cit. 216.
৩. সুকুমার সেন সম্পাদিত, শেখ শুভোদয়া, কলিকাতা, ১৯২৭, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, দ্রষ্টব্য
৪. ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃ. ৮৭
৫. এস. কে, সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৮০
৬. Calcutta Ravew, 1939. p. 177- 210.

Dhaka University Institutional Repository

যাতায়াত ছিল। তাঁরা আসবার সময় সঙ্গে করে খানা নিয়ে আসতেন এবং তখনই তা শিষ্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন। স্বহস্তে খানকাহ্ পরিস্কার করতেন এবং কাপড়-চোপড় ধৌত করতেন।[১]শায়খ আলাউল হক সম্পর্কে জানা যায় যে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। তথাপি তাঁর খানকাহ্তে হাজার হাজার দুঃস্থ, দরিদ্র ও মুসাফির প্রতিপালিত হত-"The Khanqa of the vastly learned Sufi Shaikh Ala-al -Haq and his distinguished son Shaikh-Nur-Qutb-Alam was a renowned seat of learning as well as spiritual knowledge. Hazrat Nur-Qutb-Alam built a great madrasa and hospital at pandua. Sultan Ala-al-Din Hossain Shah made a land grant for its support. This great religious seminary attracted seckers after knowledge from different parts of the sub-continent and it produced a number of celebrated scholars and sufis who shed the lustre of their spiritual personality and knowledge for several centuries. The descendants of this distinguished family of saints were also noted for their peity as well as learning."[২]

আগেই বলা হয়েছে যে জনসাধারণ বিশ্বাস করত যে, তাঁরা কারামাত বা অতিমানবীয় ক্ষমতা অধিকারী; তাঁরা আল্লাহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত; তাঁদের অন্তর ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে আলোকিত এবং তারা হচ্ছেন সত্যের ভান্ডার। তাঁরা সরল ও অত্যন্ত আত্মসংযমী জীবন যাপন করা সত্বেও জনগণের মনে এসব বিশ্বাস ছিল। তারা সামান্য কাজ এমনকি গুরুর আদেশে ঝাড় দারের কাজ করতেও দ্বিবাবোধ করতেন না। শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী তাঁর পীর শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দীর জন্য এবং শায়খ আলাউল হক তাঁর পীর শায়খ আঁখি সিরাজুদ্দীন উসমানের জন্য উষ্ণ খাদ্যসহ উত্তপ্ত উনূন সর্বদা মাথায় নিয়ে চলতেন। শায়খ নূর কুতবুল আলম জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতেন; পায়খানা পর্যন্ত পরিস্কার করতেন। তাঁর ভাই আযম খান তাঁকে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করলে তিনি বলেতন-"I have no necessity of your wealth and grandeur which are perishable. To carry faggots for the monestery is better (than wealth), the post of dignitaries is for you."[৩] শায়খ নূর কুতবুল আলম বলেছেন যে, তাঁর গুরু (তার পিতা শায়খ আলাউল হক) তাঁকে দয়ার সূর্য, বিনয়ের পানি এবং ধৈর্যের মাটির মত হতে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন।[৪]

মহান সূফী-সাধকদের এসব অসাধারণ কার্যাবলী ও গুণাবলীর জন্যই তাঁদেরকে নানাবিধ উপাধি প্রদান করা হত। শায়খ আলাউল হককে 'সদয় শ্রদ্ধেয় দরবেশ'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। "যার আল্লাহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত পূণ্য কাজগুলো মনোহর ও মহিমান্বিত। আল্লাহ ঐশী জ্ঞান ও বিশ্বাসের আলোকে তাঁর হৃদয় আলোকিত করুন, তিনি হচ্ছেন গৌরবমন্ডিতদের ধর্মের পথ প্রদর্শক।"[৫] শায়খ নুর কুতবুল আলমকে উল্লেখ করা হয়েছে-"হযরত শায়খ উল ইসলাম, জাতির মুকুট, দরবেশগণের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ, যিনি আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হয়েছেন"- "হযরত সুলতান-উল-আরিফীন (দরবেশগণের সুলতান), কুতুব উল আকবর (আলোর আলো বিকিরণ কেন্দ্র), "ধর্মের আকাশের সূর্য এবং সত্যের ভান্ডারের চাঁদ, আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শকরূপে।"[৬]শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক স্বীকৃত "দেবদূত সদৃশ স্বভাবের অধিকারী এবং ধর্ম ও বিশ্বের সুলতান।"[৭]

১. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, কলিকাতা-১৯৬৬ ইং, পৃ. ৪৬৯
২. Dr. Md. Abdur Rahim, op. cit. p. 289.
৩. Dr. Md. Enamul Haq. op. cit. p. 173.
৪. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৫. Shamsuddin Ahmed, Inscriptions of Bengal, vol-iv, 1960, p. 33.
৬. Abid Ali Khan, op.cit, p. 104, 170
৭. Abid Ali Khan, op.cit, p. 104

Dhaka University Institutional Repository

সূফী-সাধকদের সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা প্রণালী, দৃঢ় চরিত্রবল ও গভীর আত্মবিশ্বাসের জন্য সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়ত। ফলে লোকজন সূফীদের খানকাহ্ ও আস্তানায় গিয়ে ভীর জমাত এবং ইসলাম গ্রহণ করে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করত। জাগতিক কোন কারণ স্থানীয় জনগণকে ইসলাম গ্রহণ অনুপ্রাণিত করেনি। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য এবং বর্ণগত বাধা, নিম্ন বর্ণের উপর উচ্চবর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণদের উৎপীড়ন, নিশ্চিতভাবেই ধর্মান্তরণের প্রধান কারণ ছিল। ব্রাহ্মণরা কীভাবে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেছিল এবং কীভাবে বৌদ্ধরা খোদা, পয়গাম্বর, পীর, গাযী ইত্যাদির সাহায্য প্রার্থনা করেছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে শূণ্যপুরাণের 'নিরাঞ্জনের রুষ্মা' অধ্যায়ে। এখানে তা তুলে ধরা হল।[১]

"জাজপুর পুরবাদি সোল স অ ঘর বেদি
বেদি ল এ কন্ন এ নগুন
দক্ষিণা মাগিতে জায় জার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পুড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর নচিনে আপন পর
জালের নহিক দিক পাশ ।
বলিষ্ঠ হইআ বড় দশ বিশ হৈয়া জড়
সন্ধমীরে কর এ বিনাশ॥
বেধে করি উচ্চারণ রেয়্যাঅ অগ্নি ঘন ঘন
দেখিআ সভায় কম্পমান
মনেত পাইআ মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহরণ
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকি আ ধর্ম মনেত পাইয়া মর্ম,
মায়াত হইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হইল্যা জবনরূপি মাথায় এল কালটুপি
তাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদার বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকাব হৈলা ভেস্ত অবতার
সুকেতে বলেত দম্বদার॥
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পলিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মঁহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈলা সুলাপানি॥
গনেশ হইআ গাজী কার্তিক হৈল কাজী
ফকির হৈলা জতমুনি॥

১. সি,সি, বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত,প্রাগুক্ত দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

তেজিয়া আপন ডেক নারদ হইয়া সেক
পুরন্দার হইল সলানা॥
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা মনে
সভে মিলি বাজায় বাজনা॥
আগুনি চন্ডিকা দেবি তিঁহ হৈলা হাযাবিবি
পদ্মাবতী হৈলা বিবি নূর॥
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়া ফির‍্যা থয়রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোল বোল॥"

এতে বৌদ্ধরূপে চিহ্নিত ধর্ম পূজারীদের উপর ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নের একটি চিত্র আঁকা হয়েছে। নিপীড়িত বৌদ্ধগণ ধর্মের সাহায্য প্রার্থনা করলে ধর্ম নিজেকে যবন বা মুসলমানে রূপান্তরিত করে ব্রাহ্মণ উৎপীড়কদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এতে দেখা যায় কোন কোন স্থানে দলবদ্ধভাবে একটি সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নির্দিষ্টভাবে জাজপুর (উড়িষ্যা) ও মালদহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু দেব-দেবীদের মুসলমান নামকরণ করা হয়েছে। খোদা, পয়গাম্বর, বেহেস্ত, মুহাম্মদ, আদম, গাযী, ফকির এবং মৌলানার উল্লেখ করা হয়েছে। মাদার বা শাহমাদার নামে একজন পীরের উল্লেখ করা হয়েছে। এতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাংলার সমাজ জীবনে সূফী-দরবেশগণের প্রভাব ছিল কত গভীর; কত ব্যাপক।

সূফীগণকে কেলমাত্র তাঁদের জীবদ্দশায় সমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন তা নয়, বরং মৃত্যুর পরেও তাঁদের মাযার বা দরগাহ্গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এখনও করছে। বাংলায় অনেক দরগাহ্ তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। শুধু তাঁদের উরসের দিনে বা মৃত্যু বার্ষিকীতেই নয়, সারা বছরই এগুলোতে জনতার ভীড় লেগে থাকে। চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফীগণ কোন দান বা উপহার গ্রহণ করতেন না, তাঁরা নিতেন ফুতুহ্ বা অযাচিত দান। তাঁদের দরগাহগুলো ছিল জীর্ণ-শীর্ণ এবং শিষ্যদের নিয়ে তাঁরা দীনহীন ও একান্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু পান্ডুয়ার শায়খ নূর কুতবুল আলমের দরগাহ্কে বলা হয় শাস হাজারী বা ছয় হাজারী, অর্থাৎ দরগাহ্র ভূ-সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ছয় হাজার টাকা। আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ্ এ জমি দান করেছিলেন, তবে দরবেশের জীবদ্দশায় নয়, তাঁর মৃত্যুর পরে। এতে দেখা যায় যে, সূফীরা তাদের মৃত্যুর পরেও যেমন মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তেমনি সূফীগণের পূর্ব পুরুষরা রাষ্ট্র থেকে ইনাম বা দান হিসেবে জমি লাভ করতেন এবং এভাবে তারা ইনামদার বা জমির মালিক হতেন।[১] সুতরাং সূফীগণ ও তাদের দরগাহ্গুলো বাংলার মুসলিম সমাজের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বাস্তবিকই মুসলিম পীর-দরবেশগণ যথার্থরূপে বাংলার আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ ছিলেন।

১. ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

	ঃ	আল-কুরআন,
	ঃ	বোখারী শরীফঃ কুতুবখানা রশিদিয়া, দিল্লী, ১৩৩৫ হিঃ
	ঃ	নাসাঈ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম (অনূ. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান)	ঃ	বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২ইং
কে.এম. রাইছ উদ্দীন খান	ঃ	বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা-১৯৯৮ইং
এ.এফ.এম. আব্দুল জলিল	ঃ	পাঁচ হাজার বছরের বাঙালা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ঢাকা
তোফায়েল আহমদ	ঃ	যুগে যুগে বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯২ইং
আব্দুল মান্নান তালিব	ঃ	বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮০ইং
রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়	ঃ	বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খন্ড), নব ভারত পাবলিশার্স কলিকাতা, ১৯৭১ইং
ডক্টর আব্দুল করিম	ঃ	বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭ইং
ডক্টর আব্দুল করিম (অনূ. মোকাদ্দেসুর রহমান)	ঃ	মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২ইং
ডক্টর আব্দুল করিম	ঃ	চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-চট্টগ্রাম, ১৯৮০ইং
ডক্টর আব্দুল করিম	ঃ	বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী-,ঢাকা-১৯৮৭ইং
মিনহাজ উদ্দীন সিরাজ (অনূ. আ.কা.ম. জাকারিয়া)	ঃ	তাবকাত-ই-নাসিরী, ঢাকা-১৯৮৩ইং
ফজলুল হাসান ইউসুফ	ঃ	বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা-১৯৯২ইং
মাহবুবুর রহমান	ঃ	মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়, তৌহীদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা-১৯৮৮ইং
অধ্যাপক কে.আলী	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৮৬ইং
অধ্যাপক কে.আলী	ঃ	মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৭৯ইং
ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পাদনা পরিষদ	ঃ	বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩ইং
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন	ঃ	বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭), পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (অপ্রকাশিত)

Dhaka University Institutional Repository

	ঃ	মহাভারত, আদি পর্ব।
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য	ঃ	হুগলী ও হাওরার ইতিহাস, অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা।
মনসুর মুসা (সম্পাদিত)	ঃ	বাঙালাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৭৪ইং
গোলাম হুসায়ন সলীম (অনূ. আকবর উদ্দীন)	ঃ	বাঙলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৪ইং
আখতার ফারুক	ঃ	বাঙালীর ইতিকথা, জুলকার নাইন পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৮৬ইং।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	ঃ	আর্থনীতিক ভুগোলঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, - ১৯৮৮ইং।
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	ঃ	গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫ইং।
ড. নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী	ঃ	বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১ম খন্ড), ১৩৪৪ বাং
আবুল ফজল	ঃ	আইন-ই-আকবরী (২য়খন্ড)
আব্দুল কাদির	ঃ	ডক্টর এনামুল হক বক্তৃতামালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪ইং।
জিয়াউদ্দীন বারণী	ঃ	তারিখ-ই-ফিরূজশাহী।
আবুল হাশিম (অনূ. মুসলিম চৌধুরী)	ঃ	ইসলামের মর্মকথা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮১ইং।
রমেশচন্দ্র মজুমদার	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস (২য়খন্ড), কলিকাতা-১৩৮৫ বাং
রমেশচন্দ্র মজুমদার	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস (১মখন্ড) প্রাচীন যুগ, কলিকাতা-১৯৮১ইং
নীহার রঞ্জন রায়	ঃ	বাঙালীর ইতিহাস
সৈয়দ সুলায়মান নদভী (অনূ. হুমায়ুন খান)	ঃ	আরব নৌবহর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২ইং
ড. তারা চাঁদ (অনূ. এস, মজিব উল্লাহ্)	ঃ	ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ইং
খান বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন অনূদিত	ঃ	ইবনে বুতুতাঃ আযায়েবুল আসফার, দিল্লী, ১৯১৩ইং
ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক	ঃ	পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা-১৯৪৮ইং
ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক	ঃ	বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৩৩৫বাং
ডঃ মুহাম্মদত এনামুল হক ও আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ	ঃ	আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৩৫ইং
অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়	ঃ	প্রথম স্তবক, রাজশাহী, ১৩১৯বাং
ডঃ হাসান জামান	ঃ	সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৮০ইং
গোলাম সাকলায়েন	ঃ	আমাদের সুফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭ইং

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা	ঃ	গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুব-উল-আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯১ইং
ড. এ.এম. চৌধুরী	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৯৫ইং
আসকার ইবনে শাইখ	ঃ	মুসলিম শাসন আমলে বাংলার শাসন কর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৮ইং
মাওলানা আব্দুর রহীম হাযারী	ঃ	সুফীতত্ত্বের আত্মকথা, ঢাকা
সৈয়দ আমির আলী (অনূ. মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান)	ঃ	দি স্পিরিট অব ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩ইং
ডঃ রশীদুল আলম	ঃ	মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৮১ইং
মোঃ সোলায়মান আল সরকার	ঃ	ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দীন রুমী, বাংলা একামেডী, ঢাকা-১৯৮৪ইং
ফকির আব্দুর রশিদ	ঃ	সূফী দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা-১৯৮০ইং
ইমাম গাযালী	ঃ	ইহ্ইয়াহ্ উলুমিদ্দীন, (৪র্থ খন্ড)
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	ঃ	আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা-১৯৭৭ইং
ইবনে খালুদন	ঃ	মুকাদ্দিমা, বৈরুত
এম. এ. হাশেম	ঃ	মুসলিম দর্শনের মুল কথা, চুয়াডাঙ্গা, ১৯৭৫ইং
সম্পাদনা পরিষদ	ঃ	সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৬৯ইং
আব্দুর রহমান চিশতী	ঃ	মিরাত-উল-আসরার, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা
শায়খ আব্দুল হক দেহলভী	ঃ	আখবারুল আখিয়ার (উর্দ্দূ) করাচী, ১৯৬৩ইং
মাওলানা জামালী	ঃ	সিয়ারুল আরিফীন, দিল্লী, ১৩১১ হিজরী
নাসির উদ্দীন	ঃ	সুহাইল-ই-ইয়ামন
ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্	ঃ	ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা-১৯৬৩ ইং
দেওয়ান মুহাম্মদ নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	ঃ	হযরত শাহ্জালাল (রহ.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা-১৯৮৭ইং
মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী	ঃ	হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৬৬ইং
মাওলানা আব্দুর রহিম	ঃ	হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৭০ইং
শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়	ঃ	বাংলার ইতিহাসের দু'শোবছর কলিকাতা, ১৯৬৬ইং
সায়্যিদ জমির উদ্দীন আহমদ	ঃ	সিরাতুশ শরফ, লক্ষ্ণৌ
সৈয়দ মোর্তজা হোসাইন আবুল উলায়ী (অনূ. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ সাহিত্য ভূষণ)	ঃ	সহীফায়ে সিদ্দিকীয়া, ঢাকা-১৯৮২ইং
সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (অনূ. আবূ সাঈদ মোঃ ওমর আলী)	ঃ	ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (৩য় খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৬ইং
শাহ্ ও'আয়ব	ঃ	মানাকিবুল আসফিয়া, বিহার, ১৯২৬ইং

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ মানেরী (অনু. মীর হাসান আলী)	ঃ	মাকতুবাত-ই-সাদী, ঢাকা-১৯৭৯ইং
শায়খ আব্দুল হক দেহলভী	ঃ	আখবারুল আখিয়ার, দিল্লী - ১৩৩২হিঃ
মেহরাব আলী	ঃ	দিনাজপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯১ইং
মেহরাব আলী	ঃ	পীর চিহিল গাজী, দিনাজপুর, ১৯৬৮ইং
রাধা রমন সাহা	ঃ	পাবনা জেলার ইতিহাস, ১৩৩০ বাং
আহমদ শরীফ (সম্পা.)	ঃ	লাইলী মজনূ, ঢাকা-১৯৫৭ইং
রশীদ আহমদ	ঃ	বাংলাদেশের সূফী সাধক, মডার্ন লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৭৪ইং
আমীর খুর্দ (অনূ. মোহাম্মদ আলী নোন)	ঃ	সিরার-উল-আউলিয়া (উর্দ্দূ) দিল্লী
গোলাম সরওয়ার	ঃ	খাজিনাতুল আসফিয়া, নেওয়াল কিশোর, লক্ষ্ণৌ
ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্	ঃ	বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খন্ড), ঢাকা-১৩৭১ বাং
সি. সি. ব্যানার্জী (সম্পা.)	ঃ	রামাই পন্ডিত, শূণ্যপুরাণ কলিকতা, ১৩৩৫ বাং
কৃত্তিবাস	ঃ	রামায়নের ভূমিকা
গোলাম হুসায়ন সলীম	ঃ	রিয়াজ -উস-সালাতীন, কলিকাতা, ১৮৯৮ইং
গোলাম আলী আসাদ	ঃ	খাজিনাহ্-ই-আমিরাহ্, কানপুর ১৯০০ইং
মুকুন্দরাম	ঃ	চন্ডিদাস মঙ্গলকাব্য, কলিকাতা
ডক্টর সুকুমার সেন (সম্পা.)	ঃ	শেক শুভোধয়া, কলিকাতা, ১৯২৭ইং
ডক্টর সুকুমার সেন (সম্পা.)	ঃ	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা
ক্ষেমানন্দ	ঃ	মনসা মঙ্গল, কলিকাতা
সম্পদনা পরিষদ	ঃ	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ(১মখন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
সম্পদনা পরিষদ	ঃ	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ(২য় খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
সম্পদনা পরিষদ	ঃ	ইসলামী বিশ্বকোষ(৩য় খন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
সম্পদনা পরিষদ	ঃ	ইসলামী বিশ্বকোষ(৫মখন্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
শায়খ আহমদ সিরহিন্দী	ঃ	মাকতুবাত শরীফ (১ম খন্ড), ঢাকা-১৯৮৬ইং
ড. তারা চাঁদ (অনূ. করুণাময় গোস্বামী)	ঃ	ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৮ইং
ড. আমিনুল ইসলাম	ঃ	মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
D.C. Sircar	:	Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Delhi, 1971.
Romesh Chandra Majumder	:	History of Bengal-vol-1. Dhaka.
Dr. A.K.M. Shamsul Alam	:	Sculptur Art of Bangladesh, Dhaka.
R.A. Mullick	:	Partition of Bengal, Dhaka.
A.M. Chowdory	:	Dynastic History of Bengal, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

H.A.R. Gibb	:	Ibn Battuta : Travels in Asia and Africa, London, 1963.
Prof. Sayedur Rahman	:	An Introduction to Islamic culture and Philosophy. Mullick Brothers. Dacca, 1963.
Editors Board	:	Islam in Bangladesh throuh ages. Islamic foundation Bagladesh Dhaka-1995.
P.K. Hitti	:	The Aryan, London, 1965.
Aurther Jeffery	:	The fareign Vocabulary of The Quran, Oriental Inst. Baroda, 1938.
K.S. Lal	:	Early Muslim in India, New Delhi, 1984.
Andre- Wink.	:	AL-Hind-The making of the Indo- Islamic world vol- I. E.J Bril The Natherlands, 1991.
Mohammad Nurul Haq	:	Arab Relation with Bangladesh, 1980. Dhaka. University,
K.A. Nizami (ed. Md. Zaki)	:	Arab Account of India.
Rechard Saymond	:	The Making of Pakistan,
S.M. Taifor	:	Glimpses of old Dacca, Dacca, 1965.
K.N. Dixit	:	Memoirs of the Archaeological Survey of India, Delhi, 1938.
Dr. Abdul Karim	:	Social History of Muslims in Bengal, Chittagong, 1985.
Elliot and Dowson	:	History of India as told by its own Historian, vol-I.
Dr. Md. Enamul Haq	:	A History of Sufism in Bengal, Dhaka-1975.
A.J. Arberry	:	Sufism, London, 1950.
.A.J. Arberry	:	Muslim Saints and Mystics, London.
A.J. Arbery	:	The Doctrine of Sufis, London, Cambridge University press. 1950.
Dr. Kalika Ranjan Qanungo	:	Histroy of Bengal, vol.- II.
Saiyed Abdul Hai	:	Muslim Philosophy. Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1982.
Abdul Majid B.A.	:	Tasawof-E-Islam, Dhaka.
Sayed Mahmudul Hasan	:	Islam, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1980.
R.A. Nicholson	:	Mystics of Islam, Combridge. 1921.
Sayed Amir Ali.	:	The Spirit of Islam, London-1947
S.M. Nadvi	:	Muslim thought and its Source.
Sir Md. Iqbal	:	The Reconstruction of Religious thought in Islam. Lahore, 1965.

Dhaka University Institutional Repository

Sir Md. Iqbal	:	Tho develoment of Metophysics in Persia Lohore, 1963.
Dr. Ishrat Enver	:	Metaphysics of Iqbal.
Majid Ali Khan	:	Islam on Origin and Evalution of Life. Delhi. 1978.
Prof . Kazi Ayub Ali	:	An Introduction to Islamic culture. Dhaka.
R. A. Nicolson	:	Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921.
H.A. Gibb.	:	Mohammedanism. New Yourk 1947.
Goldziher	:	Mohammad and Islam, New Haven, 1917.
E.J. Brown	:	The Prospect of Islam, London, 1944.
Sydney spencer	:	Mysticism in world Religion, Baltimore, 1963.
James Luba	:	The Psycology of Religious Mysticism. Boston. 1966.
Sayed Athar Abbas Rezbi	:	A History of Sufism in India, vol-2. New Delhi. 1983.
M.T. Titus	:	Indian Islam, Oxford, 1930.
Kunning Hum	:	Report of the Archaeological Survey of India. Vol. 15
Abid Ali Khan	:	Memoirs of Gour and Pandua.Dhaka
Shmsuddin Ahmed	:	Inscription of Bengal , vol- IV.
Dr. Md. Ishaq	:	India's Contribution to the Study of Hadith literature. Dhaka University. 1971.
Dr. A.K.M. Ayub Ali	:	History of Traditional Islamic Education in Bangladesh. Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1983.
W.W. Hunter.	:	A statistical Account of Bengal , vol.-I. New Delhi, 1974.
Dr. Hasan Askari	:	Bengal, Past and present, 1948.
Dr. Md. Abdur Rahim	:	Social and cultural History of Bengal. Vol-I. Karachi.
N.K. Battasali	:	Ibn Battuta, Coins and Chronology etc.
K.A. Nizami	:	Some Aspects of Religion and Politics in India in the thirtenth century.
Dr. Mohammad Mohar Ali	:	History of the Muslims of Bengal. vol. IB, Riyath. 1985.
S. Mahmudunnasir	:	Islam: Its Concepts and History, New Delhi.1981.

Dhaka University Institutional Repository

A.H. Dani
: Inscription of Bengal-120-9
A.H. Dani : Procedings of the Pakistan conference, 1st Session. Karachi-1951.

ঢাকা ডায়েরী - ১৯৯৯ইং
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা- সাতাশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা -১৯৮৭ইং
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা- এপ্রিল-জুন সংখ্যা - ১৯৮৮ইং
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা- এপ্রিল-জুন সংখ্যা - ১৯৮৪ইং
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা- ৩৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা - ১৯৯৭ ইং
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা- এপ্রিল-জুন, জুলাই- সেপ্টেঃ সংখ্যা - ১৯৯২ইং
অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা - ১৯৮৮ইং
অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী সংখ্যা -১৯৮৯ইং
মেহরাব আলী একশ তেইশ হিজরীর শিলালিপি- দিনাজপুর যাদুঘর- সিরিজ নং ৪
দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা আশ্বিন, ১৩৭৬ বাং,
দৈনিক বাংলা -২৩ শে এপ্রিল, ১৯৮৬ইং
সাপ্তাহিক সোনার বাংলা -১৯ শে মে, ১৯৮৯ইং
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-৬ষ্ঠদশ খন্ড, ১ম সংখ্যা-১৪০৫ বাং
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1878.
Journal of the Asiatic Society of Bengal part -I, 1904.
Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1922
Journal of the Asiatic Society of Bengal vol-XIV, 1847.
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1922
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1867.
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1870
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1873.
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1874.
Journal of the Asiatic Society of Bengal 1923.
Journal of the Asiatic Society of Pakistan, vol- VII,1961.
Journal of the Asiatic Society of Pakistan, vol-10. 1965.
Pakistan Historical Society of Journal, vol - 1, 1953.
Calcutta Revew, vol- LXXI, 1939.
Journal of the Bihar Reaserch Society, vol-II. 1965.
Begal District Gazetteers, Pabna, 1921.
Bengal District Gazetteers- Mymensingh, 1917.
District Gazetteers, Bogwara, 1910.
District Gazetters. Dinajpur- 1972.
East Bengal District Gazetteers, Chittagong. 1908.
West Bengal District Gazetteers (Hogly), Calcutta, 1972.
West Bengal District Gazetteers (Howrah), Calcutta, 1922.
Assam District Gazetteers, Kamrup, 1905.